# Dharmananda Prabandhabali

OR

# SWAMI DHARMANANDA MAHAVARATI'S ESSAYS IN BENGALI.

## VOL. II.

NISI DOMINUS FRUSTRA KEPIT

PUBLISHER—JOTINDRA KOOMAR ROY,
BARISAL

CALCUTTA.

PRINTED AT THE ANTAHPUR PRESS, BY PROBHAT CHANDRA DATTA, 32, SUKEA STREET.

1904

# সূচীপত্র।

# ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী।

## ( দ্বিতীয় খণ্ড )

প্রণেতা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"মাতৃ ভাষার আলোচনায় মনুষ্যের আয়ু সম্বর্দ্ধিত হয়;
সাহিত্যের আলোচনায় পরমানন্দ জন্মে। আনন্দ
সমাযুক্ত দীর্ঘ জীবন কেবল মোক্ষেচ্ছু
দিগেরই পরম ধন।"—গ্রন্থকার।

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্র কুমার রায়, বরিশাল।

কলিকাতা।

৩২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, অন্তঃপুর প্রেসে,

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১।

# প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয় নব্যভারত, ভারতী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, প্রদীপ, নবপ্রভা, বঙ্গভাষা, সুধা, আরতি, বিশ্বজননী, বীরভূমি, সমালোচনী, গৌড়ভূমি, বামা বোধিনী পত্রিকা, সাহিত্য, পন্থা, আশা, সখি, উৎসাহ, ভারত সুহৃদ, অতিথি, বার্ত্তা, প্রকৃতি, আলোচনা, ছাত্র, জন্মভূমি, কৃষক, কোহিনুর, সাহিত্য-সংহিতা, হিন্দু পত্রিকা প্রভৃতি বত্রিশখানি মাসিক পত্র ও পত্রিকায় নানা বিষয়ে যে সকল অপূর্ব্ব চিন্তাশীলতা, আভিজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ১৩১০ সালে তাহাদের কতক গুলি একত্র করিয়া জনৈক ভদ্র লোক নব্যভারত যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে আমি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিলাম। ভক্তি ভাজন মহাভারতী মহাশয়ের বিবিধ বিদ্যাবত্তা পরিপূর্ণ রাশি রাশি প্রবন্ধের মধ্যে কোনটি রাখিয়া কোনটি প্রকাশ করিব তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না, যে প্রবন্ধ পাঠ করি তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। দেশে, বিদেশে, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রবন্ধ সমূহ অতীব প্রশংসার সহিত সমালোচিত ও কীর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। "প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া দেখিলে পাঠক মহাশয়েরা জানিতে পারিবেন, কতকগুলি প্রবন্ধ বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। বহুস্থানে বহুপ্রবন্ধ প্রমাণ (authority) স্বরূপে গ্রহণ করিয়া অনেক লেখক ও পণ্ডিত প্রবন্ধের নানা অংশ তাঁহাদের সমাচার পত্র, মাসিক পত্র ও পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

যে কয়েকটি প্রবন্ধ আমার নিকট ছিল, আপাততঃ তাহাই একত্র করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিলাম। প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া সর্ব্ব সাধারণ যেরূপে উৎসাহ দিয়াছেন দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে সেইরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে অন্যান্য খণ্ডগুলি সত্বরেই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

| | |
|---|---|
| লাখুটিয়া<br>জমিদারী কাছারী।<br>জিলা বরিশাল। | বিনয়াবনত<br>শ্রীযতীন্দ্র কুমার রায়।<br>প্রকাশক। ১৩১১ সাল। |

# ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী।

( দ্বিতীয় খণ্ড )



## ফেজারী বাবা।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কদাপা ( Cuddaph ) নগরী অতি প্রাচীন কাল হইতে সাধুদিগের নিকট সুপরিচিতা। এই জেলার সর্ব্বত্র সুন্দর পর্ব্বত, সুন্দর সুন্দর অরণ্য, মনোমোহন জলপ্রস্রবণ এবং রমনীয় তপোবন সমূহ বিদ্যমান থাকায় পুরাকাল হইতে ব্রহ্মদর্শী তপস্বীগণ স্থানে স্থানে বাস করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা সচরাচর সংসারী মানবদিগের নয়ন গোচর হয়েন না। প্রায় ষড়বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে কদাপার জনৈক সুশিক্ষিত সদ্বংশজাত, সদাচারী এবং ধর্ম্মভীরু হিন্দু ডেপুটী কালেক্টর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সরকারীকার্য্যোপলক্ষে কদাপা জেলার অন্তর্গত মদনপল্লী ( Madnapalle ) নামক সুপ্রসিদ্ধা উপনগরীতে গমন করিয়াছিলেন। মদনপল্লী হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত এবং বন আছে। সায়ংকালে ডেপুটী মহাশয় তাঁহার কয়েকটী বন্ধুর সহিত প্রান্তরে পদচারণা করিতে করিতে দেখিলেন, পর্ব্বতের গাত্র হইতে প্রভূত ধূম সহ অগ্নিশিখা সমূহ প্রজ্বলিত হইয়া আকাশের দিকে উড়িতেছে, অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতের দিকে যাইতে যাইতে নিকটবর্ত্তী হইয়া বুঝিলেন, পর্ব্বতের স্থান বিশেষে প্রজ্বলিত হুতাশন পরিবেষ্টিত কোনও মনুষ্যাকৃতি জীব দণ্ডায়মান আছেন। আরও নিকটে যাইয়া দেখিলেন, এক মহাপুরুষ প্রদীপ্ত অনল মধ্যে দাঁড়াইয়া তপঃসাধন করিতে করিতে দুইটী আজানুলম্বিত বাহু তীব্রবেগে স্পন্দন করিতেছেন। ডেপুটী এবং তাঁহার

বন্ধুরা ঐ অগ্নির সমুখে উপস্থিত হইবা মাত্র সেই পরম রমণীয় কান্তি-বিশিষ্ট তপশ্চারী অগ্নি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গিরিশিখরে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইঁহারা ঝটিতি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার পবিত্র পাদযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে দেব। সৌভাগ্য ও সুকৃতি বলে আজি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কানন ও পর্ব্বতকে পবিত্র করা আপনাদের নিত্যকর্ম্ম ও ধর্ম্ম, কিন্তু মায়াবী মানবের পর্ণকুটীর পবিত্র করিতে আপনারা কি নিষিদ্ধ? যদি লোকালয়ে গমন না করেন তাহা হইলে আমাদের ন্যায় পাতকীবৃন্দের উদ্ধারের উপায় কোথায়? আপনারা নিত্যই অনিকেতনী কিন্তু নবনিকেতনকে চরণ ধূলি দ্বারা পূত করিতে আপনাদের ন্যায় পুণ্যচেতা ব্রহ্মর্ষিগণই সমর্থ।" যাহা হউক, অনেক অনুরোধের পরে ঐ সাধু মহাত্মাকে শ্রীযুক্ত ডেপুটী মহাশয় তাঁহার বাসা বাটীতে আনিয়া পরম যত্নে ও সমাদরে আসন প্রদান করিলেন। দুই দিবস পরে, সরকারী কার্য্য পরিসমাপ্ত হওয়ায়, ডেপুটী ঐ মহা-পুরুষকে সঙ্গে লইয়া কদাপা নগরীতে আগমনপূর্ব্বক তথাকার বাসাবাটীতে সসম্ভ্রমে স্থান দিলেন।

যে সাধুর কথা কহিতেছি, তাঁহার ঠিক বয়স কেহই ঠিক করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে পঞ্চাশ বর্ষের অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। ইংরাজি, পারস্য, আরবী, হিন্দি, উর্দ্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কটিদেশে গৈরিক বহির্ব্বাস, গায়ে কৃষ্ণবর্ণ কম্বলের আল্‌খাল্লা, গলায় পিত্তলের মোটা শৃঙ্খল এবং হাতে লম্বা লৌহ দণ্ড ছিল। তিনি খুব স্থূল বা খুব পাতলা ছিলেন না, তাঁহাকে দেখিলে বড় সুন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোকে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। মৎস্য কিম্বা মাংস তিনি নিত্য ভক্ষণ করিতেন না কিন্তু যখন মাংস খাইতেন তিন চারি সের ছাগমাংস অনায়াসে গলাধঃকরণ

করিয়া সহজে হজম করিয়া দিতে পারিতেন। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এক তোলা অহিফেন, ষোল ছিলিম গাঁজা, তিন ছিলিম চরশ এবং তদ্ভিন্ন অনেক ছিলিম তামাকু সেবন করিতেন! একদিন তিনি তিন বোতল বিলাতী ব্রাণ্ডি (Exshaw No I) বিনা জল সহযোগে দুই ঘণ্টার মধ্যে পান করিয়াছিলেন; অথচ নেশার চিহ্নমাত্র ছিল না। ভাত খাইতে বসিলে সাধারণত অর্দ্ধপোয়ার অধিক আহার করিতেন না অথচ দেহখানি তপ্তকাঞ্চনবৎ প্রতীয়মান হইত। ইনি বড় বড় বিষাক্ত ভুজঙ্গ ধরিয়া আনিয়া তাহাদের মুখ নিজের মুখের ভিতর স্থাপন করিয়া বিষপান করিতেন। রাত্রিতে কিম্বা দিবাকালে সেই জিতনিদ্র পুরুষকে কেহ নিদ্রিত দেখে নাই, দিবসে অন্নাহারের পর আরাম চেয়ারের উপর পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল মাত্র চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতেন।

ক্রমে ক্রমে কদাপা নগরীর সর্ব্বত্র সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচারিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, বহুদূর হইতেও স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিতে নিবানন্দ হইত না। এ দিকে সহরের জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ার, সিবিলসার্জ্জন, জমিদার, সওদাগর, উকিল, মুন্সেফ, সদর আলা, শিক্ষা বিভাগের লোকেরা আগমন করিয়া সাধুর দর্শন লাভ করত, চমৎকৃত ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সাধুজী সকলের সহিত সদ্ব্যবহার ও সুমিষ্ট ভাষণ দ্বারা অতীব যশস্বী হইয়া উঠিলেন।

কদপা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ফ্রেজার সাহেব (Fraser) এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গমন করায় তাঁহার সাধু দর্শন হয় নাই। মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীদিগের—তদ্ভিন্ন অনেক লোকের মুখে এই হিন্দুস্থানী সাধুর কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী ছিলেন

কিন্তু অনবকাশ বশত দুই এক দিবসের মধ্যে সাধু সমীপে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। প্রায় এক সপ্তাহ কাল পরে অকস্মাৎ পথিমধ্যে তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ফ্রেজার সাহেব এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী একদিবস সায়াহ্নে রাজপথে বায়ু সেবনোপলক্ষে পদচারণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে হইতে উত্তর দিকে আসিতেছিলেন, এমত সময়ে সবান্ধব ডেপুটী মহাশয় এবং ঐ সাধু ঐ পথের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণদিকাভিমুখে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সাধুর দর্শন লাভ হইল। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন "ডেপুটী সাহেব। শুনিতেছি, আপনার বাসায় একটী ভাল সাধু আগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আছি, ইনিই কি সেই সাধু?" ডেপুটী বলিলেন "হাঁ, ইনিই সেই সাধু।" সাধুর দিকে চাহিয়া ফ্রেজার কহিলেন, "মহাশয়। শুনিয়াছি সাধু পুরুষেরা ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত বলিয়া দিতে পারেন, অন্ততঃ ভবিষ্যতের অনেক কথা তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া দেন। আপনাকে আমার একটা ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাস্য আছে। বলিতে পারেন আমার কবে বিলাত যাওয়া হইবে?" মহাপুরুষ অল্পক্ষণ পরে উত্তর করিলেন "অদ্য হইতে একমাস কাল মধ্যে আপনি বিলাত যাইবেন।" জয়েণ্ট সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার সহিত কথোপকথন করিবার পূর্ব্বে আপনার প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, কিন্তু এখন আপনার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে"। এই কথা বলিয়া ডেপুটীর দিকে তাকাইয়া ফ্রেজার কহিলেন, "আমরা সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী, ভারতবর্ষে ছয় বৎসর কাল চাকুরী করিলে ছয় মাস ছুটি পাই, গত বৎসর আমি ছুটি লইয়া বিলাত গিয়াছিলাম, প্রায় দেড়মাস হইল ইংলণ্ড হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছি, আবার ছয় বৎসর অতীত না হইলে আমার বিলাত যাওয়া সম্ভব নয়, তদ্ভিন্ন বিলাত যাইবার আমার এখন ইচ্ছা নাই এবং

প্রয়োজনও নাই। সুতরাং এই সাধুর বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হইতেছে। একমাসের মধ্যে আমার বিলাত যাওয়া কেমনে সম্ভব হইতে পারে ?” এই কথা শেষ হইলে সাধুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “তোমার বাক্য প্রলাপীর বাক্যের সমতুল্য, তুমি নিশ্চয়ই পাগল।” রোষকষায়িত লোচনে মহাপুরুষ বলিলেন, “ফ্রেজার! ফ্রেজার! এই পাগলামীর জন্যই অদ্য হইতে একমাস কাল মধ্যে তোমাকে বিলাত যাইতে হইবে, ইহা নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।” ঝটিতি সেই সাধু ফ্রেজারের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। জয়েণ্ট. সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হাসিতে হাসিতে স্বভবনের দিকে প্রস্থান করিলেন। ডেপুটী ও তাঁহার বন্ধুগণ সত্বরে আসিয়া সাধুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইহার দুই দিন পরে মহাপুরুষ কদাপা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কোথায় গেলেন তাহা কেহই জানিল না, জানিবার উপায়ও রহিল না। কিন্তু ফ্রেজার সাহেবকে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা সকলেরই স্মরণ রহিল। এই ঘটনার ঠিক চতুর্দ্দশ দিবস পরে, শ্রীমান ফ্রেজার সাহেব এজলাসে বসিয়া একটা মার পিটের মোকর্দ্দমার বিচার করিতেছিলেন। ফরিয়াদী ও আসামীর এজাহার শেষ হইয়াছে, সাক্ষীদিগের জবানবন্দী সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, উকিল ও মোক্তারদিগের বক্তৃতার উপসংহার হইয়াছে, কেবল রায় ( Judgment ) লিখিতে বাকি আছে। সাহেব রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলম ধরিবামাত্র তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, অনেক কষ্টে দশ ছত্র লিখিলেন, তদনন্তর তাঁহার বুকে ভয়ানক বেদনা বোধ হইতে লাগিল এবং ঘোরতর পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। ঝটিতি খানসামারা লেমনেড্ ও বরফ আনিয়া সাহেবকে পান করিতে দিল। অতি কষ্টে রায়ের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি রায়ের কাগজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরে চেয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গায়ের কোট,

ওভার-কোট প্রভৃতি খুলিয়া নগ্নগাত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। মুখ দিয়া অজস্র অশ্লীল গালি নির্গত হইতে লাগিল। সাহেবের এই ভাব দেখিয়া কাছারীর লোকেরা ভীত ও চমৎকৃত হইল। তদনন্তর মহা-বীরের স্থায় লম্ফ দিয়া এজ্‌লাষ হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া একজন কনেষ্টবলকে নির্দ্দয়ের মত প্রহার করিতে লাগিলেন, নিরপরাধী কনেষ্টবল প্রাণভয়ে ও শারীরিক যন্ত্রণায় নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। নাজির, পেস্কার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি দৌড়িয়া আসিল শেষে সাহেব বাহাদুর তাহাদিগকেও প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে পাণ্ট্‌লুন পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে কাছারীর হলে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া ফ্রেজার সাহেবকে ধরাধরি করিয়া শোয়াইয়া দিল। এ দিকে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, জজ, সিবিল সার্জ্জন, পুলীশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সাহেবেরা সত্বরেই ফ্রেজারের কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "ইহা এক প্রকার উন্মত্ততা বলিয়াই বোধ হইতেছে।" প্রায় একঘণ্টা মধ্যে ফ্রেজার তাঁহার বাঙ্গলো মধ্যে আনীত হইলেন। রোগের উপশম হইল না, দিনে দিনে তাহা বাড়িতে লাগিল। মান্দ্রাজ নগরে তিনি সাহেব চিকিৎসার জন্ত প্রেরিত হইলেন, সেখানকার পাগলখানার বড় বড় ডাক্তারেরা আসিয়া বলিলেন, "বিলাতে গিয়া যথারীতি চিকিৎসা না করাইলে এরূপ উৎকট রোগের—মহামারাত্মক উন্মত্ততার—আরোগ্য হওয়া সুকঠিন অথবা অসম্ভব।" মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সমীপে যথাসময়ে রিপোর্ট প্রেরিত হইল, গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও পরামর্শে ফ্রেজার সাহেব ছুটি প্রাপ্ত হইয়া ঠিক অষ্টবিংশ দিবস অপরাহ্নে বিলাতী জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক ইংলণ্ডে ( বিলাতে ) রওনা হইলেন। সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে এই অদ্ভুত ঘটনার সম্বাদ প্রচারিত হইয়া গেল, সেই বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের অভিশাপের

ফল করিয়াছে দেখিয়া লোকে বিস্ময় ও আতঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হইল।

বিলাতে যথারীতি চিকিৎসা করাইয়া ফ্রেজার সাহেব রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্ত হইয়াই, জগদ্বিখ্যাত টাইম্‌স্ (Times) নামক সম্বাদ পত্রে এই অত্যদ্ভুত ঘটনা ছাপাইয়াছিলেন। টাইম্‌স্ সম্পাদক ফ্রেজারের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করত প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া প্রবন্ধটি প্রকাশ না করিয়া ফ্রেজারকে ডাকাইয়া পাঠান, পরে তাঁহার মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তোষ সহকারে ঐ প্রবন্ধকে স্থান দেন। এই সময়ে ফ্রেজার সাহেব বিলাত হইতে কদাপার ডেপুটী কালেক্টরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

( ফ্রেজারের পত্র )

আপনারা বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন, ঈশ্বর প্রসাদে আমি এক্ষণে রোগমুক্ত হইয়াছি। আপনার বাসা বাটীতে যে হিন্দুস্থানী সাধু অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিকই ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ। আমি এমন অসাধারণ মনুষ্য ( Extraordinary man ) আর কখনও দেখি নাই। যদি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সাধুর একখানি ফটো পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে আমি Illustrated London News নামক সংবাদপত্রে তাঁহার ছবি ছাপাইয়া দিব। তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত দিলেও ভাল হয়। টাইম্‌স্ পত্রে ঐ সাধুর বিবরণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

ইহার উত্তরে ডেপুটী মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই—

## ( ডেপুটীর পত্র )

আপনার পত্র এবং রোগমুক্তির সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। আপনার বিলাত গমনের অনেক পূর্ব্বে সেই মহাপুরুষ কদাপা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কোথায়

গিয়াছেন তাহা কেহ জানে না, জানিবার কোন সুবিধাও নাই। তাঁহার জীবন চরিত আমি সংগ্রহ করি নাই এরূপ মহাপুরুষদিগের জীবনী সংগ্রহ করাও সুকঠিন ; কারণ এই যে, সাধু মহাত্মারা প্রায়ই আত্ম-পরিচয় দেন না। তাঁহার একখানি ফটো তুলাইয়াছিলাম, ফটো খানি আমার নিকটে আছে, এই ফটো খানি ভাল ফটোগ্রাফারের হাতের তৈয়ারী না হওয়ায় সুন্দর হয় নাই। আমি সত্বরে মান্দ্রাজ যাইব, সুবিধা হইলে ইহার খুব ভাল নকল করাইয়া আপনার নিকটে পাঠাইতে বিস্মৃত হইব না। ভরসা করি আপনার সর্ব্বৈব কুশল।"*

ছুটি শেষ হইলে, মেজার সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া আবার কদাপাতেই উপস্থিত হয়েন। কদাপায় অবস্থান কালে ঐ মহাপুরুষের তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পান নাই। তিনি এতদূর সাধুভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পথে ঘাটে হাটে নাঠে গাছতলায় যেখানেই হউক সাধু আগমনের সম্বাদ পাইলে, ঝটিতি লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালাতে আনিতেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও সমাদরে তাঁহার সেবা ও সাহায্য করিতেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন কালে আমি কদাপা ও মদনপল্লী নগরীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলাম। এই ঘটনার কথা আমি তথায় বহুসংখ্যক লোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি. যাঁহারা এই ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই আজিও জীবিত রহিয়াছেন। যাঁহাদের মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাদের কেহ কলেজের প্রিন্সিপাল, কেহ জজ, কেহ ডেপুটী কলেক্টর, কেহ রাজোপাধিক জমিদার, কেহ উকীল, কেহ গ্রন্থকার, কেহ বা তত্ত্বদর্শী সাধু। ঐ মহাপুরুষের ফটো আমি অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ইনি মান্দ্রাজ অঞ্চলে "মেজারী বাবা" নামে বিখ্যাত।

* বিলাত হইতে ছবি পাঠান হয় নাই। এই মহাপুরুষের ছবি আমি অনেকের গৃহে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রথম ফটোখানি এখনও মজুদ আছে।—লেখক।

এই মহাত্মা স্বয়ং বলিতেন "সংশয়াত্মার অত্যন্ত অধঃপতন হইয়া পরিণামে নাশ হয়।" বাস্তবিক সংশয়াত্মক, নাস্তিক ও অবিশ্বাসী দিগের মানব জীবন বৃথায় যাপিত হয়। তাহাদের সম্মুখে অতি উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা মরুভূমি তুল্য পতিত থাকে।

"মন! তুমি কৃষি কাজ জানো না,
এমন মানব জমি রইল পতিত,
আবাদ করিলে ফলিত সোণা ॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

## ভাগবতের গ্রন্থকার।

ভক্তিরস-প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত ভক্ত-হিন্দুর প্রাণের-প্রাণ-স্বরূপ, বৈষ্ণবের পক্ষে ইহা ভক্তি ও বৈরাগ্যের পরবর্ধন এবং তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণাধ্যাপকের পক্ষে ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতি পবিত্র ও প্রাচীন মহাপুরাণ। ভাষার লালিত্য, ভাবের গাঢ়তা, শব্দ-বিন্যাসের কারুকার্য্য, বর্ণনার মধুরতা, রসরসের প্রচুরতা, পারমার্থিক উপদেশের বহুলতা এবং আগন্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ের পরিপূর্ণতায়, শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর অতীব উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সুপরিচিত।

"সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারংসারং সমুদ্ধৃতং
সর্ব্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবত মিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥"

সংস্কৃত হইতে প্রায় বত্রিশটি ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে, এবং জয়দেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবকুলধুরন্ধরগণ এই মহাগ্রন্থের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি ভাবোদ্দীপক কবিতামালায় অনুপ্রাণিত হইয়া, অসংখ্যাসংখ্য

শ্রুতি-সুখকরী গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—

"গ্রন্থোষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।" (গরুড় পুরাণ।
"অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মকং ভাগবতং" ।—( বামন পুরাণ। )

এখনও এই ভুবন বিখ্যাত গ্রন্থে দ্বাদশ স্কন্দ, ত্রিংশত ত্রিশতিধ্যায় এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমৎভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ট ভাষ্য বা টীকা গ্রন্থ ৪৭ হাজার শ্লোকে পরিসমাপ্ত, ইহার অনেক টীকা লুপ্ত বা গুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু অদ্যাপি একশত টীকাকারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবতের অন্তর্গত বিষয়াদি ভাগবতের প্রবাপ্ততার সমতুল্য। ইহার ভাবের মাধুর্য্য ও ভক্তির প্রচুরতা, ঈশ্বর প্রেমিক পুরুষের হৃদয়ে নিত্য নবনব আনন্দের উৎপাদন করে।

নিগম কল্প তরো র্গলিতং ফলং
শুক মুখাদমৃত দ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকং।

সুখের বিষয়, ধর্ম্ম বিপ্লবের ভীষণ উপদ্রবেও ইহার শ্লোকের ন্যূনাধিক্য ঘটে নাই, এবং কোথাও একটিও প্রক্ষিপ্তবাক্য অদ্য পর্য্যন্ত ইহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এতদুভয় দেশের পণ্ডিতবর্গের ইহাই একান্তিমত। ফলতঃ, ভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, পুরাণ সংহিতা বা উপপুরাণ মধ্যে নাই, এইজন্য ইহা মহাপুরাণ বলিয়া প্রখ্যাত। পণ্ডিতেরা বলেন "বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা"— অর্থাৎ, ভাগবতের দ্বারা বিদ্যাবত্তার পরীক্ষা হয়।

এই মহাপ্রখ্যাত মহাপুরাণ কোন্ দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের অমর লেখনী হইতে বিনিঃসৃত, তৎসম্বন্ধে নানা সময়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। অতি পুরাকাল হইতে শুনা যাইতেছে, "শ্রীমৎ-

ভাগবত ব্যাসদেবের প্রণীত", কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৯ জন ব্যাসের নাম পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রকৃত কোষমতে পঞ্চজন, শব্দরত্নাবলী মতে চারিজন, নীলাদ্রিভরত মতে দুইজন এবং সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ মতে ৬১জন ব্যাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যায়, ব্যাস কাহারও নাম নহে, ইহা একটি উপাধি মাত্র। বি+আস=ব্যাস, যাঁহারা কোনও শাস্ত্রকে বিভক্ত করেন, তাঁহারাই ব্যাস; যিনি বেদকে বিভাগ করিয়াছেন, তিনি বেদব্যাস। ব্যাস শব্দের ইহাই সমীচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়, অনেক স্থানে এইরূপই অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, পুরাকালে রাজসভায় যে সকল ব্রাহ্মণ মধুর স্বরে শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন তাঁহারা "ব্যাস" নামে অভিহিত হইতেন। এখন ও ভারতবর্ষে অনেক ব্রাহ্মণের মধ্যে "ব্যাস" উপাধির প্রচলন দেখা যায়। মেদিনীপুর ও হাবড়া জেলায় কৈবর্ত্ত জাতির ব্রাহ্মণেরা ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন "তিথ্যাদি তত্ব" গ্রন্থে লিখিত আছে—

> কলস্বর সমাযুক্তং রস ভাব সমন্বিতং।
> বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশোনৃপ॥
> ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থ শ্চার্পয়েন্ নৃপ।
> যএবং বাচযেদ্ ব্রহ্মণ্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে।

এই সকল ব্যাসোপাধিক শাস্ত্রকারের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নই সর্ব্ববাদী সম্মতবাক্যে শ্রীমৎভাগবতের গ্রন্থকার বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীনাথভট্ট নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমৎভাগবতকে ঋষি-প্রণীত নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে "দুর্জ্জনমুখমহাচপেটিকা" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, কাশীনাথভট্টকৃত এই পুস্তক লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

গ্রন্থালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। তিনি আরও বলেন "একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং নাটোরের রাণীভবানীর পণ্ডিত-সভায় এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল।" তাহাতে রাণী ভবানীর পণ্ডিতেরা প্রথমতঃ ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলিয়া মত প্রকাশ করেন, কিন্তু পরিণামে তাহারা আলোচনায় স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভাষ্যপাত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বেদব্যাস ঋষি প্রণীত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

তাহার পরে ইয়ুরোপে ধুয়া উঠিল, "শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব নামক এক ব্যক্তির দ্বারা বিরচিত হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ঋষির প্রণীত নহে।" এই অপ্রামাণিক ও অর্থশূন্য অভিমত আজি পর্য্যন্তও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, সুতরাং ইহার একটা মীমাংসা হওয়া উচিত।

যাহারা বলেন, "শ্রীমদ্ভাগবত আধুনিক গ্রন্থ," তাঁহারা কেবল দুইটিমাত্র যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা এই—

১ম। পুরাণসমূহ অতি সরলভাবে রচিত হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতের রচনা অতি প্রগাঢ়। সংস্কৃতব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থবোধ হওয়া কঠিন, সুতরাং ইহা আধুনিক।

২য়। অন্যান্য প্রাচীন পুরাণনিচয়ের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য খুব কম, সুতরাং ইহা আধুনিক।

যাহারা বলিয়া থাকেন, "শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব প্রণীত", তাঁহাদের নিকট হইতেও কেবল দুইটি মাত্র যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্যথা—

১। ভাগবতে বৈয়াকরণিক পারিপাট্যের প্রচুরতায় বুঝা যায় ইহা কোনও বৈয়াকরণের প্রণীত।

২য়। বোপদেবের ব্যাকরণের ভাষার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক স্থলের ভাষার সাদৃশ্য থাকাতে, ইহাকে (শ্রীমদ্ভাগবতকে) বোপদেব প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। যাহাহউক, ভাগবত যে মহর্ষি

বেদব্যাস বিরচিত, তাহার কতকগুলি প্রমাণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে।"
"সত্যং পরং ধীমহি" ভাগবতের এই শ্লোক আমার প্রবন্ধের সহায়।

১। পরমবৈষ্ণব শ্রীমৎ স্বামী গৌড়পাদ মোহান্ত তাঁহার বিরচিত "পরমার্থ বিবেকাবলী" নামক সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বহুস্থানে ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অন্যূন সার্দ্ধপঞ্চশত শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরমার্থ বিবেকাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আচার্য্য উইলসন, আচার্য্য ওয়েবের, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার প্রভৃতির মতে গৌড়পাদস্বামী, শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং শঙ্করের মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে গৌড়পাদের জন্ম হইয়াছিল, তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে। বৈদান্তিকেরা শাস্ত্র পাঠারম্ভকালে অদ্যাপি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের নামোল্লেখ করতঃ নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন। ঐ শ্লোকে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের নাম সংলগ্ন আছে, তদ্যথা—
"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ ব্যাসং শুকং গৌড়পদংমহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্যশিষ্যং। শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য।

যখন গৌড়পদের গ্রন্থে ভাগবতের উল্লেখ আছে,তখন শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব প্রণীত কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

২। শঙ্করাচার্য্য বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত; শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ "বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য" এবং "চতুর্দ্দশ-মতবিবেক" গ্রন্থদ্বয়ে ভাগবত মহাপুরাণের উল্লেখ আছে, সুতরাং বোপদেবকে ভাগবতের গ্রন্থকার বলা নিতান্ত ভ্রান্ত মত।

৩। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অনেক পূর্ব্বে হনুমৎ আচার্য্য ও চিৎসুখ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহারা ভাগবতের টীকা করিয়া গিয়াছেন। "সিদ্ধান্ত দর্শন" কার লিখিয়াছেন—

বোপদেব কৃতত্বে চ বোপদেব পুরাভবৈঃ।

কথং টীকা কৃতা বৈ সুর্ব্বমচ্ছিৎসুখাদিভিঃ ॥

অর্থাৎ—"যদি ভাগবৎ বোপদেবের কৃত হয়, তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা কি প্রকারে তাহার টীকা করিতে সমর্থ হইলেন ?"

৪। ডাক্তার রামদাস সেন বলেন, "শ্রীমৎ রামানুজ আচার্য্যের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উক্ত হইয়াছে। রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন,সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ববর্ত্তী"। সংস্কৃত "স্মৃতিকাল তত্ত্ব"গ্রন্থের মতেও রামানুজ বোপদেবের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। "ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ" নামক সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরেতিহাস, রাজা ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত। 'ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ,, 'রাজতরঙ্গিণী' হইতেও প্রাচীনতর, কারণ শেষোক্ত গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ উদ্ধৃত হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থ বোপদেবের প্রাদুর্ভাবের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, এবং এইসকল গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজতরঙ্গিনী হইতেও প্রাচীনতর "রাজাবলী" গ্রন্থে ভাগবতের উল্লেখ আছে।

৬। আমরা বোপদেবের নামে তিন ব্যক্তির পরিচয় পাই। ইঁহাদের একজন ভিষক (বৈদ্য), একজন কবি, আর একজন বৈয়াকরণিক। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিকেই প্রতিবাদকারিগণ ভাগবতের গ্রন্থকার বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সুতরাং প্রথম দুই বোপের সহিত এই প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই, তথাপি উহাঁদের মধ্যে একজন বৈদ্য এবং অপর জন যে কবি ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত প্রমাণ দিয়া পাঠককে পূর্ব্ব হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। কারণ, বৈয়াকরণ বোপদেব পরাজিত হইয়া গেল, প্রতিবাদকারীরা বলিতে পারেন, "তবে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত দুইজন বোপের মধ্যে আর কেহ ভাগবতের গ্রন্থকার"। বৈদ্য বোপদেব নিজে বলিয়াছেন, "আমি ধনেশ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণ গুরুর শিষ্য এবং ভিষক (বৈদ্য) কেশবের পুত্র।" ধনেশ মিশ্র-শিষ্যেণ ভিষক কেশব-সূনুনা।'

কবি বোপদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"কাব্যকার বোপদেব-শ্চকারেদং বেদপদাস্পদম্।" আচার্য্য ওয়েবর, আচার্য্য গোল্ড্‌ষ্টুকর, প্রফেসর কোলব্রুক পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ডাক্তার রামদাস সেন, প্রোফেসর উইলসন প্রভৃতি বোপদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; ইঁহাদের কেহ কেহ বোপদেবকে ভাগবৎ-গ্রন্থকার এবং কেহ কেহ বেদব্যাসকে ভাগবৎ গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের আলোচ্য বোপদেব সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের নানাস্থানে প্রশংসা আছে, কিন্তু তিনি বৈয়াকরণ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ বলিয়াই সমধিক প্রখ্যাত ও প্রশংসিত

> "স্তোকাচম্পতিনেব পয়গপুরী শোভিহিনেখা ভবং।
> যেনৈকেন বিচমতী বসুমতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্‌॥
> সোঽং ব্যাকরণার্ণ বৈকতরণি শ্চাতুর্য্য চিন্তামণি—
> শ্রীবাং কোবিদগর্ত্ত পর্ব্বতপরিঃ শ্রীবোপদেব স্তধীঃ॥"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় বোপদেবের বিচার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"হেমাদ্রিরপি স্বয়ং নৃপতিঃ যস্য সভাপণ্ডিতো মহামহোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেব আসীৎ, অনুমীয়তে পক্ষ বসুধরেন্দুমিতি শক সম্বৎসরে হিত্রাদি বৎসর ন্যূনাধিকো ন সঞ্জনিষ্ট।" শিরোমণি মহাশয়ের মতে বোপদেব খৃষ্টির দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং তিনি হেমাদ্রি নামক রাজার সভাসদ ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হেমাদ্রি নিজে রাজা বলিয়া কোথাও আত্মপরিচয় দেন নাই এবং তাঁহার প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "চতুর্বর্গ দানখণ্ড" গ্রন্থে তিনি বোপদেবের আদৌ উল্লেখ করেন নাই, এবং আপনাকে রাজা বলিয়াও পরিচয় দেন নাই, সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও হেমাদ্রি নামক নরপতির উল্লেখ নাই, কিন্তু হেমাদ্রি নামক "বিদ্বান্‌ এবং বিদ্যোৎসাহী রাজমন্ত্রী'র উল্লেখ আছে। হেমাদ্রি ও বোপদেব সমসাময়িক ও পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। বোপদেবকৃত "মুক্তাফল" গ্রন্থের টীকায় মন্ত্রিবর হেমাদ্রি, বোপদেবের পরিচয় দিয়াছেন—

বস্তু ব্যাকরণে বরেণ্য ঘটনাঃ খ্যাতা প্রবন্ধ দশ,
প্রখ্যাতা নবটৈকেত্ব তিথিনির্ণয়ার্থ মোকোত্ভূতঃ।

অর্থাৎ "বোপদেবের ব্যাকরণের কীর্ত্তি অদ্ভুত, ব্যাকরণ বিষয়ে তিনি দশটি প্রবন্ধ (অধ্যায়) লিখিয়াছেন, বৈদ্যকগ্রন্থের উপর নয়টী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং তিথিনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্রের রচনা করিয়াছেন।" পাঠক মহাশয়! এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, সমসাময়িক সুপণ্ডিত হিমাদ্রি বোপদেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ নিচয়ের উল্লেখ করিতে, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি পর্য্যন্ত, উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু বোপদেব যদি অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সমাযুক্ত ভুবন বিখ্যাত মহাপুরাণে শ্রীমৎ ভাগবতের বিরচক হইতেন, তাহা হইলে হিমাদ্রি তাহা উহ্য রাখিবেন কেন? হিমাদ্রি ও বোপদেব কেবল সমসাময়িক নহেন, উভয়ে পরস্পর পরম বন্ধু ছিলেন। সুতরাং বোপদেবকে ভাগবতের গ্রন্থকার কেমনে বলা যাইতে পারে?

৭। হেমাদ্রিদেব "মুক্তাফল" গ্রন্থের টীকায় আরও লিখিয়াছেন—
"মহাপুরাণ বিষয়ে ত্রয় এব বস্তু প্রবন্ধা,
বাণি শিরোমণেরিহ গুণঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ।"

উপটীকাকার মহাশয় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীমৎ-ভাগবতরূপ মহাপুরাণ সম্বন্ধে যিনি তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই অন্তর্য্যামী মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না থাকা অলৌকিক"। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বোপদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ সম্বন্ধে তিনটি মাত্র প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তিনি ভাগবত রচনা করেন নাই। টীকাকার লিখিয়াছেন—

"মহাপুরাণ বিষয়ে (শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে) প্রবন্ধা (রচনানী) ত্রয় এব বস্তু ভগবতোক্তি ভূরর্ত্তবাণি শিরোমনেরিহ গুণঃ কে কেন লোকোত্তরাঃ॥"

৮। বোপদেব গোস্বামী স্বয়ং পণ্ডিত সমাজে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার

করিয়াছেন "আমি ভাগবতের নেতা নহি, আমি কেবল ভাগবতের টীকাকার বা ব্যাখ্যাকর্ত্তা মাত্র।" •ভাগবতের সামান্ত অংশমাত্রের টীকা করিয়া বোপদেব "হরিলীলা টীকা" নামক পুস্তিকা রচনাকরেন। উহাতে তিনি লিখিছেন—

"শ্রীমদ্ ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রি-হেমাদ্রি তুষ্টয়ে॥"

অর্থাৎ "কেবল মন্ত্রিবর হেমাদ্রির পরিতুষ্টির জন্ত আমি (পণ্ডিত) বোপদেব, শ্রীমদ্ভাগবতের কতকগুলি কঠিন স্কন্ধের অর্থাদি নিরূপণ জন্ত "হরিলীলাটীকা'' রচনা করিলাম।" কিন্তু বেদব্যাস নিজে শতাধিক স্থানে 'ভাগবতকার' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। আরও, ভাগবতের আদ্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসংশয়িতভাবে বুঝা যাইবে যে, উহা সংসারী পুরুষের (হেমাদ্রির বেতনভোগী বোপদেব) প্রণীত নহে, উহা যোগীন্দ্র ঋষির বিরচিত। উপরি উক্ত শ্লোকে পাঁচটি সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইয়া গেল। প্রথমতঃ—পণ্ডিত ভরত শিরোমনির হেমাদ্রিকে রাজা বলা ভ্রম, কারণ বোপদেব হিমাদ্রিকে মন্ত্রি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ—হরিলীলাটীকা সমস্ত ভাগবতের টীকা বা ব্যাখ্যা নহে। তৃতীয়তঃ—বোপদেব ও হিমাদ্রি সমসাময়িক, চতুর্থতঃ—হেমাদ্রি ও বোপদেব পরস্পর বন্ধু এবং পঞ্চমতঃ ও হেমাদ্রি বোপদেবের নিজের কলমে বুঝাগেল তিনি ভাগবতের টীকাকার মাত্র, প্রণেতা নহেন।

৯। গোপালাচার্য্য মতে বোপদেব ১২১২ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। বিট্টল ভট্টেরও তাহাই মত। নন্দ মিশ্রও তাহাই লিখিয়াছেন। পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমনি, উইলসন, মূর, অফ্রেট্, গার্ড, কেনেডি কোলব্রুক, গোল্ড্ ষ্টুকর, বর্ণূক, য়োয়েবর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার প্রভৃতি বহুল পণ্ডিতের মতে শঙ্করাচার্য্য বোপদেবের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং

শ্রীমদ্ভাগবত শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বকালে বিরচিত।

১০। বোপদেব প্রণীত মুগ্ধবোধের ঊনিশখানি টীকা গ্রন্থ আছে। ইহার মধ্যে নিম্ন লিখিত টীকাকারগণ প্রচীন—কাশীশ্বর, নন্দ কিশোর, দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভদ্র, রামপ্রসাদ, শ্রীবল্লভাচায্য, দয়ারাম, ভোলানাথ, কার্ত্তিক, রতিকান্ত, গোবিন্দ রাম, ইত্যাদি। ইহারা কেহই বোপদেবের জীবন চরিতে অথবা পাণ্ডিত্যের বিচারে, বোপদেবকে ভাগবতকার বলেন নাই। আচায্য উইলসন সাহেব ভাগবতের ৩১ খানি টীকার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রাচীন টীকার সর্ব্বত্র বেদব্যাসই ভাগবতকার বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

১১। সমস্ত পুরাণ, উপপুরাণ এবং মনুর পরবর্ত্তী সংহিতা শাস্ত্রকারগণ বেদব্যাসকে ভাগবতকার বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া গিয়াছেন। এ সমস্ত প্রাচীন আর্য্য ঋষি ধুরন্ধরদিগের ও পণ্ডিত প্রবর বৃন্দের অভিমতকে উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? এতদ্ভিন্ন মিতাক্ষরার টীকাকার এবং পুরুষোত্তমদেবের "পুরাণ" শব্দের আলোচনায় ভাগবতকে ঋষি প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

১২। ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ৫৪ খানি অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং বর্ণুক দেখাইয়াছেন যে, ৯৭ খানি প্রাচীন পুস্তকে ভাগবতের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গ্রন্থকারগণ ভাগবতের উল্লেখ করিবার সময় ইহার বিরচক বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়াছেন, বোপদেবকে করেন নাই।

১৩। যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি সম্পূর্ণ কঠিন এবং সম্পূর্ণ গম্ভীরার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপারিপাট্যসমাযুক্ত হইয়াও আর্ষ হয়, তাহা হইলে ভাগবত আর্ষ না হইবে কেন? ভাগবত অনেক পুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং পরবর্ত্তী পুরাণগুলির সহিত ইহার

সাদৃশ্য না থাকাই সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈয়াকরণিক পারিপাট্যের প্রচুরতা আছে বলিয়া ইহা বোপদেবের লেখনীপ্রসূত এরূপ সন্দেহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান বেদব্যাস যে, ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, তাহা কে বলিল? আরও বোপদেবের ব্যাকরণের ও ভাগবতের ভাষা তুল্যরূপী বলা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মতে উহাদের ভাষার কুত্রাপি সমত্ব লক্ষিত হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেব ও গরুড়-পুরাণাকার শ্রীমদ্ভাগবতকে "অপৌরুষেয়" বলিয়াছেন।

১৪। আকবর বাদসাহের পণ্ডিতসভার প্রধান সভাসদ মৌলবী ফৈজী সাহেব সংস্কৃতভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি পারস্তভাষায় ভগবদ্গীতা এবং রামায়ণের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। মৌলবী ফৈজী একজন "পাকা" প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন, ইহাঁর অনেক অভিমত ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অভিমত হইতে সারগর্ভ ও মূল্যবান। ইনি ভাগবতসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুর এই শ্রীমদ্-ভাগবত অতীব প্রাচীন পুস্তক, ইহা ঋষির প্রণীত। এই মহাপুরাণের ভাষা, ভাব ইত্যাদি ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ। ইহা ঋষি প্রণীত বলিয়া আমার বিশ্বাস। অনেক গ্রন্থানুসন্ধানেও ইহা জানিয়াছি।"

১৫। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত শ্রীমৎভাগবতের যতগুলি টীকা বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে "ষট্সন্দর্ভ" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও নানা গুণে শ্রেষ্ঠতম। এরূপ মহাপ্রকাণ্ড এবং মহা অপূর্ব্ব গ্রন্থ পৃথিবীতে খুব কম আছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এরূপ টীকা-গ্রন্থ জগতের সাহিত্যে আর নাই, ইহা নিশ্চয়। এই মহা প্রকাণ্ড গ্রন্থে পরম বৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামী আচার্য্য মহোদয় যখনই ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই বেদব্যাসকে গ্রন্থকার বলিয়া প্রণাম করিয়া ছেন। বোপদেবের নাম বা গন্ধ নাই।

১৬। যাঁহারা শ্রীমৎভাগবতকে ব্যাসদেব কৃত নহে বলেন, তাঁহাদের তর্ক এই টুকু—"শব্দাপন্ন বিলিপ্তর নিবন্ধানুদাক্ততর দৃঢ় বন্ধন পদ

লালিত্য হেতুক প্রামাণ্য নধিকরণ যেতৎ।” এখন জিজ্ঞাস্ত এই, তর্ককারী মহাশয়েরা কি সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আন্তস্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিছেন? যে বোপদেব “মুগ্ধবোধ” ব্যাকরণের প্রণেতা বলিয়া পরিচিত, সেই বোপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের গ্রন্থকার বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। বোপদেবের ব্যাকরণের নমুনা দেখুন। (মুগ্ধবোধ হইতে উদ্ধৃত)—(১) বলায় বয়া বোধীচঃ। (২) আদি গেচোর্ণ্ত্রী (৩) ব্যনচ্তধীকো ধো র্ধোকুর্চ্চহ রোথেঃ (৪) সসেপ্‌স্তাদে নৈকাচ্‌ কোন্তবা (৫) যর্ণোদাস্ত্রে বকুপ্‌স্তরে (৬) অপ্যত দ্দাত্ব পক্ব্‌বাহঃ। ইত্যাদি। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এমন লক্ষ্মীছাড়া দ্রু-কাণ কাটা, ভজ-কট-মী হজবরল, সংস্কৃত ভাষা, ভাগবতের প্রথম পাতা হইতে শেষ পাতা পর্য্যন্ত কোথাও নাই, কিন্তু মুগ্ধবোধের সর্ব্বত্রই একই ভাষা। সুতরাং ভাষা ধরিয়া ভাগবত ও মুগ্ধবোধকে এক বলিয়া কেমনে প্রতিপন্ন করিতে পার? আর এক কথা। তোমরা কহিয়া থাক, ব্যাকরণ বোপদেব জাতিতে বৈদ্য ছিল। ইহা মিথ্যা কথা। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, বৈদ্যশাস্ত্রে তিনি পটুতা লাভ করিয়াছিলেন।

“ষট্‌সন্দর্ভ”কার লিখিয়াছেন “আমি বিষ্ণাবলে জ্ঞান বলে, যোগবলে, গুরুকৃপা বলে, প্রত্যাদেশ বলে, এবং ভগবানের অনুগ্রহে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়াছি, ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃকই এই সুমধুর মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত বিরচিত হইয়াছে।” পাঠক মহাশয়। ইহার উপর আর তর্ক চলে না, আর একটি কথা কহিতেও সাহস হয় না। “প্রবাদো বোপদেবীয়ো বন্ধ্যা পুত্রায় তেত্তরাং”—অর্থাৎ ভাগবতকে বোপদেব প্রণীত বলা আর বন্ধ্যার পুত্র আছে বলা একই কথা। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

## নাগোর-সমাধি।

মহম্মদীর শাস্ত্র সমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, আরব্যান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ মক্কা ও মদিনা নগরী ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন স্থানে মুসল-

তীর্থক্ষেত্র নাই; কিন্তু এই সুবিশাল জগতের দিগ্‌দিগন্তর পরিব্রজন করিতে করিতে ইশলামীয়গণ যে সকল স্থানে ভাগবৎপরায়ণ সাধুদিগের আশ্রম ও সমাধি অথবা স্বদেশ-হিতৈষী কিম্বা প্রকৃত স্বধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাদিগের পবিত্র লীলা-ক্ষেত্র দর্শন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা "স্থানীয় তীর্থ" বলিয়া পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য কার্ব্বোলার সুপ্রশস্ত ময়দান, সিংহলের "দাদা" পাহাড়ের অদ্ভুত পদাঙ্ক, আফ্রিকার পীরশ্‌ অরণ্যানীর চিরযৌবন সমাযুক্ত কোমল শষ্পাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ড প্রভৃতি তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া সম্মানিত। বস্তুতঃ মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত বলবতী ও বেগবতী হইয়া উঠে এবং ভগবৎজ্ঞান যখন সঙ্কীর্ণতাকে পরিহার পূর্ব্বক অতি প্রকীর্ণ ভাবে সর্ব্বতোমুখী হইয়া প্রসারিত হয়, তখন মানবজাতি প্রত্যেক পবিত্র জীব প্রত্যেক পবিত্র পদার্থে এবং প্রত্যেক পবিত্র স্থানে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রতিভাষিক সত্তাকে সুন্দররূপে প্রতিফলিত দেখিতে পান। এই জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে মুসলমানের তীর্থক্ষেত্র বিরাজিত। যে যে জাতি তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানের পরে অশীতি বৎসর গত না হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অমিত অধ্যবসায় সহকারে স্বধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল এবং যাঁহাদের মোল্লা মৌলবী, হাফেজ, হাজী প্রভৃতি প্রচারকগণ নানাদেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক অধিবাস বা উপনিবেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি কখনও একটী কিম্বা দুইটী তীর্থ স্থানের মাহাত্ম্য লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন? হিন্দুস্থানে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের তীর্থক্ষেত্রের সংখ্যা কম নহে; রাজপুতানান্তর্গত আজমীরের সুপ্রসিদ্ধ খাজে সাহেবের দরগা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলান্তর্ভুক্ত এটা (Etah) জেলার অন্তঃপাতী জলেশ্বরের সুবিখ্যাত সমাধি দক্ষিণ ভারত রাজ্যের সীমাভুক্ত সালেমের (Salem) দরগা, পেশোয়ারের ফকির—নেওয়াজ প্রভৃতি মুসলমানের অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র; কিন্তু নাগোর-সমাধি ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম। প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ

মুসলমান এই স্থানে গমনাগমন করেন, আজমীরের কিম্বা সালেমের তীর্থ নাগোর সমাধি হইতে প্রাচীনতর হইতে পারে, কিন্তু শোভা, সম্ভ্রম, প্রখ্যাতি এবং পবিত্রতায় নাগোর সমাধি বৃহত্তম। ভারতবর্ষে এতদপেক্ষা মুসলমানের আর বড় তীর্থ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নাগোর-সমাধি দর্শন করিতে হইলে নাগোর নামক গ্রামে উপস্থিত হইতে হয়। নাগোর কোথায়, তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ তাঞ্জোর (Tanjore) ষ্টেশনের টিকিট লইতে হয়; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তাঞ্জোর বা তাঞ্জোরাবার একটি প্রসিদ্ধ নগর। সেই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বাষ্পীয় শকট বদলাইতে হয়, তদনন্তর তাঞ্জোর হইতে একটি ক্ষুদ্র শাখা (রেলওয়ে) লাইন দিয়া নেগাপটম্ (Negapatam) পর্য্যন্ত যাওয়া আবশ্যক। মাদ্রাজ হইতে নেগাপটম বা নাগপত্তন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হইলে দশ ঘণ্টার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং সামান্য মাত্র রৌপ্যমুদ্রা ব্যয়ে টিকিট ও আহারের বন্দোবস্ত হইতে পারে। নাগপত্তন একটি ভুবনবিখ্যাত বন্দর, ইহা সমুদ্র কূলে অবস্থিত এবং দেখিতে অতীব নয়নানন্দদায়ক। তাঞ্জোর জেলার অধীনে ইহা একটি বিখ্যাত মহকুমা। যাহাহউক, তদ্দেশীয় "ঝট্‌কা" নামক এক প্রকার অদ্ভুত অশ্বযানে নেগাপটমে আরোহণ পূর্ব্বক ন্যূনাধিক সার্দ্ধেক পঞ্চ মাইল দূরে গেলে নাগোরে উপস্থিত হওয়া যায়। রাস্তাটী আপদ্‌শূন্য এবং প্রশস্ত ও পরিষ্কার। এক সময়ে ফরাসীরা নাগোরের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে ইহা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত। নাগোর হইতে একটু দূরে যাইলে ফরাসিদিগের কারিকোল এবং দিনেমারদিগের ট্রাণ্‌কুইভার (Tranquevar) রাজ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নাগোরকে একটি বৃহৎ গ্রাম বলিলেই হয়। ইহার প্রায় বার আনা মুসলমান এবং বাকি চারি আনা হিন্দু ও অপরাপর জাতি। গ্রামে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ আফিস, ডাকখানা, থানা, ছোট স্কুল, বাজার এবং আবকারী বিভাগ ভিন্ন কোন

কাছারী বা আদালত নাই। এই গ্রাম নোগাপটন মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। দ্বার, যেখানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হয়, তাহা সমাধি-মন্দিরের প্রথম (ফটক) হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে অবস্থিত। এই সীমার পরে কোন প্রকারের যান লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে অম্বরাল ( ছাতা ), পদরক্ষী ( জুতা ) এবং যষ্টি পরিত্যাগ করা আবশ্যক; সময়ে সময়ে মাথার টুপি ও পাগড়ি খুলিয়া যাইতে হয়। সমাধি মন্দিরের শোভা ও সম্ভ্রমের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তির বিবরণ দিতে আকাঙ্খা করি। শুনা যায় প্রায় এক শত ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে এক জন গৈরিকবসনধারী মহাপুরুষ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নাগোরে উপস্থিত হয়েন। একটি বৃক্ষতলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করিয়া তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন। জনপ্রবাদ আছে, তিনি মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত ঐ তরুতলেই অবস্থান করিয়াছিলেন, কখনও অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্যও তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। বর্ষার পর বর্ষা, শীতের পর শীত, গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম, এইরূপে ক্রমান্বয়ে অনেক বৎসর কাল ব্যাপিয়া তাঁহার মাথার উপর দিয়া কত বার বড়ঝড় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব মহাপুরুষ এক দিনের জন্যও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনন্য সাধারণ বহুদর্শন, দেবোপম সুন্দর স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং তৎসঙ্গে মৃদু হাস্য, মিষ্টভাষণ ও প্রিয় ব্যবহার সমগ্র হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ও ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, লোকে তাহা বুঝে নাই এবং তিনিও কাহাকে বুঝান নাই। সন্তোষ সহকারে যে যাহা দিত তাহাই খাইয়া তিনি ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেন। মুসলমান শাস্ত্রে এবং মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও ভক্তি দেখিয়া মুসলমান তাঁহাকে মুসলমান ভাবিত, এ দিকে হিন্দুশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং হিন্দুধর্ম্মে অচলা ভক্তি দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দু বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত পক্ষে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা

কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই ; বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মভাব তাঁহার জীবনের অত্যুজ্জল অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। পরমহংসের যাহা আশ্রম, তিনি সেই আশ্রমাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম তাঁহাকে কোনও নিয়মবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। কোরাণ পড়িলে তাঁহাকে মুসলমান এবং পুরাণ পড়িলে তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম হইত। আহারে.বিচারে এবং বেশভূষায় হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী উভয় ভাবমিশ্রিত ছিল। ক্রমে ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত তিনি প্রখ্যাত হইয়া পড়িলেন, বহুদূর দেশ হইতে তাঁহার দর্শনাকাঙ্খী হইয়া দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। এইরূপ পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিয়া, বহুসংখ্যক অনাথ ও রুগ্নের পরমোপকার সাধন করিয়া এবং অসংখ্যাসংখ্য মায়ামগ্ন সংসারী মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিয়া, ভগবানের পদারবিন্দ চিন্তা করিতে করিতে সহাস্যবদনে এই অপূর্ব্ব মহাপুরুষ ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। সেই পবিত্র তরুতলে তাঁহার নশ্বর মৃতদেহ পড়িয়া রহিল ; হিন্দুরা শবদেহ দাহন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলে মুসলমানেরা বলিল, "ইনি ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং দফন্ ভিন্ন দাহন হইতে পারে না!" এই কথা লইয়া হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয় মধ্যে ঘোরতর বিবাদ এবং ক্রমে ঘোরতর লড়াই বাধিয়া উঠিল। প্রবাদ বাক্যে শুনা যায়, যখন হিন্দু ও মুসলমানের লড়াই চলিতেছিল, তখন এই মহাপুরুষের মৃতদেহ অদৃশ্য হইয়া যায়। শবদেহের সন্ধান না হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মূকভাব অবলম্বন করেন।

কিছুদিন পরে মুসলমানেরা প্রচার করিল যে, একটা ক্ষুদ্র বনের ভিতর মৃত মহাত্মার শবদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা ইহাও প্রচার করিল যে, "আমরা প্রত্যাদেশে ( By inspiration ) জানিয়াছি, ইনি সৈয়দবংশ সম্ভূত মুসলমান ছিলেন। আমরা এক্ষণে তাঁহার সমাধি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।" অল্পসংখ্যক এবং হীনবল হিন্দুরা সে কথা মানিয়া লইল, সুতরাং সেই তরুতলে মহাত্মার কবর-

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। মহাত্মার প্রকৃত নাম কেহ জানিত না, সেই দিন হইতে তিনি মার সাহেব নামে প্রখ্যাত হইলেন, কিন্তু হিন্দুর আজিও বিশ্বাস, তিনি হিন্দু ছিলেন। অনেক বৎসরের চেষ্টায়, পরিশ্রমে, যত্নে এবং প্রভূত অর্থব্যয়ে এই সমাধি-মন্দির বিনির্মিত হইয়াছে। বাস্তবিক নাগোরের সমাধি জগতে এক অদ্ভুত পদার্থ। ইহা দেখিবার উপযুক্ত এবং ইহার বিবরণ শুনিবার ও পড়িবার যোগ্য।

আমরা এইবারে এই বিখ্যাত সমাধি মন্দিরের শোভা ও সম্ভ্রমের কথা বলিব। সমাধি-মন্দিরের প্রথম দ্বারে (কটকে) উপস্থিত হইলে একটি দীর্ঘ কিন্তু অনতিউচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীর ও দ্বারের চারিদিকে কোরাণের বহুসংখ্যক শ্লোক সুন্দররূপে খোদিত আছে। এই প্রাচীর প্রস্তর নির্মিত। প্রথম দ্বার পার হইবার পরে বড় বড় ইষ্টকে গাঁথা একটি প্রশস্ত ভূমিখণ্ড দেখিতে পাইবেন। ইহার চারিদিকে নানা প্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্তম্ভ বর্ত্তমান। এই সকল স্তম্ভ দেখিতে অতীব মনোহর, স্তম্ভখণ্ড পার হইয়া গেলে আর একটি এবম্প্রকার খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকগুলি সুরম্য কুটীর বর্ত্তমান। এই সকল কুটীরে ফকীরেরা ও অনাথ ব্যক্তিবৃন্দ বাস করিয়া থাকে, ইহার চারিদিকে লোহ পিত্তল ও প্রস্তরের খুব বড় বড় স্তম্ভ সুশোভিত আছে, এই সকল স্তম্ভের এক একটার বর্ণনায় এক একটা প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম স্তম্ভের উপরে স্বর্ণের কলস বসান আছে, তাহা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র (অর্থাৎ মহরমের সময়ে) নামাইয়া আনা হয়, উহাতে ফুল ভরা থাকে। এই খণ্ডের বাম পার্শ্বে মনোহর ফলফুলের উদ্যান, তাহার শোভা চিত্তহারিণী। তদনন্তর একটী সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে মুসলমানদিগের নেমাজের জন্য আয়োজন সমূহ সংগৃহীত থাকে, তাহার পরেই নাগোর-সমাধি দেখিতে পাইবেন। দূর হইতে দেখিতে ইহা তাজমহলের ন্যায়। এই সমাধি অতি আশ্চর্য্য কৌশল সহকারে কাষ্ঠ,

ইষ্টক, লৌহ এবং প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গাঁথনি সুদক্ষ মিস্ত্রীদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচায়ক। সমাধি-মন্দিরের ভিতরে বাবা মীর সাহেবের সমাধি আছে; তাহার সম্মুখে ও পার্শ্বে অহোরাত্র মম বাতি জ্বলিয়া থাকে। এই সমাধিটিতে বহুমূল্য ও বহু সৌন্দর্য্যযুক্ত ঝাড়, দেয়ালগিরি, ফানস লণ্ঠন প্রভৃতি ঝোলান আছে উপরে স্বর্ণখচিত মকমলের চন্দ্রাতপ এবং তাহার চারি দিকে বিশুদ্ধ রজত নির্ম্মিত ফুলমালা দেখিতে পাওয়া যায়। আতর, গোলাপ, চন্দন, অগুরু মৃগনাভি বিমিশ্রিত ধূপ, গোলাপ মিশ্রিত ধূনা প্রভৃতির সুগন্ধিতে সমাধি মন্দির চব্বিশ ঘণ্টাই "মেহক্" হইয়া থাকে। মন্দিরে প্রতিদিন দিবা বেলা একাদশ ঘটিকার সময় এবং সায়াহ্নে পঞ্চম ঘটিকা হইতে সপ্তম ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনা, ভোগ পূজা প্রভৃতি হইয়া থাকে। দিবসে তিন বার, রাত্রে দুই বার এবং ভোরে এক বার নহবৎ বাজে। মীর সাহেবের কবরটী অতি মূল্যবান এবং অতি সুন্দর লৌহ ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, আকার খুব বড় নহে, ইহার চারি দিক বিশুদ্ধ স্বর্ণ দিয়া মোড়া এবং মধ্যভাগে হীরকখচিত স্বর্ণ কুসুমগুচ্ছ বর্ত্তমান। প্রতিদিন এখানে দশ মণ চাউলের "ভোগ" হইয়া থাকে, অনেক দীন-হীন তাহাতে প্রতিপালিত হয়। ময়দা ২২ সের পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকে। বাউরচির সংখ্যা ১৫ জন, ভৃত্যের সংখ্যা ২৭, দাসীর সংখ্যা ১৯, মোল্লার সংখ্যা ১৩, মৌলবীর সংখ্যা ১৫, কাজীর সংখ্যা ২৭, এবং বিদ্যার্থী বালকদিগের সংখ্যা ১৬৪; এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন বেতন-ভোগী লোক এখানে কার্য্য করে। সমাধি মন্দির পার হইয়া গেলে আর একটী খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার শোভা অত্যন্ত মনোমোহিনী। এই স্থানে বহু বিধ সুন্দর পদার্থ দেখিবার আছে। ইহার পার্শ্বে অনেক ছোট বড় মসজিদ এবং দরগা প্রতিষ্ঠিত; তাহার পরে একটি বৃহৎ এবং সুন্দর সরোবর, তদন্তর একটী অদ্ভুত "সুড়ঙ্গ" এবং তাহার অব্যবহিত পরে আবার ফল ফুলের বাগান। এই সকল

স্থানে কত যে মসজিদ, কামরা, স্তম্ভ দরগা প্রভৃতি আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রতি শুক্রবারে "বড় নেমাজ" হইবার সময় প্রায় দ্বাদশসহস্র মুসলমান একত্র হয়। বড় বড় ধনবান মুসলমানেরা মধ্যে মধ্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এখানে স্বজাতীয়দিগকে খাওয়াইয়া থাকে, এই ভোজের নাম "নেওয়াজ।" নাগোর সমাধির সম্পত্তি এবং আয় এত অধিক যে ইহার তত্ত্বাবধান জন্য একজন স্পেশাল তহশীলদার নিযুক্ত আছেন, তাঁহার কাছারী মন্দিরের প্রাঙ্গণ মধ্যে অবস্থিত। শান্তি রক্ষার জন্য পুলাশ এবং "আজান্" দিবার জন্য বার জন বলবান মুসলমান দিবা রাত্র তথায় উপস্থিত থাকে। অসংখ্য হিন্দু এই মসজিদে নিত্য উপস্থিত হয় এবং অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ মীর সাহেবের নামে বহুমূল্য দ্রব্যাদি এবং বস্ত্র, চাউল, ঘৃত শর্করা প্রভৃতি উৎসর্গ করেন। এই দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। এই দৃশ্য অতি সুখকর! হিন্দু ও মুসলমানের ইহা অতি আনন্দজনক সম্মিলন স্থল। নাগোরসমাধি স্থলে দণ্ডায়মান হইলে চিত্ত মধ্যে অতীব পবিত্র ভাবে মহাপুরুষদিগের প্রতি ভক্তির উদয় হয়। ইহা ভক্তের পক্ষে প্রাণশীতলকর স্থান, ইহা মহাপুরুষদিগের মাহাত্ম্য প্রকাশক পবিত্র ক্ষেত্র। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# ফটিক জল।

যখন যে দিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই

"পিপাসা' 'পিপাসা' লেখা জলন্ত ভাষায়।

শ্রবণে কে যেন ঐ পিপাসা বাজায়"

নিরদয় নিদাঘের মারাত্মক মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডময়ূখমালায় বিদগ্ধ হইয়া এক অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থ মহীরুহ-মূলে উৎকণ্ঠায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তিতে শান্তি অনুভব করিলাম। অনন্ত আকাশের দিকে

নয়নদ্বয় নিপতিত করিয়া দেখিলাম, অষ্টমাসকালব্যাপী অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন আকাশে যেন আগুন জ্বলিতেছে এবং পঞ্চভূতময়ী পৃথিবী যেন লৌহবৎ নীরস বিরস ও কঠিন হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকাশের কোণে এক ক্ষুদ্র মেঘের উদয় হইল, মেঘের ছায়ায় দিনমণি লুপ্ত হইয়া গেল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মেঘাবৃত সূর্য্য হীনতেজ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে উষ্ণতার অনতা অনুভূত হইল না। মেঘের অন্তস্তর হইতে দিবাকর আবার দেখা দিল, আবার আবৃত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী সতী আসিয়া হাসিল, সেই কৃষ্ণমেঘের কোলে হিরণ্ময় বড়ই শোভাকর! মৃত্যুদশাগ্রস্ত রোগীর ক্ষীণ হাস্যের ন্যায় মেঘের মৃদুমধুর হাসির আলোকে দেখিলাম সেই কালমেঘের কোলে একটি শুভ্রকায় ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া উড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দৌড়িয়া দৌড়িয়া তানলয় সহকারে সুস্বরে স্বর্গীয় গীত গাহিতে গাহিতে দিক্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। নিরাশার তামস অন্ধকারে আনন্দময় আলোক আসিলে, মনে যেমন আহ্লাদ হয় অথবা তামসী রজনীতে তরুশাখায় তমোমণির (খদ্যোতের) দীপ্তি যেমন আনন্দের কারণ হয়, আকাশের কোলে মেঘের উদয় দেখিয়া উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বিমান-বিহারী বিহঙ্গ উৎফুল্লতার উৎসাহ দিতে প্রবৃত্ত হইল। মেঘের পদদেশে মস্তক রাখিয়া বিহঙ্গরাজ বলিল, 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। মেঘের মধ্যে বিজলী সুন্দরী আবার হাসিল, সেই হাসিতে ক্ষুদ্র মেঘ বিহঙ্গের প্রার্থনাকে তাড়াতাড়ি উড়াইয়া দিল। "জল" দেহি" "জলং দেহি" বলিয়া বিহঙ্গবর বার বার ডাকিতে লাগিল, মেঘের পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া কত কি অনুনয় বিনয় করিল, নিদাঘের নির্দ্দয় মেঘ সে কথায় কর্ণপাত করিল না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাখী আবার বলিল, 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। এই ক্ষুদ্র পাখির নাম চাতক। 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' রবে অনন্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল, চাতকের তানলয়সমন্বিত সুস্বরে দেবলোক পর্য্যন্ত মধুময় হইয়া উঠিল, কিন্তু নিদাঘের নির্দ্দয়

মেঘ তাহাতে বিগলিত হইল না, কাতরকণ্ঠ পাখির করুণস্বরে মেঘের প্রাণ গলিবে কেন? নিদয়ের নীরস হৃদয় কভু কি কাতরের কাতরোক্তিতে গলিয়া থাকে? অনন্ত আকাশের কোল ঘনকে প্রেমিক ভাবিয়া চাতকিনী কুলকিনী হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের সরলতা অপেক্ষা পুরুষের কঠোরতা কঠিনতর।

পাখি আবার ডাকিল, ফটিক জল'। পাখির পুনঃ পুনঃ চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া নভোমণ্ডল মুখব্যাদানপূর্ব্বক কহিল, "রে, নির্ব্বোধ বিহঙ্গ। অনাবৃষ্টি বশতঃ আমি নীরস ও বিরস হইয়া আছি, আমার নিকটে জল প্রার্থনা করা মূর্খতার পরিচায়ক মাত্র।" চাতক কহিল, 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। ক্ষুদ্র বিহঙ্গের অমিত অধ্যবসায়, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক দিনদেব বলিল, "প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালায় তুমি বিদগ্ধ হইয়া যাইবে ক্ষুদ্র বিহঙ্গ। আকাশে জল নাই, মর্ত্তে জল থাকে"। 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' বলে পাখী কহিল, মর্ত্তের জল অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য, আমি স্বর্গের নিষ্কলঙ্ক ফটিক জলের প্রত্যাশী, কলঙ্কিত মর্ত্ত্যসলিলে আমার প্রয়োজন নাই।" পাখী আবার ডাকিল 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। পিপাসিত পাখির মধুর কণ্টক জলরবে জলদ হইতে জল পতিত হইল না বটে, কিন্তু স্বর্গ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, দেবলোকের সতিন্দবীগণ ধন্য ধন্য বলিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আকাশকে সম্বোধন করিয়া চাতক বলিল,—

"পদলেবু সরসীষু অম্বুধৌ
জীবনং ন চ শিরোনতিং বিনা।
ইথ্মেব জলদং প্রতীক্ষতে
মানবজীবন ধনোহি চাতকঃ॥"

ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সিংহনাদে—বজ্রগম্ভীর স্বরে—মেঘ বলিল, "রে, নির্ব্বোধ বিহঙ্গ! সাগরে, সরোবরে, নদে, নদীতে, তড়াগে

দীর্ঘিকায়, খালে, বিলে নির্ম্মল জলের অভাব নাই, তুমি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া এই প্রচণ্ড নিদাঘের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া বিমানপথে কেন কষ্ট পাইতেছ? আমার ভাণ্ডারে জল নাই, মর্ত্ত্যে গিয়া সুশীতল ও সুনির্ম্মল সলিলপানে পিপাসা দূর করা তোমার পক্ষে সহজ।" ফটিক জল' 'ফটিক জল' রবে চাতক উত্তর দিল—

"কি সাগর কি পল্বল কিবা সরোবর।
রহে সুপ্রচুর জল তাহে নিরন্তর॥
চাতক তথায় যদি করে জলপান।
মাথা হেঁট হবে তার, হয় অপমান॥
তাই সে মেঘের পানে তাকাইয়া রয়।
মান চাতকের প্রাণ, জানহ নিশ্চয়॥"

ক্রমে পশ্চিম দিক হইতে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল, বায়ুর আন্দোলনে ক্ষুদ্র মেঘ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। জলদ হইতে জলের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিপাসিত পাখী (চাতক) মর্ত্ত্যধামে নামিয়া আসিল, মর্ত্ত্যের জল সে স্পর্শও করিল না। পার্থিব পিপাসা মিটিল না; পিপাসিত চাতক প্রবল পিপাসায় প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কাতর কণ্ঠ চাতকের প্রবল পিপাসা স্বর্গধামে পরিতৃপ্ত হয়, মর্ত্ত্যে হয় না। মহতের—ধার্ম্মিকের—মহাবীরের প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় ঠিক চাতকের মত। ক্ষুদ্র চাতকের 'ফটিক জল' তানে মহতের মহান্ প্রাণকে মাতোয়ারা করে। হায়! যে দেশে চাতক নাই, সে দেশ কি হতভাগ্য। যে আকাশে চাতক উড়ে না, সে আকাশ কি অপবিত্র!! ঐ দেখ, ঐ দেখ, মর্ত্ত্যের মৃত চাতক দেবলোকে গিয়া পিপাসিত মানবের দিকে তাকাইয়া শিখাইয়া দিতেছে, "মর্ত্ত্যের জল মলিন, মর্ত্ত্যের জল মলিন; যদি পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে চাও; তবে এক মাত্র ভরসা—স্বর্গের ফটিক জল, ফটিক জল।"

আকাশের চাতক আকারে ক্ষুদ্র হইলেও চরিত্রে মহান্। চাতকের

চরিত্র অনুকরণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ক্ষুদ্র চাতকের অধ্যবসায় পরিশ্রমপরায়ণতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান প্রভৃতি অনুকরণের বিষয়। চাতকচরিত্র অতি চমৎকার। চাতকচরিত্র শিক্ষার ভাণ্ডার। হিন্দুর সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মী ঐ চাতকিনীর অনুরূপা। হিন্দুর পতিপ্রাণা সতীলক্ষ্মী সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আশায় নিরাশায়, ইহলোকে পরলোকে "পতিকূলে ধ্রুব" থাকিয়া সতী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। পিপাসিত চাতকের পিপাসা মেঘের ফটিক জল বিনা শান্তি হয় না, হিন্দুরমণীর ধর্ম্মসঙ্গত এক পতি ভিন্ন অন্য পতিতে প্রবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি নাই, হিন্দুরমণী যাঁহাকে একবার দেহ মন ও আত্মা সমর্পন করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা ভাবে *নিজের সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য* কৃতান্তদূত সম্মুখেও সতি সাবিত্রী মৃত পতি সত্যবানের পবিত্র শরীর স্বকীয় ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট। হিন্দু সতী মৃত পতির জলন্ত চিতায় জীবন্ত দশায় পুড়িয়া মরিতে পারে, কিন্তু চাতক-চরিত্র ছাড়িতে পারে না; যবন শাসন কালে অসংখ্যাসংখ্য চিতায় অসংখ্যাসংখ্য রাজপুত ও ক্ষত্রিয়-রমণী পুড়িয়া মরিয়া পবিত্র স্বর্গলোকে সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু তথাচ চাতকচরিত্র ছাড়ে নাই। হিন্দুর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে চাতক চরিত্রের সহধর্ম্মিণী ছিল বলিয়া হিন্দুসমাজ এত প্রাচীন এত পবিত্র এবং এত সুদৃঢ়। হিন্দুগৃহে এখনও কোটি কোটি চাতকিনী আছে বলিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব এখনও লুপ্ত হয় নাই। পবিত্র হিন্দু গৃহ হইতে যে ব্যক্তি চাতকিনীর বৃত্তি ও প্রবৃত্তি নাশ করিতে চায়, সে ব্যক্তি হিন্দুর পরম শত্রু, সে ব্যক্তি সতী স্ত্রী-সমাজের পরম বৈরী এবং ভারতের মহা অনিষ্টকর দুর্ম্মন। স্বামীর দিকে চাহিয়া হিন্দুর গৃহগগনে সতী চাতকিনীর 'ফটিক জল' তান বড়ই মধুর, বড়ই পবিত্র, বড়ই শ্রুতিসুখকর। হিন্দু স্ত্রী, সধবা বিধবা এই উভয় অবস্থাতেই চাতকিনীর অনুরূপা। ত্রিদিবসঞ্জাত ফটিকজল ভিন্ন মর্ত্ত্যের মলিন

সলিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। হিন্দুরমণী অরুন্ধতীর ন্যায় প্রেমিকা' ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় নিশ্চলা। হিন্দুর ইতিহাস সমাজ ধর্ম্ম, রাজনীতি, আচার ব্যবহার, যে দিক দিয়াই দৃষ্টিপাত করি, চাতক চরিত্রের মহাপুরুষের মহিমান্বিত মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হই। সংসারে বৈরাগ্যে জীবণে মরণে হিন্দুর "ফটিক জল' "ফটিক জল রব লোপ পায় না। হিন্দুর ধর্ম্মপিপাসা বড়ই প্রবলা। হিন্দুধর্ম্মের উপরেই হিন্দুর সমগ্র জীবন এবং জীবনান্তে সমগ্র পরলোক প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু হিন্দুর পিপাসা কখন মর্ত্ত্যের মলিন জলে পরিতৃপ্ত হয় নাই। সা ত্বিক অথবা ঔদাসিক যে ভাবেই হিন্দুর জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, হিন্দু চিরকালই চাতক চরিত্রের অনুকরণ করে। প্রাচীন ভারতাকাশে অসংখ্য চাতক ছিল এবং বর্ত্তমান ভারতগগনে এখনও অনেক চাতক ও চাতকিনী আছে বলিয়া ভারতভূমির নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে লোপ পায় নাই, ভারতভূমি ভারত মহাসাগরের অতলগর্ভে নিমগ্ন হয় নাই এবং এক সহস্র বর্ষাধিক বিদেশীয় শাসনেও হীনবীর্য্য হিন্দু "গজভুক্ত কপিত্থ"বৎ অসার হইয়া যায় নাই।

দানশক্তিতে দয়াময় দাতাকর্ণের আশ্চর্য্য চাতক চরিত্র অবলোকন কর, ইনি স্বহস্তে স্বপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া অতিথির সৎকার এবং ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ করেন। ইনি নিজের অটল প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিতপদ হয়েন নাই। ভক্তাধিক ভক্ত প্রহ্লাদের অধ্যাবসায় ও প্রতিজ্ঞা আরও চমৎকার, অনলে অনিলে, সলিলে বৃহিলে, সিংহমুখে হস্তীপদতলে, অমর প্রহ্লাদ স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করে নাই। বালক ধ্রুবের চাতক-চরিত্র ভূতলে অতুল। ভ্রাতৃভক্ত ভরতের রামভক্তি, ঠাকুর লক্ষ্মণের অগ্রজসেবা এবং অশোককাননে অবরুদ্ধা মা জানকীর রামপদে আত্মোৎসর্গ, চাতক ও চাতকী চরিত্রের অনুরূপ। রাজীবলোচন রামপ্রাণা সীতা সতীর উদ্ধারার্থে সাগর-বন্ধন, অমিত কষ্ট স্বীকার, অসাধারণ অধ্যবসায়, অটল প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির

হনুমানই অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কারণ গুরুপদভক্ত আত্মোৎসর্গী হনুমান সেকালের ভারতগগনে চাতকরূপে বর্তমান ছিলেন। নানক শিবজি গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ভারত চাতক ছিলেন না কি? "কটিক জল, কটিক জল" এই তানে ইঁহারা 'স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়স্কর তথাপি ভয়াবহ পরধর্ম্মের অবলম্বন অশ্রেয়,' এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ গঙ্গা, গায়ত্রী, বেদ স্বধর্ম্ম ইত্যাদির মর্য্যাদা রক্ষণ জন্ম আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। চাতকের চরিত্র কি সুন্দর, কি পবিত্র॥

বীরপ্রসূতি রাজপুতনার প্রতাপসিংহ ভারতগগনের অতি সুন্দর চাতক। হিন্দুর রাজনৈতিক গগনে এমন কয়টি চাতক দেখা যায়? দেবাসুর যুদ্ধ দধীচি মুনি দেবতাদিগের ধর্ম্মরক্ষার দ্বারা স্বার্গের রাজ্য স্থাপন অত্যাচারের দমন এবং নিরপরাধীকে অভয়দান করিবার জন্ম হাসিতে হাসিতে স্বকীয় পৃষ্ঠদেশস্থ অস্থি উঠাইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন আর প্রতাপসিংহ যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া অনাহারে, অপমানে, পিপাসায়, কষ্টে, কাতরতায় দারিদ্র্যদুঃখে বনে বনে কাঙ্গাল বেশে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশোদ্ধারে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তথাপি মুসলমানের প্রলোভনে বশীভূত হইয়া স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেন নাই। বনের ফল, ঝরণার জল, এবং ভীলের লবণ ইঁহার গ্রহণীয় ছিল, মুসলমানের প্রদত্ত ধনধান্ত ও মানসন্মান ইনি তুচ্ছ করিয়াছিলেন। পরাধীনতার প্রচুর জলে হইঁার পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে কেন? ইনি স্বাধীনতার এক বিন্দু কটিকজলে পিপাসার পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন। দেশোদ্ধারে চাতকের চরিত্র কি সুন্দর, চাতকের প্রতিজ্ঞা কত মধুর এবং চাতকের কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় কেমন শিক্ষার উপযুক্ত।। স্বদেশের স্বজাতির সমগ্র জগতের কল্যাণার্থ চাতক চরিত্রের অনুকরণ একান্ত আবশ্যক।

আকাশস্থ মেঘের কটিক জলে পিপাসিত চাতকের পিপাসা মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু সমগ্র সংসারের পিপাসা কভু মিটিয়াছে বা মিটিতে

পারে কি? দেখিতেছ না, সমস্ত বিশ্বসংসার কেমন আশ্চর্য্যরূপে পিপাসু; পিপাসাই সমগ্র জগতের পালনের উপায়. পিপাসা না থাকিলে জগতের গতি বন্ধ হইয়া যাইত। কেবল কি চাতকই পিপাসু? পিপাসা কাহার নাই? দেখিতেছ না, এই জগত পিপাসা ও পিপাসার ধ্বনিতে প্রতি পদে পদে প্রতিধ্বনিত। পিপাসা কাহার নাই? ধনীর ধনপিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, বিদ্বানের জ্ঞান-পিপাসা,— সকলই পিপাসা, সকলই পিপাসাময়!।

"যখন যেদিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই,
পিপাসা পিপাসা লেখা অনন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যেন ঐ পিপাসা বাজায়॥'

"নিশীথ সময়ে গৃহছাদে উঠিলাম। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ছিল, কোটি কোটি চন্দ্র তারকা হীরকপ্রভায় জ্বলিতেছিল। আমার পোড়া চক্ষে দেখিলাম—ঐ তারকা-অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা।" * * দেখিলাম, এই বিশ্বজগত সত্যই পিপাসু।"

"কুসুমকাননে আমি কি দেখিতে পাই? কুসুম হেলিয়া ঢলিয়া বলে, "পিপাসা, পিপাসা।" লতায় পাতায় লেখা "পিপাসা।" কুসুমের মনো-মহিনী মৃদু হাসি, আমি দেখি না। আমি দেখি, কুমুদের সুধাংশু পিপাসা।"

বিহগ-কুজনে আমি কি শুনিতে পাই? ঐ পিপাসা আর পিপাসা।। ঐ একই শব্দ নানা সুরে নানা রাগে শুনি,—প্রভাতে ভৈরবী, নিশীথে বেহাগ, কিন্তু কথা একই। কোকিল যে ডাকিয়া উঠে "কুহু"—ঐ কুহুস্বরে শত প্রাণের বেদনা হৃদয়ের পিপাসা ঝরে!"

"চল হৃদয়, তবে নদীতীরে যাই,—সেই খানে হয়ত পিপাসা নাই। কিন্তু ঐ শুন! স্নিগ্ধ সলিলা গঙ্গা কুল কুল স্বরে গাহিতেছে—পিপাসা, পিপাসা! আপন মনে গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে। এ কি! তুমি স্বয়ং জল, তোমার আবার পিপাসা কেমন? উত্তর পাইলাম, 'সাগর-পিপাসা'। আহা! তাই ত সংসারে তবে সকলেই পিপাসু? হইতে

পারে, সাগরের—যাহার চরণে জাহ্নবী! তুমি আপনাকে ঢালিয়াছ, তাহার পিপাসা নাই। তবে দেখা যাউক।"

একদিন সিন্ধুতটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের ঢেউ গণনা করিতেছিলাম। তরঙ্গমালা কি যেন যাতনায়, কি যেন বেদনায় ছটফট করে—গড়াইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে। তাহাদের এই অস্থিরতা, আকুলতা, কিসের জন্ত ? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তব ওই সচঞ্চল লহরীমালায়
কিসের বেদনা লেখা ?—পিপাসা জানায়!
পিপাসা নিবৃত্ত হয় সলিল-কৃপায়
বলহে জলধি! তব পিপাসা কোথায় ?"

"আবার তাহার গভীর গর্জ্জনে শুনিলাম, 'পিপাসা!' 'পিপাসা!' তোমাকে কে বলিয়াছে আমার পিপাসা নাই? এই হৃদয়ের দুর্দান্ত পিপাসা কেমন করিয়া দেখাইব? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল। এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই? অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে! পিপাসা, পিপাসা, এইটুকু বুঝিতে পার না? ধনীর ধন পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, সংসারীর সংসার-পিপাসা। নলিনীর তপন-পিপাসা, চকোরের চন্দ্রিকা-পিপাসা!! পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কি লক্ষ্য করিয়া? আমার হৃদয়ে অনন্ত প্রণয় পিপাসা —যত দিন আছে, পিপাসাও ততদিন থাকিবে। প্রেমিকের প্রেম-পিপাসা,—প্রকৃতির ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের সকলেই প্রেমপিপাসী। ঈশ্বর প্রেম, এ বিশ্বজগতপ্রেম-পিপাসু।"

হিন্দুর ধর্ম্ম পিপাসা বড়ই প্রবল। ধর্ম্মের নামে হিন্দু সকল প্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে। হিন্দুজাতি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ। হিন্দু ধর্ম্মে খায়, ধর্ম্মে পরে, ধর্ম্মে শোয়, ধর্ম্মে বাঁচে এবং ধর্ম্মে মরে। ধর্ম্মপিপাসায় হিন্দু প্রাণ দেয়। চাতক-চরিত্র হিন্দুর কাছে বড় পবিত্র চরিত্র। সেই বঙ্গ আজ বৈশাখ মাসের এই

অক্ষয়া তৃতীয়া তিথিতে অধঃপতিত হিন্দু জাতিকে সম্বোধন করিয়া এই গৈরিক বসনধারী জীর্ণ শীর্ণ দেহী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ভ্রাতৃভাবে বলিতেছে; "আইস ভাই, হিন্দু, আইস, যদি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে পার, যদি হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পার তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি এই বৈশাখ মাসের অক্ষয়া তৃতীয়া তিথিতে তোমাকে চাতক পুরাণের ফটীকজল-মাহাত্ম্য শুনাইতে ইচ্ছা করি।" হে ভগবান! হে পরমারাধ্য পরমেশ্বর! এই দীন হীন অধম সন্ন্যাসীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, স্বদেশের নামে, স্বজাতির নামে, স্বধর্ম্মের নামে এবং বিশ্বপ্রেমের নামে, আমরা যেন আজীবন তোমার পবিত্র পদ-রেণুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যপিপাসায় পিপাসু অন্তঃকরণে আত্মার কল্যাণার্থ, ভক্তিকণ্ঠে, বলিতে পারি—"ফটিক জল, ফটিক জল, ফটিক জল।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# মশালী মাতা

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ কালে, পৌষের দুরন্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি অষ্টম ঘটিকার সময় যৌনপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। একে শীত কাল, তাহাতে আকাশে মেঘ, বিশেষতঃ পরিচিত বন্ধুদিগের বাসস্থানগুলি ষ্টেশন হইতে অনেকদূরে, সুতরাং আমি গোমতী নদী তট গমন করিয়া একটী প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ে নিশিযাপন করিলাম। আমার সঙ্গে পঞ্জাব প্রদেশের হমির সিং নামে একটী যুবক সহচররূপে বেড়াইতেছিল। আমি এবং হমির সিংহ উভয়েই যৌনপুরে গিয়াছিলাম। প্রয়াগতীর্থে যাইবার আমার সঙ্কল্প ছিল কিন্তু যৌনপুর জিলার অন্তর্গত হাঁড়িয়াদহ নামক স্থানে কোন

বিশেষ প্রয়োজন থাকাবশতঃ আমি আপাততঃ আলাহাবাদে (প্রয়াগ-তীর্থে) না গিয়া হমিরসিংকে তথায় পাঠাইয়া দিলাম। পাঠক মহাশয়-দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকে জানেন, পৌষের সংক্রান্তি হইতে মাঘের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই এক মাস কাল অনেকে প্রয়াগের গঙ্গা গর্ভে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, শাস্ত্রমতে এরূপ বাসের নাম "কল্পবাস"; কল্পবাসের অনেক সুফল প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। প্রতি বৎসর প্রয়াগের গঙ্গাগর্ভে ঐ সময়ে শত শত কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। নিরামিশাষী হইয়া, সাংসারিক সকল কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অতীব শুদ্ধাচারে, শুদ্ধ মনে, কেবল ভগবৎ উপাসনা এবং শাস্ত্রালোচনা ও পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা সময় যাপন করিতে হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমি "ভূজঙ্গ ব্রত" ধারণ করিয়া ছিলাম; সেই ব্রতের উদ্‌যাপন জন্য একমাস "কল্পবাস" করিতে আমি বাধ্য ছিলাম, কিন্তু এই দুরন্ত শীতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গাগর্ভে কুটীর বিনা থাকা অসম্ভব বিবেচনায় একটি ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ জন্য হমির সিংহকে প্রয়াগ পাঠাইয়াছিলাম। সে চলিয়া গেলে আমি হাঁড়িয়াদহ রওয়ানা হইলাম। হাঁড়িয়াদহ যৌনপুর জিলার একটী মহকুমা; পশ্চিম*প্রদেশে মহকুমাকে তহশীল বলে এবং তহশীলের অধিকর্ত্তা মহাশয় তহশীলদার বলিয়া সম্বোধিত হয়েন। তহশীলদারেরা সেখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং তদ্ভিন্ন রেভিনিউ মোকদ্দমা করিতেও ক্ষমতাপন্ন; আমি হাঁড়িয়াদহের তহশীলদারের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলাম। এই সচ্চরিত্র, ধর্ম্মভীরু এবং শিক্ষিত ভদ্র লোকটিকে আমি অনেক দিন হইতে চিনিতাম, ইনি হিন্দুস্থানী কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার বাসাবাটীতে থাকিতে থাকিতে একদিন সায়াহ্ন কালে থানার দারোগা আসিয়া রিপোর্ট করিল "হুজুর! কয়েক দিবস হইতে এখানে একজন বিদেশিনী স্ত্রীলোক আসিয়াছে, সে কাহার সহিত কথা কহেনা, ভিক্ষা করিতেও যায় না, কোনও কর্ম্ম করে না, বাজারের লোকেরা কিছু খাইতে দিলে

তাহাই খায়। ছিন্ন কন্থা দ্বারা তাহার গাত্র আবৃত, মাথায় ভস্ম ভরা, পরিধানে অতি মলিন গৌরিক্ বসন এবং বয়সে বুড়ী। সদর রাস্তায় গিয়া সে হাসে,কাঁদে, লম্ফ দেয়, দৌড়া দৌড়ি করে কিন্তু কাহারও প্রতি অত্যাচার করেনা। তাহাকে পাগলী বলিয়াই আমার বিশ্বাস। হজুরের যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে ঐ পাগলীকে গ্রেপ্তার করিয়া পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্ত পাগলখানায় পাঠাইয়া দিব।" কথা শুনিয়া তহশীলদার প্রায় দশ মিনিট কাল নীরব রহিলেন, তাহার পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "দারোগা! ঐ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তুমি এবং আমি কিছুই জানি না। হইতে পারে সে ছদ্মবেশীনী অথবা পাগলিনী, কিন্তু ইহাও হইতে পারে——তিনি কোনও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মচারিণী। সে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত কাহার উপরে উপদ্রব করে নাই, তুমি তাহার যেরূপ পরিচয় দিলে তাহাতে তাঁহাকে যোগিণী বলিয়াই বোধ হয়। আমি হিন্দু হইয়া এরূপ লোককে গ্রেপ্তার করিবার সহসা হুকুম দিতে পারি না।" কথা সমাপ্ত হইলে, সেলাম করিয়া দারোগা চলিয়া গেল, তহশীলদার তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগাজী! তুমি ঐ স্ত্রীলোকের নাম জানিয়াছ কি?" দারোগা বলিল, "হুজুর! সে কাহারও সহিত কথা কহে না, তাহার নাম জানা কেমনে সম্ভব? তাহার হাতে দিবা-রাত্রি একটা মশাল থাকে, কেন থাকে জানি না, কিন্তু মশালটাকে কখনও জ্বালাইতে কেহ কখনও দেখে নাই। বাজারের লোকেরা তাহাকে মশালী মাতা বলিয়া ডাকে।" রাত্রিতে আমরা আহার করিয়া শয়ন করিলাম, ঐ বিষয়ের আর কোন প্রসঙ্গ হইল না।

পরদিবস হাঁড়িয়াদহের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি এমন সময়ে একটি বৃক্ষ মূলে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দণ্ডায়মানা দেখিলাম; তাঁহার হাতে মশাল ছিল, আমি যে দিক দিয়া আসিতে ছিলাম তাহার অপর দিকে তাহার মুখ ছিল,সুতরাং আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। একজন পথিকের মুখে তাঁহার পরিচয় পাইয়া

বুঝিলাম, ইনিই সেই দারোগার মশালী মাতা। ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম, তখন তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব রমণীয় জ্যোতি বিনির্গত হইতে ছিল। বৃদ্ধা বয়সেও যেন যৌবন ও বসন্ত একাধারে মিলিয়া 'উজ্বলে ও মধুরে' মিশিতে ছিল। যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই যেন অধিকতর সুগন্ধির আঘ্রাণ পাইতে লাগিলাম। আরও নিকটে আসিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে আমাকে যাহা তিনি বুঝাইলেন,তাহাতে বুঝিলাম আমাকে তিনি চলিয়া যাইতে বলিতেছেন,সুতরাং আমি চলিয়া গেলাম। রাত্রিকালে তহশীলদারকে বলিলাম, "দারোগার সে স্ত্রীলোককে অদ্য দেখিয়াছিলাম, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের লোক।"

ইহার কয়েক দিবস পরে আমি আলাহাবাদ যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। প্রভাতে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক তহশীলদারের টম্ টম্ গাড়ীতে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে তহশীলদার বলিলেন "একটা ঘোড়া ক্রমান্বয়ে চলিয়া আলাহাবাদে যাইতে পারিবে না,সুতরাং পথিমধ্যে ঘোড়া বদলাইতে হইবে। পাকা রাস্তার ধারে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট থানা আছে, তাহা আমারই এলাকাভুক্ত, জমাদারদিগের নামে পরওয়ানা দিলাম, পরওয়ানা দেখাইলে তাহারা ঘোড়া বদলাইয়া দিবে।" অতঃপর আমি গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, গাড়োয়ান টম্ টম্ হাঁকাইতে লাগিল। একটু দূরেই নবীন শস্পসমাকুল সুন্দর ভূমিখণ্ড ছিল, মশালী মাতাকে তথায় পদচারণা করিতে দেখিয়া বিনীত ভাবে, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! প্রয়াগের মেলা দেখিতে যাইতেছি যদি আপনার যাইবার ইচ্ছা হয় এই গাড়ীতে বসুন,আমরা একত্রে যাইব।" মাতাজী মহাশয়া হাত নাড়িয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন, আমরা গাড়ী চালাইয়া হাঁডিয়াদহের সীমা পার হইলাম। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় যোশীঘাটে আমাদের গাড়ী থামিল ; যোশীঘাটে গঙ্গাপার হইলেই প্রয়াগে পৌছান যায়। আমি টম্‌টম্ হইতে অবতরণ করিয়া গাড়োয়ানকে

বিদায় দিলাম এবং নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া গঙ্গাপার করিতে বলিলাম। নৌকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে টমটমের গাড়োয়ান বিকট চীৎকার করিয়া আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল; আমি মাঝিকে অপেক্ষা করিতে কহিয়া দ্রুতপদে, তাহার নিকটে গেলাম, যাইবামাত্র সে ব্যক্তি নৈঋত কোণের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিল "দেখুন, দেখুন, ওখানে কে দাঁড়াইয়া আছে, দেখুন।" সেই ঘোর রজনীতে দোকানঘরে একটী সামান্ত মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া নয়নদ্বয়ের সাহায্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম ইহা কি কল্পনা অথবা বাস্তব? ভাবিলাম, ইহা কি স্বপ্ন অথবা প্রকৃত? দেখিলাম, হাঁড়িয়াদহের সেই মশালী মাতা তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন!। গাড়োয়ান বলিল, "মহাশয়। আমরা যখন আসিঁ তখন সেই পথ দিয়া কোনও প্রকারের গাড়ী বা ঘোড়া যাতায়ত করে নাই, দুই চারি জন লোকমাত্র গমনাগমন করিয়াছিল। একটা পাখিও যদি হাঁড়িয়াদহ হইতে ঘোষীঘাট পর্য্যন্ত আসে তাহাকেও বৃক্ষে বৃক্ষে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়া আসিতে হয়, তবে ইনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন"? আমি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা ঐ স্ত্রীলোককে চিন কি"? দোকানদার উচ্চহাস্ত করিয়া কহিল "আপনাকে অতি আশ্চর্য্য ধরণের মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বিশাল মেলায় লক্ষাধিক লোকের গমনাগমন হইতেছে, কেহ কাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছে কি? বড় বড় রাজা আসিলেও যখন তাহার পরিচয় লইবার জন্ত সকলের পক্ষে সময় থাকে না, তখন ঐ লোকটার পরিচয় কেমনে দিতে পারি"? হতভাগ্য দোকানদার জানিত না যে, তাহার সম্মুখে, নৈঋত কোণে, রাজার রাজা দণ্ডায়মান ছিল, হতভাগ্য দোকানদার আধ্যাত্মিক জগতের কথা বুঝিত না। অপর একজন দোকানদার বলিল, "বেলা তিনটা হইতে ঐ স্ত্রীলোককে আমি এখানে

দেখিতেছি। একজন বুড়ী ইহার নিকটে ছিল, তাহার সহিত এই স্ত্রীলোক কথা কহে নাই কিন্তু ইঙ্গিতে অনেক কথা তাহাকে বুঝাইয়াছিল। অনেক লোকে উহাকে বেলা তিন ঘটিকা হইতে এস্থানে দেখিতেছে"। দোকানদারের সহিত কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মশালী মাতা মহাশয়া পদচারণা করিতে করিতে একটি প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের তলে গিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়োয়ান চলিয়া গেলে আমি ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষতলে গিয়া তাহার পবিত্র পদকমল স্পর্শ করতঃ সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম, প্রণাম করিবার পরেও পা ছাড়িয়া দিলাম না। তিনি হুঁ হুঁ করিয়া পা ছাড়িবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু আমি কিছুতেই পা ছাড়িলাম না। অতি বিনীত ভাবে বলিলাম, "মা! এই পুতঃ সলিলা জাহ্নবীতটে তোমার দর্শন পাইয়াছি, আমি কি সহজে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি? যদি পদাঘাত কর এবং ঐ পদাঘাতে আমার প্রাণান্ত হয়, তাহা হইলে এই মৃত্যু সুখকর বলিয়া বিশ্বাস করিব।" তখন সেই ভক্তবৎসলা মাতা আমার হাত ধরিয়া অতি মধুর ভাবে হাসিতে হাসিতে হিন্দী ভাষায় বলিলেন, "মেরী গোড় ছোড় দেও" অর্থাৎ আমার পা ছাড়িয়া দেও। এতদিন পরে সেই পবিত্র কণ্ঠ হইতে অর্থবোধক শব্দ প্রথম শুনিতে পাইলাম। পা ছাড়িয়া দিলে তিনি অকস্মাৎ আমার পা ধরিয়া প্রণাম করিলেন, আমি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিরূপ ব্যবহার? তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি গৌরিকবসন পরিধীত সাধু, তুমি প্রণাম করিলে, অমি প্রণাম করিতে বাধ্য"। যাহা হউক, অনেক অনুনয় ও অনুরোধের পরে আমি তাঁহাকে নৌকায় চড়াইয়া গঙ্গার ওপর পারে লইয়া গেলাম।

প্রয়াগের গঙ্গাগর্ভে আমার পর্ণ কুটীর তখনও প্রস্তুত হয় নাই, এজন্য হমির সিংহের সহিত কয়েক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করিয়া দারাগঞ্জে গেলাম। ভবানীপুর যেমন কলিকাতায় উপনগর (Suburb), দারাগঞ্জও তেমনি আলাহাবাদের (গঙ্গাতটে) একটী উপনগর।

আমরা দারাগঞ্জে জনৈক ভদ্রলোকের বাগানবাটীতে রহিলাম। রাত্রি অধিক হওয়ায় মাতাজী শয়ন করিলেন কিন্তু তাঁহার শয়ন প্রকৃত শয়ন নহে——যোগ নিদ্রা মাত্র! রজনী প্রভাত হইলে মাতা বলিলেন, "এটাওয়া নগরীতে আমার এক শিষ্য আছে তাঁহাকে দেখিবার জন্ত অন্তই সেখানে ( Etwah ) যাইতে হইবে।" "আমি তাড়াতাড়ি একটা লোকের দ্বারায় হরির সিংহের নিকট সম্বাদ পাঠাইয়া মাতার সহিত রেলওয়ে ষ্টেশনে গেলাম। টিকিট ও গাড়ির তখন বিলম্ব ছিল, এইজন্য অন্যান্য পথিকের সহিত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। পঞ্জাব প্রদেশের এক প্রকাণ্ড দেহ পালোয়ান সেখানে বসিয়া ছিল, তাহার আগ্রা যাইবার প্রয়োজন ছিল। সে ব্যক্তি অতি মধুর স্বরে, তানলয় সমাযুক্ত একটী গীত পঞ্জাবী রাগে গাহিতেছিল——

"মেরী মন বাম্ রাম্ দোস্‌রা না কোয়ী।
শান্তন্ সাথ্ বইঠি বইঠি লোকলাজ্ খোয়ী॥
মেরী মন বাম্ রাম্ ( ইত্যাদি )॥

মাতাজী বসিয়াছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে দাড়াইয়া উঠিলেন, দাঁড়াইবার পরে হাসিতে, তাহার পরে কাঁদিতে, তাহার পরে লাফাইতে লাগিলেন। তদন্তর নাচিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পরিশেষে সেই পালোয়ানকে বেষ্টন করিয়া বিবশা হইয়া নাচিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ নৃত্য বন্ধ হইল কিন্তু পালোয়ান তখনও গান গাহিতে ছিল। দেখিতে দেখিতে, মাতাজী সেই পঞ্জাবের পালোয়ানের বগলে হাত দিয়া সেই বিপুলবপু পঞ্জাবীকে নিমেষের মধ্যে পাখির পালকের মত, শূন্যে উঠাইয়া লইয়া নিজ কোলে স্থাপন করিলেন, কোলে বসাইয়া আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। সকলেই বলিল, এই বৃদ্ধা এবং নিতান্ত কৃশাঙ্গীর দেহে বোধ হয় পাঁচ তোলার অধিক মাংস নাই, ইহার সমস্ত দেহে কয়খানি পাতলা অস্থি মাত্র আছে, ইনি কেমন করিয়া এই বিপুলবপু পালোয়ানকে নিমেষ

মধ্যে উঠাইয়া লইলেন। অহো! মহাপুরুষ এবং মহিয়সী ব্রহ্মবাদিনী-দিগের কি আলৌকিক ক্ষমতা।! পালোয়ান বলিয়াছিল, "যখন মাতাজী আমাকে কোলে লইয়া ছিলেন তখন সহস্র কমলের সুগন্ধি পাইয়াছিলাম। পবিত্র দেহ স্পর্শে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।" রেলওয়ে ষ্টেশনে আলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ধনবান কায়স্থ উকিল মুন্সি কালীচরণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি মাতাজী সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, "অনেকদিন পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতোপরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে মাতাজীকে একবার দেখিয়াছিলাম। ইনি বড় বড় বিষাক্ত সর্প ধরিয়া বিষ পান করেন এবং নদীর জলে ডুবিয়া দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অদৃশ্যা থাকেন। ইহার শ্রীমুখ হইতে যে সকল আশীর্ব্বচন বিনিস্থত হইয়াছে তাহা কদাপি বিফল হয় নাই।"

ইহার পরে টিকিট লইয়া আমরা বাষ্পীয়শকটে আরোহণপূর্ব্বক এটাওয়া রওনা হইয়াছিলাম। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

## আদর্শ বৈষ্ণব।

এক কথায় বলিতে হইলে, আদর্শ মনুষ্যই আদর্শ বৈষ্ণব অথবা আদর্শ বৈষ্ণবই আদর্শ মনুষ্য। সম্পূর্ণ বৈষ্ণবত্ব ভিন্ন সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা দুর্লভ, কারণ সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং সম্পূর্ণ মনুষ্য ধর্ম্ম সংজ্ঞান্তর হইলেও একই পদার্থ। এই জন্যই আদর্শ বৈষ্ণব অতি পুরাকাল হইতে জগতের ধর্ম্মেতিহাসে পূজ্যতম ও পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সম্পূর্ণ আদর্শ বৈষ্ণব এবং মানবের সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া তিনি "ঈশ্বর"। কেবল বাহিক আড়ম্বরে অনুরাগী হইলে কিম্বা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষের পদানুসরণ করিলে প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না, প্রকৃত বৈষ্ণব বা প্রকৃত ভক্ত অতি দুর্লভ মনুষ্য; প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব নিতান্ত কষ্টসাধ্য বলিয়াই প্রকৃত সুখকর এবং প্রকৃত ধর্ম্ম। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে

পাওয়া যায়, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই ত্যাগস্বীকার, আত্মোৎসর্গ, কষ্টসহিষ্ণুতা, বিনয় নম্রতা, দীনতা পরোপকার এবং তৎসঙ্গে চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান। যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্থাৎ প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব কিম্বা বাস্তব ধর্ম্ম তাহার সাধন চিরকালই কষ্ট মিশ্রিত, অনেক সময় একেবারেই দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য এবং দুঃখ জনক বলিয়াই ধর্ম্মের এত গৌরব, ধর্ম্মের এত শক্তি, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। মরুভূমি মধ্যে তৃষিতকণ্ঠ মৃগকুল মরীচিকাকে সুশীত সলিল ভ্রমে ধরিতে যায়, ধরিতে পারেনা, ক্লান্ত হয়, শ্রান্ত হয়, কণ্ঠে প্রাণবায়ু নিশ্চল হয়, কিন্তু হরিণ কি আশা ছাড়ে? মরুভূমের সৈকত শয্যায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালা বিদগ্ধ বালুকার উপরে, পুরাকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত কত অনন্ত কোটি হরিণ কুল মরিয়াছে ও মরিতেছে কিন্তু হরিণের আশা এখনও মরে নাই, সুতরাং ধর্ম্ম সাধন কষ্টদায়ক হইলেও তাহা অত্যজ্য, তাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা করনীয় এবং জন্ম জন্মান্তরে ও পুনঃ পুনঃ আশাময় এবং সুখদায়ক। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে জানে ও বুঝে সেই ব্যক্তিই বৈষ্ণব, কিন্তু কেবল জানিয়া বা বুঝিয়া নীরব থাকিলে চলেনা, বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হয় এবং বৈষ্ণবের ক্রিয়া গুলিকে পালন ও সাধন করিতে হয়। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্জ্জীব ও নিষ্ক্রিয় ধর্ম্ম নহে, ইহা সততই সজীব এবং ক্রিয়াশীল, ইহা চিরকালই 'সকর্ম্মক' কখনও 'অকর্ম্মক' ছিলনা। কেবল পাণ্ডিত্য অথবা স্বকীয় বুদ্ধি বলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালন করিলে চলিবেনা; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, সনক, নারদাদির পদানুসরণ করিতে হইবে; প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের পবিত্র পদচিহ্ন গুলিকে আমাদের সহায় স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। জনৈক তত্ত্বদর্শী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,"জীবে দয়া,নামেরুচি,আত্মার সন্তোষ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম সার হয়,কহে শাস্ত্র কোষ॥"

অর্থাৎ—সর্ব্বজীবে সমদর্শীতা, শ্রীভগবানে অনুরাগ এবং যে সরল সুখ্য জনক কার্য্য সম্পাদন করিলে মনোমধ্যে স্বতঃই বিমল আনন্দের

উদ্ভব হয় তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রবৃত্তি মার্গের অনুগামী হইলে মনুষ্য কখনই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকারী হইতে পারেনা। নিবৃত্তি মার্গই বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা সুকোমল কুসুমিত শয্যায় শয়ন করিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী অলসের সুনিদ্রার আশা করেন কিম্বা যাঁহারা বিবিধ প্রকার ( ক্ষণিক সুখোৎপাদক ) ভোজ্য দ্রব্যের আহার দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধনে সমুৎসুক অথবা যাঁহারা সকল প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধা পরিহার পূর্ব্বক কেবল নিরবচ্ছিন্ন বিলাসসুখেই জীবন যাপন করিতে অভিলাষী,তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণবধর্মপথে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ এই দূরবর্ত্তী দুর্গম পথে তাঁহাদের শান্তি বা তৃপ্তি লাভ করা অসম্ভব।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণবান্দোলন পর্য্যন্ত কোনও প্রকৃত বৈষ্ণব কখনও সাংসারিক সুখের আকাঙ্ক্ষী হয়েন নাই। প্রাবৃটের বৃষ্টি, মাঘের শীত, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র অথবা হেমন্তের হিমে ইহাঁদের কেহই পর্য্যুদস্ত হয়েন নাই, কারণ "দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা" বৈষ্ণবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেবল মাত্র প্রাচীন মলিন ও ছিন্ন কন্থাবলী অবলম্বন করিয়া ধূলি ধূসরিত অবস্থায় অতি দীন হীন ভাবে জীবন যাপন করিয়া ইহাঁরা ভূতলে স্বর্গের অমৃতাস্বাদন করিতেন। সংসারের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কখনই ঘনিষ্ঠ ছিল না। তৈল ও জল একত্রে অবস্থান করিয়াও যেমন পরস্পর সংমিশ্রিত হয় না অথবা কমল পত্রে সুশীতল সলিল স্থাপন করিলেও যেমন পত্রে তাহা সংলগ্ন হয় না, তেমনি তাঁহারা নির্লিপ্ত ভাবে এবং নিষ্কাম অন্তঃকরণে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ নিষ্পাদন করিতেন। বিপদে সাহস, কষ্টে সহিষ্ণুতা, রোগে ধৈর্য্য, শোকে ভগবদনুরাগ, অভাবে সন্তোষ এবং প্রাণের বিনিময়েও সত্যের জয় ঘোষণা, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান গুণ ছিল। তাঁহারা না খাইয়াও অপরকে খাওয়াইতেন এবং নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া অপরের স্বার্থে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেন—অথচ

এই স্বার্থ ত্যাগ শান্ত সতত এবং পবিত্র ছিল। এই সকল মহা গুণ ছিল বলিয়াই বৈষ্ণবেরা পৃথিবীর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, এই জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, এইজন্য বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম সাধক এবং এইজন্য (মনুষ্য প্রথমাবস্থায় বা দ্বিতীয়াবস্থায় যতই সংশয় বা ভ্রমে পতিত হউক না) পরিশেষে প্রত্যেক মনুষ্য কেবল বৈষ্ণব-পাদপের ছায়ায় গিয়া দুঃখ ও ক্লান্তি দূর করে। বৈষ্ণবকুলতিলক মহামতি প্রহ্লাদ, ধ্রুব কিম্বা শুক, সনক নারদাদির ইতিহাস জগতের ধর্ম্মক্ষেত্রে অতুল্য, কারণ প্রকৃত বৈষ্ণব অতীব দুর্লভ। দুর্লভ বলিয়াই ইহা পরম ধর্ম্ম। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "প্রকৃত বৈষ্ণবই প্রকৃত ভক্ত, সেই প্রিয় ভক্তের হৃদয় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আমি পরম সুখানুভব করি এবং তাহার পরিচালকের কার্য্য করি।" শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অত্যন্ত প্রীতির সহিত সতত আমাকে (ঈশ্বরকে) ভজনা করে, সে ব্যক্তি নিরুপায় হইলেও আমি (ঈশ্বর) তাহার উপায় স্বরূপ হই। তিনি সঞ্জয়ের মুখে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন—

"যেখানে আমি (কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বর) বর্ত্তমান, সেই স্থানে সকল সুখই স্বতঃ উপস্থিত হয়।" অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত বৈষ্ণব, সেই খানেই পবিত্রতা, আনন্দ, অহিংসা, শ্রী, বিজয়, শক্তি প্রভৃতি বর্ত্তমান। এইজন্য সতত শ্রীভগবানের ধ্যানে চিত্ত সমর্পণ করা শ্রীবৈষ্ণবের পরম ধর্ম্ম। সতী স্ত্রীলোকে যেরূপ নানাপ্রকারের পরপুরুষের সহিত কথোপকথন করিলেও তাঁহার চিত্ত তাঁহার স্বামীপদ হইতে স্বতন্ত্র হয় না, আদর্শ বৈষ্ণব তেমনি নানাপ্রকার বৈষয়িক কর্ত্তব্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও নিষ্কাম ভাবে সতত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে আদর্শ

বৈষ্ণবের যে সকল গুণ, লক্ষণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা একত্রিত করিলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ বিরচিত হইতে পারে, কিন্তু সকল কথার যেটুকু সারতত্ত্ব তাহাই এস্থলে লিখিলাম, তাহা এই—"নিরপরাধ ভজনা শ্রেয়ঃ।" অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরপরাধী হইয়া ঈশ্বরের ভজন করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম; সম্পূর্ণরূপে দোষ, অপরাধ ও পাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে ঈশ্বরের ভজনার পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দোষ যুক্ত ভজনা ঈশ্বরের গ্রহণীয় নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নিরপরাধী হওয়া মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, তথাপি কতকগুলি প্রধান প্রধান কর্ত্তব্যের দিকে বৈষ্ণবের সততই দৃষ্টিরাখা পরম ধর্ম্ম। তাহা এই, ১মতঃ জীবহিংসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। (শাস্ত্রকারেরা হিংসা শব্দার্থে কেবল 'নিধন' লেখেন নাই, জীবের উচ্ছেদ সাধন, দেহ ও মনে কষ্ট দান অথবা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ইহাও হিংসা নামে গণ্য।) ২য়তঃ অবৈধ স্ত্রী সংসর্গ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ৩য়তঃ বিষয় সম্ভোগ প্রত্যেক সাধুর পক্ষে নিষিদ্ধ। ৪র্থতঃ অকারণে অভাবের উৎপত্তি করা ধর্ম্ম বিরোধী। ৫মতঃ যত্নে সন্তোষ লাভ করা বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, ৬ষ্ঠতঃ দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন ৭মতঃ প্রকৃত শাস্ত্র ও ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ ৮মতঃ পরোপকার প্রবৃত্তি ৯মতঃ পুণ্যজনক কর্ম্মের সাধন ১০মতঃ সর্ব্বদা ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম, নির্লিপ্ত এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ব্রহ্মে তন্ময় হওয়া ও ভগবৎনামে প্রীতি থাকা বৈষ্ণবের লক্ষণ। বাইবেল অথবা কোরাণ পাঠ করিলেও আদর্শ বৈষ্ণবের এই সকল মহালক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে খৃষ্টান ও মুসলমান অবশ্যই হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু কোরান ও বাইবেল হইতে যদি বৈষ্ণবত্ব পৃথক করা যায়, তাহা হইলে কোরানের বা বাইবেলের বাইবেলত্ব থাকে না; এইজন্য কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাসের নিন্দা করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ, কারণ বৈষ্ণবত্বকে মূল

করিয়াই পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। যোগীন্দ্র যিশুখৃষ্টের সমস্ত জীবন বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষায় মূলে বাপিত হইয়াছিল। যদি মহামতি যিশুখৃষ্ট হইতে কিম্বা বাইবেল হইতে বৈষ্ণবত্ব স্বতন্ত্র করাযায়, তাহা হইলে যিশুখৃষ্টকে অতি সামান্য পুরুষ বলিয়াই বোধ হয় এবং বাইবেল গ্রন্থকে একখানা প্রাচীন গল্পের পুস্তক ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। মহামতি পিতর, ঋষি তুল্য জন্ অথবা মহর্ষিগণের শিক্ষা ও দীক্ষা হইতে যদি বৈষ্ণবত্ব বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে ইঁহারা কলিকাতা চুণা গলির আনক্র, পিক্র,গমিজ প্রভৃতি ইষ্টইণ্ডিয়ান দিগের তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। সাধু গণের *"Thy Will be done"* অর্থাৎ "সকলই প্রভুর ইচ্ছা" এই উক্তি সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিচায়ক। বাইবেলের অধিকাংশ ধর্ম্মনীতি গুলি, বৈষ্ণবের ধর্ম্মনীতির সহিত অতি আশ্চর্য্য ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের যেমন তিন মূর্ত্তি, মুসলমান শাস্ত্রেও মহম্মদের সেইরূপ তিনটি মূর্ত্তি। হিন্দু শাস্ত্রে যোগীন্দ্র কৃষ্ণ, বীর শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, এই তিন মূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইস্লামীয় ধর্ম্ম ক্ষেত্রে মহাবীর মহম্মদ, আধ্যাত্মিক মহম্মদ এবং শাসক-মহম্মদ এই তিন মহম্মদ দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক মহম্মদকে আমি বড় ভাল বাসি, ইঁহার নীতি আমাদের বৈষ্ণবদের নীতির সমতুল্য। মহামতি মহম্মদের পবিত্র পদতলে বসিয়া পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কবি মোলানা সেখ সাদি লিখিয়াছেন——

"সোপর্দ্দম্ বোতোমায়ে খেশ্‌রা।
তু দানী হেসাবে কমো বেস্‌রা॥

অর্থাৎ, হে প্রভুপাদ-পাদপ ভগবান! আমি কোনও ফলের কামনা করি না, আমি ভালমন্দ, লঘু গুরু, কিছুই বুঝিতে পারি না, তোমাতে আত্মসমর্পণ আমার ধর্ম্ম বলিয়া তোমাতে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি।" কি সুন্দর! কি মধুর! এখন বুঝিলাম, বৈষ্ণবের নীতি পৃথিবীর

সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের নীতি ; এখন বুঝিলাম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম শাস্ত্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, ইহা বিশাল বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। বাইবেলে, কোরানে, পুরাণে বেদে, বেদান্তে, সকল স্থানেই বৈষ্ণবের মহিমা অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান। পুরাকালে শ্রীভগবান নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া ভক্তাধিক ভক্ত পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদকে রক্ষা ও তাঁহার সম্মুখে জলন্ত ও জীবন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই মহিমার বলে, অনলে, অনিলে, সলিলে, বৃহিলে, হস্তী পদতলে, শৈলশিখরোপরে অথবা ভুজঙ্গবদনবিবরে ভক্তাধিক প্রহ্লাদের প্রাণনাশ হয় নাই। তিনি বিষ পান করিয়াও অমর, প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যেও সেই প্রহ্লাদ জীবিত——কেবল জীবিত নহে, সমগ্র চরাচরে খ্যাত ; সুতরাং প্রকৃত বৈষ্ণব বড়ই দুর্লভ। আদর্শ মানব, আদর্শ বৈষ্ণব , সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বই সম্পূর্ণ বৈষ্ণবত্ব।

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনের শেষভাগে বৈষ্ণবত্ব শিখিতে গিয়া শিখিতে পারিলেন না, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ মঠে লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে।" পাঠক মহাশয়। আদর্শ বৈষ্ণবের কৃপা ভিন্ন কি আদর্শ বৈষ্ণব হওয়া যায় ? বঙ্কিমের সম্মুখে আদর্শের অভাব ছিল, তিনি "শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ একই পুরুষ" ইহা বুঝিতে পারেন নাই, গৌরকে ছাড়িয়া তিনি কৃষ্ণকে ভজনা করিতে গিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তিনি গৌরহরি মূর্ত্তি দেখেন নাই, ইহাই আদর্শ বৈষ্ণবের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি সুন্দর। এই প্রাণ শীতলকারী নাম, এই জীবোদ্ধারী নাম,কি মধুর! কি মধুর! কি মধুর। বৃহস্পতির বুদ্ধিতে ইহা সম্যক্ প্রবৃষ্ট হয় না, নারদের বীণায় এই নাম সম্পূর্ণ ভাবে গীত হইতে পারে না, শুকের বক্তৃতায় ইহার পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, রাফেলের তুলিকায় ইহার চিত্রন হয় না এবং অর্ফিউশের সঙ্গীতে ইহার পূর্ণ লয় আসে না। এই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি—এই আদর্শ বৈষ্ণব মূর্ত্তি—কি সুন্দর! কি সুন্দর। কি সুন্দর।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

# অদ্ভুত বৃক্ষ।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম পর্ব্বতের নাম হিমালয়, সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতমা নদীর নাম মিশিশিপি এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম মরুভূমির নাম সাহারা, ইহা অনেকেই জানেন ও বুঝেন; পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দেশ, বড় সাগর এবং বড় জীবের পরিচয় অনেকে অবগত আছেন; কিন্তু এই সুবিশাল ভূমণ্ডল মধ্যে—এই বহু শ্রেণীর ও বহুসংখ্যার পাদপ ও ব্রততী সমাচ্ছন্ন সুবৃহতী বসুমতী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুততম ও বৃহত্তম বৃক্ষ কোথায় আছে বলিতে পারেন কি? প্রকৃতির লীলাভূমি ভারতেই ইহা বর্ত্তমান। একটা বৃক্ষের পরিসর একাদশ যোজন ব্যাস, বিস্তৃত সার্দ্ধ পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপী সুবিশাল ভূমিখণ্ডকে অধিকার করিয়াছে—ইহা কি অদ্ভুত হইতে অদ্ভুততর নহে, ইউরোপীয় ভ্রমণ কারিগণ অনুমান করেন, এই বৃক্ষের তলে ও ছায়ায় প্রায় দেড় লক্ষ পথিক অনায়াসে উপবেশন করিতে সমর্থ হয়। ইহার এইরূপ বিস্তৃতি ও পরিসর পাঠ করিয়া অনেক পাঠক মহাশয় হয় ত বলিবেন, আমি বুঝি আরব্য উপন্যাসের আষাঢ়ে গল্প লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহা নহে আমি যাহা লিখিতেছি তাহা বাস্তবিক কথা, সামান্য মাত্র অর্থব্যয় করিয়া, অনতিদূরে, একসপ্তাহ কাল মধ্যে, অনেকেই ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিতে পারেন। এই মহা মহীরুহকে দর্শন করিলে বোধ হয় ইহা যেন তড়িত জড়িত জলদ জালকে ভেদ করিয়া, ভক্তি ও ভাবের আবেশে, ঊর্দ্ধাভিমুখে ভক্তবৎসল ভগবানের চরণ সরোজকে স্পর্শ করিতে যাইতেছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়।

"ছিলি তুই বালুর মত, হলি তার হস্ত শত;
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, দেখে মন মোহিত হয়।

বর্ষার পর বর্ষা, শীতের পর শীত এবং গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম, কত বৎসর ব্যাপিয়া এই তরু বরের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই

মহা মহীরূহ যথ সহিষ্ণু ব্রহ্মচারী মহাপুরুষের স্থায় প্রবল বন্যা, বজ্রাঘাত, উল্কাপাত, তড়িতাস্ফালন, ভূমিকম্প, প্রবল বাত্যা, মাঘের দুরন্ত শীত, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড মার্তণ্ড ময়ূখমালা প্রভৃতিকে তুচ্ছ করিয়া নির্ভীক ও নিরোগী ভাবে আজিও বর্ত্তমান; ইহাকে দেখিলে ভক্তের হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে আপ্লুত হয় এবং উদ্ভিদবিদ পণ্ডিতেরা কপোলে হস্ত রাখিয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিদ বৃন্দ ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন সুকোমল পল্লবাচ্ছাদিত শাখাপ্রশাখা সমূহের মধ্যে উপবিষ্ট বিবিধ বিমানবিহারী বিহঙ্গ বর্গের বিনোদ কাকলী লহরী শ্রবণ করেন, তখন ভাবেন, হতভাগ্য মানবের সঙ্গীত কি অসার কি কর্কশ? জনপ্রবাদ এই যে, শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা বাবা নানকের দীক্ষা গুরু মহাত্মা কবির দাস কোনও সময়ে এই বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, এই জন্য ইহার "কবির বট" নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বাবা কবির মহাশয় এতদঞ্চলে সশিষ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষের অভাবশতঃ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই কথিত আছে যোগবলে তিনি এই বৃক্ষের উৎপাদন করেন। এই সকল জনপ্রবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়, কারণ বাবা কবিরের জন্মগ্রহণের অনেক বৎসর পূর্ব্বেও এই বৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল, ইহার প্রকৃত নাম "কবির বট" নহে—কুবের বট অথবা কল্প বট। গ্রীক ও রোমান উদ্ভিদিকেরা যাহাকে "ফিগস" ( Figos ) জাতীয় বট বৃক্ষ বলেন, ইহা সেই জাতীয় বট বৃক্ষ।

অতি পুরাকাল হইতে হিন্দু জাতি বট, অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষকে ভক্তি ও পূজা করিয়া আসিতেছেন। পুরাণে গ্রথিত আছে 'বট পত্রে শ্রীভগবান শয়ন করিয়া পৃথ্বি সৃষ্টির সময় সলিলোপরে ভাসিয়াছিলেন।' শ্রীশ্রীগীতায় মহারাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বৃক্ষদিগের মধ্যে আমি অশ্বত্থ"। ঐ গ্রন্থে তিনি অশ্বত্থের সহিত, এক শ্লোকে, সংসারের

তুলনা করিয়াছেন। কুবের বট, বট বৃক্ষ বলিয়া আরও মহিমান্বিত। প্রতি বৎসর এবং প্রতিমাসে বহুসংখ্যক হিন্দু দলে দলে কুবের বটের পূজা করিতে আইসেন। অনেক ভ্রমণকারীও এখানে আগমন করিয়া থাকেন। পূতঃসলিলা নর্ম্মদা তটে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী মধ্যে এই অদ্ভুত বৃক্ষ অবস্থিত, ইন্দোর, বোম্বাই, গুজরাট কাটিয়াবাড় এবং কচ্ছ দেশীয় লোকদিগের ইহা অপূর্ব্ব তীর্থ, পবিত্রা নর্ম্মদার তটে অবস্থিত বলিয়া ইহার আরও গৌরব। কুবের বট দর্শন করিতে হইলে সুপ্রসিদ্ধ বম্বে-বরোদা সেন্টাল-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে ( B. B C. I, Railway ) নামক লাইনের উপর দিয়া বাষ্পীয় শকটযোগে "ব্রোচ্ বা বরাউচ্" ( Broach ) নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

বৃক্ষের সম্মুখস্থিত ভূমিখণ্ডে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ও লতার গাছ আছে, তাহার পরে দুইটী স্তম্ভ, এই স্তম্ভের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান বুদ্ধের মূর্ত্তি, স্তম্ভ দ্বারের ১২টি সিড়ি পার হইলে আর একটী ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উপরে মূল্যবান ও মনোহর শ্বেত মর্ম্মর বিনির্ম্মিত তিনটী উচ্চ ও প্রশস্ত মঞ্চ বিদ্যমান, ইহার পরেই ভুবনবিখ্যাত বুদ্ধবট। প্রবাদ আছে ভারতবর্ষ হইতে সিংহল গমন করিয়া এই বৃক্ষের তলে উপবেশনপূর্ব্বক বুদ্ধদেব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই স্থান অনুরাধাপুর নগরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, ইংরাজীতে ইহার নাম 'বো ট্রি', পালিভাষায় 'বুদ্ধবট'। কুবের বট ক্রমাগত প্রশস্ত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত যেমন প্রসারিত হইয়াছে বুদ্ধবট সেরূপ হয় নাই, ইহা কুবের বটাপেক্ষা উচ্চতর কিন্তু প্রশস্ততর নহে। কুবের বট অপেক্ষা বুদ্ধবটের শাখা প্রশাখা দেখিতে খুব সুন্দর; স্থানে স্থানে রাশিকৃত পত্রসমূহ এরূপ সুকৌশল গুচ্ছের মত দৃষ্ট হয় যে তাহা দেখিয়া অনেকের মনে বড় বড় ফল বলিয়া ভ্রম জন্মে। বুদ্ধ বটে কোনও লতা আশ্রয় করে নাই এবং এত সাবধানে ইহা রক্ষিত যে, অন্ত বৃক্ষের পাতা আসিয়া এখানে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে। এই পবিত্র বটবৃক্ষ হইতে যে সকল পত্র

বা ফল পতিত হইয়া থাকে বৃদ্ধারী তাহা উঠাইয়া লইয়া গৃহে রাখেন, এই দ্রব্য ঘরে রাখিলে গৃহের মঙ্গল হয় বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বৃদ্ধবট অতি প্রাচীন বৃক্ষ হইলেও দেখিতে নীরস বা শুষ্ক বলিয়া বোধ হয় না। এই বৃক্ষ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের ভক্তি, বিশ্বাস সাবধানতা এবং স্বধর্ম্মবৎসলতার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কতকাল চলিয়া গেল তবু এই বৃক্ষ ভূমিসাৎ হয় নাই, ইহা এখনও যুবার ন্যায় বীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধদেবের সিংহল ভ্রমণ, বৌদ্ধদিগের গুরুভক্তি এবং পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অচিন্ত্যনীয় মহিমা প্রচার করিতেছে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# সতী শ্যামাসুন্দরী।

আউদ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে লাইনের ফয়জাবাদ নামক প্রাচীন ও প্রশস্ত নগরের প্রায় সার্দ্ধ দুইক্রোশ অন্তরে পবিত্র-সালিলা সরয়ূতটে প্রাচীনা অযোধ্যাপুরী বিভববিহীনা হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামাকারে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালের কুটিলপ্রভাবে রক্ষবংশধ্বংসকারী রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন, সুতরাং বর্ত্তমান অযোধ্যাপুরীতে আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। নগরীর চারিপার্শ্বে প্রাচীন কালের বিপুলকায় প্রাসাদসমূহ ভগ্ন স্তূপাকারে স্থানে স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া রঘুবংশের রুদ্রসম বিক্রমের এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধাধীন জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া অযোধ্যাপুরীতে যাঁহারা রঘুকুলপতি মহারাজ রামচন্দ্রের জন্ম ও বাল্যলীলার স্থানসমূহ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, যে এক অনতিবৃহৎ ভূমিখণ্ড এক্ষণে সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহের আধার বলিয়া পরিচিত, তাহার অর্দ্ধাংশ

মুসলমানের এবং অর্দ্ধাংশ হিন্দুর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যে সুন্দর ও প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদটী রামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহ ছিল, তাহা এখন বর্ত্তমান নাই; যে ভূমিখণ্ডের উপরে এই প্রাচীন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই একপার্শ্বে এবং যে গৃহে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে এখন একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্দিরের অর্দ্ধাংশ হিন্দুর দেব দেবী কর্ত্তৃক, বাকী অর্দ্ধাংশ মুসলমানের মোল্লা কর্ত্তৃক অধিকৃত। অর্দ্ধাংশে শ্রীরামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদলশ্যাম মোহনমূর্ত্তি এবং অপরার্দ্ধাংশে মস্‌জিদ, মৌলবী এবং মোসাহাফ্ (কোরাণ) দেখিতে পাওয়া যায়। একটী সুন্দর ও সুবৃহৎ হিন্দু মন্দিরকে অঙ্গহীন করিয়া এই মস্‌জিদ্ প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য ভারতের আর কোন তীর্থস্থলে বিরল; বারাণসী প্রভৃতি নগরীতে বড় বড় মন্দিরের নিকটে মস্‌জিদ্ দেখা যায় বটে, কিন্তু অযোধ্যা ভিন্ন আর কোনও স্থানে হিন্দুর মন্দির এবং মুসলমানের মসজিদ্ একই প্রাচীর, একই সীমানা (কম্পাউণ্ড), একই ছাদ এবং একই ভিত্তি লইয়া, একই অট্টালিকার দুই অংশে পাশাপাশি ভাবে দুইটী বন্ধুর মত দাঁড়াইয়া হিন্দুকে রামায়ণ এবং মুসলমানকে কোরাণ শুনায়—এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কোনও স্থানে নাই, ইহা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। যে রামের রুদ্র শক্তিতে রাবণ কম্পিত হইয়াছিল, যে রামের তাড়নায় তাড়কা ত্রস্ত হইয়াছিল, যে রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া বালী নিহত হইয়াছিল, যে রামের বিশিষ্ট বিক্রমে বিপুলবপু কুম্ভকর্ণ করাল কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছিল, সেই ভুবনবিখ্যাত ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহে মুসলমানের মসজিদ্ প্রতিষ্ঠার কথঞ্চিত ইতিহাস না শুনাইলে প্রভাবশীর্ষোক্ত সতী শ্যামাসুন্দরীর জীবনী পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মোগল সম্রাট (হুমায়ুন), খৃষ্টীয় ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে কইজিউল্লা নামক প্রসিদ্ধ সেনাপতি সমভিব্যাহারে গাজের প্রদেশ

সমূহ অতিক্রম করিয়া সরযুতটে উপনীত হয়েন। অযোধ্যার অসংখ্য দেবালয়, ব্রাহ্মণদিগের বিপুল বিভব, শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতদিগের পূজা পাঠ আরতির আড়ম্বর,মন্দিরস্থিত মূর্ত্তির বহুমূল্যতা,হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রে ঈশ্বরত্ব আরোপ, সরযূ-তটস্থিত অগণ্য দেবদেবী মূর্ত্তির চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে হিন্দুর বিশ্বাস, প্রভৃতি কথা শ্রবণ করিয়া অযোধ্যায় মোগলের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করত মুসলমানেরা মহম্মদীয় ধর্ম্ম স্থাপন করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিলে হিন্দুর তরবারী কখনও সূর্য্যালোক দর্শন করে না; সুতরাং সরযূতটে হিন্দু ও মুসলমানের সমর অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মোগলকুল-সম্রাট মহাবীর হুমায়ুন স্বয়ং অধিনায়ক হইয়া হিন্দুর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন, এ কথা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু নরপতিগণ ধর্ম্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধের যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল; মোগলের মহাবিক্রমে হিন্দু পরাজিত হইয়া অপমানিত ও আহত হইলেন। ক্রমে নানা স্থান হইতে হিন্দুবীরগণ সমবেত হইয়া পুনরায় ভীষণতর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন; কিন্তু মদমত্ত মোগলের অজেয় অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখে তাঁহাদিগকে শার্দ্দুল-তাড়িত সারমেয়-শাবকের ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পলায়ন করিতে হইল। তৃতীয় বা শেষ যুদ্ধে অসংখ্য হিন্দু স্বধর্ম্মের জন্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু জয় ও ভাগ্যলক্ষ্মী হিন্দুর কোমল ক্রোড়কে পরিত্যাগ করিয়া মোগলের কঠিন কিরীটে গিয়া উপবেশন করিলেন। মুসলমানেরা বজ্রগম্ভীর রবে মোগলের জয় এবং মহম্মদের ঐশী শক্তির ঘোষণা করিয়া অযোধ্যাপুরী অধিকার করিল, কিন্তু দেবালয়াদি ভগ্ন করা সহজ কার্য্য নহে দেখিয়া মোগলেরা উৎকণ্ঠিত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নয়নের অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সরযূজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "অযোধ্যায় একটী হিন্দু বর্ত্তমান থাকিতেও ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির ভগ্ন করিতে দিব না।" সশস্ত্র হইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, "হর হর বম্

যবন্‌” রবে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া দলে দলে অসংখ্য হিন্দু নরনারী সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহের সম্মুখস্থিত বিস্তৃত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে মুসলমানেরা মন্দির ভগ্ন করিতে উপস্থিত হইয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। স্থানের সঙ্কীর্ণতা-বশতঃ সমরনীতির নিয়মানুসারে সংগ্রাম না হইয়া হিন্দু ও মুসলমানে হাতাহাতি যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। হিন্দুর বীরত্ব, বিক্রম, অধ্যবসায়, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, সাহস, স্বধর্ম্মানুরাগ, অস্ত্রশিক্ষা, জীবনে মমতাশূন্যতা প্রভৃতি অতুলনীয় হইলেও সে যুদ্ধে মুসলমানের নিকটে হিন্দুবীরেরা আবার পরাজিত, আবার হত হইলেন। রামচন্দ্রের সুবৃহৎ মন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়া মোগলেরা সানন্দে সরযূতটস্থিত শিবিরে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। মুসলমান ভাবিল, অযোধ্যার রাম আর রামায়ণের রাম বুঝি লুপ্ত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। পরদিন প্রভাতে পূর্ব্বগগনে দিননাথ উজ্জ্বল প্রভায় উদিত হইতে না হইতে মোগলেরা দেখিল হিন্দুর মন্দির যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। বিস্মিত হইয়া মোগল সৈন্য হুমায়ুনের নিকটে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বিবৃত করিল। হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণেরা বলিয়া উঠিলেন—“বাদসাহ। এখন বিচার করিয়া দেখ, হিন্দুর রাম বড় কি মোগলের মহম্মদ বড়? মহম্মদের শক্তিবলে তোমরা মন্দির ভাঙ্গিয়াছ, কিন্তু রামের শক্তিবলে রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে ভগ্ন-মন্দির নূতন মন্দিরে পরিণত হইয়া পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতেছে। ভগবান্ রামচন্দ্রের মন্দিরের বিগ্রহ লোপ করা কি দিল্লীর মোগলের সাধ্য?” এই কথা শুনিয়া হুমায়ুনের সহাস্যবদন লজ্জা ও অভিমানের কালিমায় মলিন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আরক্তলোচনে সেনাপতিকে বলিলেন—“কয়জুল্লা! বুঝিতেছ না, বিধর্ম্মী হিন্দুদের মধ্যে পরিশ্রমী এবং সুকৌশলসম্পন্ন বহুবিধ কারুকার আছে, তাহারাই নিশীথে এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথার কারণোৎপাদন করিয়াছে। আইস, আজি আমরা রামমন্দিরের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া প্রতিহিংসা

নই।" মুসলমানেরা আবার সেই মন্দির ভগ্ন করিল ; আবার মন্দিরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ, প্রস্তর, ইষ্টক, চুণ প্রভৃতি মসলা পর্য্যন্ত উষ্ট্র পৃষ্ঠে বহন করত সরযূর সলিলের স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। মোগল ভাবিল, এবারে রামের বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও সামর্থ ভাল করিয়া হিন্দুকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। মুসলমানেরা এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, হিন্দুর উৎসাহ ও বিক্রম ঠিক কুম্ভকর্ণের উৎসাহ ও বিক্রমের সহিত তুলনীয়, কুম্ভকর্ণ অধিকাংশ সময়ই নিদ্রার অপব্যয় করে। নিদ্রিত থাকিলে কুম্ভকর্ণের অশন, বসন, বিহার, বিক্রম, উৎসাহ, উদ্যোগ বীরত্ব বিভব প্রভৃতির কিছুই থাকে না, কিন্তু একবার জাগিয়া উঠিলে সমগ্র পৃথিবীকে গলাধঃ করিলেও কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। সমগ্র জগতের পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হয় না, অথবা সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলেও তাহার অস্ত্রশস্ত্র কম্পিত বা ক্লান্ত হয় না। যে জাতি সধর্ম্মের জন্য কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিতে পারে, যে জাতি স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, সে জাতির নিকটে রাতারাতি একটা মন্দির নির্ম্মাণ করা কি অলৌকিক কার্য্য? প্রভাতে উঠিয়াই যবন দেখিল, হিন্দুর রামের মন্দির যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে দিল্লী হইতে প্রাপ্ত এক পত্র পাঠ করিয়া সম্রাট জানিতে পারিলেন—দিল্লীতে তাঁহার পরিবার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ; তদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের শরীরও সুস্থ ছিল না এবং সেনাপতি কইজুল্লা একটি দুশ্চিকিৎস্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। সুতরাং হিন্দুর সঙ্গে সন্ধি করিয়া সরযূ পরিত্যাগ করত দিল্লী অভিমুখে প্রয়াণ করাই শ্রেয়ঃ, সম্রাট ইহাই স্থির করিলেন। উভয় দলের নেতারা উপস্থিত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল ; সন্ধিপত্রে সম্রাট লিখিলেন, "আপনারা (হিন্দুরা) রামচন্দ্রের যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মুসলমানেরা তাহা ভগ্ন করিবে না এবং ভগ্ন করিবার অধিকারী হইবে না ; কিন্তু আপনা-

যে ঐ মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীরে সংলগ্ন ভাবে একটী মশজিদ নির্ম্মিত হইবে, হিন্দুরা তাহা ভগ্ন করিতে পাইবে না অথবা ঐ মসজিদের ভূমীর অধিকারী হইতে পাঁরিবে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে পরস্পরে দ্বেষ বিদ্বেষ পরিহার করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে মন্দির ও মসজিদ্‌কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ও হইলেন, ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষের কোন আপত্তি রহিল না। সন্ধিপত্রের স্বাক্ষর শেষ হইয়া গেলে, মসজিদের বাহির দিকের দরজা অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া উঠিল, ঐ কটকে (Gate) সম্রাট বাহাদুর একখানি প্রস্তর ফলক স্থাপিত করিয়া তদুপরে পারস্য ভাষায় যাহা খোদিত করিয়া দিলেন, তাহার প্রকৃত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"মোগলের কীর্ত্তি।

মহম্মদের জয় এবং রামের পরাভব।

এই স্থানে ধর্ম্মযুদ্ধে সাহান-সা হুমায়ুন

হিন্দুজাতিকে পরাস্ত করেন।

হিজরী আট শত।"

ঐ প্রস্তর ঐ মসজিদের সম্মুখস্থ দ্বারদেশের উপরে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু হিন্দুরা এই বলিয়া আবার আপত্তি করিল যে, রামের অপমানসূচক কোনও কথা ব্যবহার করিয়া প্রস্তর ফলক স্থাপিত করিবার কথা উক্ত সন্ধিপত্রে নাই, সুতরাং সম্রাটের এই ব্যবহার অন্যায় এবং অলৌকিক হইয়াছে। হুমায়ুন ফাঁদে পড়িলেন, তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র দীল্লী যাইতে হইবে, সুতরাং হিন্দুর বিপক্ষে সংগ্রাম করা তাঁহার পক্ষে এখন অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া উঠিল। যিশু খৃষ্টের ক্রুশে পন্‌টীয়স পাইলট্ যাহা লিখিয়াছিলেন, য়িহুদীরা তাহার প্রতিবাদ করায় পাইলট্ বলিয়াছিলেন, "যাহা লিখিয়াছি, তাহা লেখা হইয়া গিয়াছে।" হুমায়ুনও হিন্দুগণকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "যাহা লেখা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সংশোধন

নাই।" কিন্তু হিন্দুরা এই উক্তির অনুমোদন করিল না; শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হইল যে, মসজিদের কটকে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা যেমন আছে তেমনি থাকুক; কিন্তু ভিতরের মসজিদের দ্বারদেশের উপরের প্রস্তরে মোল্লানাকম নামক প্রসিদ্ধ পারস্য কবির বিরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত থাকিবে, ঐ প্রস্তর এবং উহার উপরের কবিতা এখনও স্পষ্টাক্ষরে পড়িতে পারা যায়। উহা এই—

"দর্ তরিখে কাবা য়ো বুনোখানা ফরক্ অসৎ।
মগর দর উগুলে কাবা য়ো বুতোখানা একিসৎ॥"

অর্থ:—হিন্দুর পৌত্তলিকতাপূর্ণ মন্দিরে এবং মুসলমানের একেশ্বরবাদপূর্ণ মসজিদে ভিন্ন ভিন্ন উপাসকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবেশ করিলেও, মসজিদে যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের উপাসনা হয়, মন্দিরেও সেই ভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে।

হিন্দুরা সন্তুষ্ট হইল, সম্রাট চলিয়া গেলেন, অযোধ্যার হাঙ্গামা মিটিয়া গেল। হুমায়ুনের পুত্র মোগলকুলতিলক আকবর সাহ্ অযোধ্যায় আসিয়া ঐ কবিতা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "দর্ হকিকৎ হিন্দুকা কাশী আওর মুসলমানকা মক্কা একই চিজ্ হ্যায়।"

উপরে যে হাতাহাতি যুদ্ধের কথা লেখা হইয়াছে তাহাতে যে সকল হিন্দু নরনারী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহাদের মৃতদেহ সরযূর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহাদের মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ করিবার অবসর পাওয়া যায় নাই, যবনেরা সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া ঐ মসজিদের সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে "কবর" দিয়াছিল; ঐ সকল "হিন্দুকবর" এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐ কবর সমূহের উপরে পুষ্পমালা অর্পণ করেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের বীরত্বের প্রশংসা করেন। যে সকল স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুবীর এই ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের দেহস্থিত শোণিতের ধারা দ্বারা হিন্দুর গৌরব রক্ষা

হইয়াছিল, সতী শ্যামাসুন্দরী তাঁহাদের সকলের অগ্রগণ্যা ;

অযোধ্যার এই হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামার প্রায় ত্রিংশ বর্ষকাল পূর্ব্বে কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী ব্রহ্মচারিণী আসিয়া সরযূতটে সামান্য পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করত অযোধ্যাতীর্থে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাহার উনবিংশ বৎসর বয়ক্রম ; দেহের দেবোপম লাবণ্য, কণ্ঠের কোকিল স্বর, বাক্যের মধুরতা, স্বভাবের কোমলতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, নয়নের ঐশী জ্যোতিঃ, অসন ও বসনের সাত্ত্বিকতা এবং জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক ভাব অবলোকন করিয়া লোকেরা বুঝিতে পারিল, এই রমণী সামান্যা রমণী নহেন। ক্রমে জানা গেল, তিনি বঙ্গদেশের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্যা ; কাশীতে তাঁহার জন্মস্থান এবং কাশী ধামেই তাঁহার শ্বশুরালয়। তাঁহার পিতা পিতামহ বারেন্দ্র ভূম হইতে কাশী ধামে আসিয়া বাস করেন। তথায় শ্যামাসুন্দরীর জন্ম ও বিবাহ হয়। ক্রমে আরও অনুসন্ধানে জানা গেল, শ্যামাসুন্দরীর স্বামী অসচ্চরিত্র এবং দুর্দ্দান্ত, অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। শেষে যখন দেখিলেন, স্বামী গৃহে থাকিলে তাঁহার দেহের, মনের এবং আত্মার সর্ব্বদা অবনতি হইবে—অথচ গৃহে অবস্থান করিলেও স্বামীর বা গৃহের কোন বিশেষ উপকার নাই—তথাপি তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করত অযোধ্যায় গমন-পূর্ব্বক সরযূতটে বাস করেন। তখন রেল বা ডাকঘর ছিল না, কিন্তু তথাচ পথিকদিগের মুখে এবং নানা উপায়ে মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীর সংবাদ পাইতেন। তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছিল, শ্বশুর শাশুড়ী জীবিত ছিলেন না ; পুত্র কন্যা হয় নাই, সুতরাং স্বামী ভিন্ন শ্যামা-সুন্দরীর ইহজগতে আর কেহ ছিল না। আর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু জগৎকে তিনি আপনার বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছিলেন, জগতের উপকারের জন্য তাঁহার জীবন তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের জীবন জগতের শিক্ষক স্বরূপ ছিল। তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন,

সংসারের মনুষ্য-সম্মুখে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। কেবল জীব-শ্রেষ্ঠ মানবের উপকার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। পশু, পক্ষী, পিপীলিকা পতঙ্গ পর্য্যন্ত কেহই শ্যামসুন্দরীর সদ্ব্যবহারে বঞ্চিত ছিল না। দুঃখের বিষয়, এই অসামান্যা রমণীর—এই তপঃপ্রভাবসম্পন্না বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যার বিস্তৃত জীবনী আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উনবিংশ বৎসর বয়ক্রমে যৌবনের পূর্ণাবস্থায়, তিনি সরযূতটে আসিয়া উপনীত হয়েন এবং প্রায় অর্দ্ধশত বৎসর বয়সে কাশীতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই এক সপ্তাহ কালপূর্ব্বে তিনি সরযূতট পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং পতিতপাবনী গঙ্গার পবিত্র কূলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অযোধ্যাপুরীর লোকেরা তাঁহাকে দ্বিতীয় পার্ব্বতী বলিয়া অভিহিতা করিত, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার অনুগত ও ভক্ত ছিল, মুসলমানেরাও তাঁহাকে ঐশী শক্তিসম্পন্না বলিয়া বিশ্বাস করিত। হুমায়ুনের সৈন্যদল যখন সরযূতটে শিবির স্থাপন করিল, তখন সেনাপতি ফইজুল্লার কর্ণে শ্যামাসুন্দরীর গুণানুবাদ আসিয়া পৌঁছিল। সেনাপতি ব্রহ্মচারিণী মাতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রীত হইলেন এবং যে উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় আসিয়াছেন, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়া বলিয়া গেলেন। তাহার পরদিন হইতেই হিন্দুর নেতাদিগের মধ্যে যে সকল পরামর্শ চলিতেছিল, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইতেছিল, ব্রহ্মচারিণী শ্যামাসুন্দরী সে সকলের মূল।

শ্যামাসুন্দরী শক্তি উপাসিকা ছিলেন, কিন্তু মৎস্য মাংস বা মদ্য ব্যবহার করিতেন না; জীব হিংসা করা তাহার নীতির বিরুদ্ধ ও জীবকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরোধী ছিল। কিন্তু স্বদেশ, স্বধর্ম, স্ত্রীর সতীত্ব, এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত তিনি ভৈরবী বেশে মুসলমানের বিরুদ্ধে

অস্ত্র সঞ্চালন করিয়াছিলেন। কতবার তাঁহার দেহে গুরুতর আঘাত লাগিল, কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্যও কাতরা হইলেন না। মোগলেরা যখন শুনিল, এই ব্রহ্মচারিণী হিন্দুদিগের নিকটে "ঐশী শক্তিসম্পন্না" বলিয়া পরিগণিতা, তখন তাহারা ইহাঁকে দুই তিনদিন পর্য্যন্ত অনাহারে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ইঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। যবন হস্তে বন্দিনী থাকিবার সময়ে কইজুনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি ত শক্তি মন্ত্রের উপাসিকা, আর অযোধ্যার নিরা-মিষাশী ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত। তবে বৈষ্ণবের প্রতি শাক্তের এ অযথা সহানুভূতি কেন?" শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "শাক্ত ও বৈষ্ণবে কোন প্রভেদ নাই; প্রত্যেক বৈষ্ণবই শাক্ত এবং প্রত্যেক শাক্তই বৈষ্ণব। যিনিই শক্তি তিনিই বিষ্ণু, যিনিই বিষ্ণু তিনিই শক্তি।"

"মথুরাতে তিনি হন নবঘন শ্যাম,
অযোধ্যাতে হন তিনি রঘুপতি রাম,
কৈলাসেতে তিনি ভস্ম করি কাম,
'মদনারি' নামে বিখ্যাত হয়।
তিনি কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত;
কখনও সৌর তিনি, কখনও গাণপত্য;
কে জানিবে তাঁহার মহত্ব তত্ত্ব,
মূর্খেতে কেবল প্রভেদ কয়॥"

শেষ যুদ্ধে অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের হাতাহাতি যুদ্ধে শ্যামাসুন্দরী গুরু-তর রূপে আহতা হয়েন; সে আঘাতে তাঁহার আর বাঁচিবার আশা রহিল না। মুসলমানদের অনেকে তাঁহাকে বাঁচাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষার আশা খুব কম দেখা গেল। এই সময়ে জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মুখে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার স্বামী অতি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া আছেন, তাঁহারও বাঁচিবার আশা খুব কম। শ্যামাসুন্দরী ঝটিতি অযোধ্যা হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা

করিলেন এবং অতি শীঘ্রই কাশীধামে উপনীতা হইলেন। স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহার দেবোপমরূপ, নয়নের ঐশী জ্যোতিঃ এবং মস্তকের জটাজুট দেখিয়া স্বামী শিহরিয়া উঠিলেন; অতি ভয়ে অতি ভক্তিতে স্ত্রীর পদে মস্তক রাখিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শ্যামাসুন্দরী তাহা করিতে দিলেন না। স্ত্রীর সেই অপরূপ লাবণ্য, সেই দেবভাব পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সাশ্রু লোচনে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার স্বামী বলিলেন, "যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, তাহা হইলে যেন জন্মান্তরে আমি আবার তোমার পতি হইতে পারি! এই জন্মে যত কিছু অপরাধ করিয়াছি, পর জন্মে তোমার সেবা করিয়া যেন তাহার প্রতিকার করিতে পারি।" স্বামীর বল হীন হইল, দৃষ্টি শক্তি কমিয়া গেল, আসন্ন কাল উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন—"মনে রাখিও—ক্ষমা করিও"। এই কথা শেষ না হইতে হইতেই স্বামীর ক্ষীণ দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা তাহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পতিতপাবনী গঙ্গার পবিত্র তটে উপস্থিত হইলেন। সৎকারের বন্দোবস্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চিতায় অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণেরা 'মাতগঙ্গে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে ঐই ত্রিশূলধারিণী ব্রহ্মচারিণী শ্যামাসুন্দরী আলুলায়িত কেশে সেই প্রজ্বলিত চিতা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সায়াহ্নে ধীরা গঙ্গার সম্মুখে সন্ধ্যা সমীরণের মধুর স্বরের সঙ্গে সঙ্গে দুই বার "মাতর্গঙ্গে" "মাতর্গঙ্গে" বলিয়া তপস্বিনী শ্যামাসুন্দরী চিতার প্রজ্বলিত অনল-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। সম্মুখের পবিত্র সলিলা জাহ্নবীর তরঙ্গ মালা ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, সে তরঙ্গমালা অনন্তের দিকে ছুটিল আর ফিরিল না; সতী শ্যামাসুন্দরীর প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল, সে বায়ু অনন্তের দিকে ছুটিল, আর ফিরিল না। দেখিতে দেখিতে শরতের মনোহারিণী পূর্ণিমার অনন্ত আকাশে প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র রাশি শোভা পাইতে লাগিল, তাহার মধ্যে কেবল "ধ্রুব" নামে একটি মাত্র

নক্ষত্র আপনার স্থানের বা গতির পরিবর্ত্তন করিল না; ঘাটের এক ব্রাহ্মণ কন্যা আহ্নিক করিতে করিতে বলিলেন,"সতী স্ত্রী ঐ ধ্রুব নক্ষত্র!"

সতী শ্যামাসুন্দরী আর নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী আছে। বাঙ্গালায় এখন কয়টা শ্যামাসুন্দরী পাওয়া যায়? আমরা শ্যামাসুন্দরীর ন্যায় চিতানলে দগ্ধ হওয়া অথবা স্বামীত্যাগের অনুকরণ করিতে বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার অগণ্য গুণরাশি কয়জন বাঙ্গালী রমণীতে দেখা যায়? মণিকর্ণিকা ঘাট ও দশাশ্বমেধ ঘাট মধ্যে যে সকল অসংখ্য সতীস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্যামাসুন্দরীর স্তূপ-প্রস্তর তাহাদের ঈশান কোণে অবস্থিত। এক সময়ে পাদ্রী উইলিয়ম স্মিথ সাহেব বারাণসীর সাহিত্যসভায় সতীদাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সতী দাহের ঘোরতর বিপক্ষ ছিলেন এবং সতীদাহ প্রথাকে নিষ্ঠুর প্রথা বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু সতী শ্যামাসুন্দরীর কথা উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞ পাদ্রী সাহেব বলিয়াছিলেন Her life was of enthralling interest to the student of humanity, it is a pity that her mantle of inspiration has not yet fallen on any woman of modern India."

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# আমাদের ভিতর ও বাহির।

আজি কালি আমাদের জাতীয় উন্নতির কথা লইয়া প্রায় প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্থানে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে, সৌভাগ্য ক্রমে এতদ্দেশীয় অনেক শিক্ষিতা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত এই শুভদায়ক আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমাদিগকে আশার আনন্দময় আলোকে আলোকিত করিতেছেন। এইরূপ আন্দোলন যে আমাদের দেশের, সমাজের ও জাতির পক্ষে মহা কল্যাণকর, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সকল উপাদান—যে সকল উপকরণ—যে সকল মহাগুণ

অবলম্বন করিয়া জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হয় এবং অধঃপতিত জাতিকে মহোন্নত অবস্থায় উন্নীত করা যায়, তাহা কয়জন বুঝে বা কয়জন বুঝিয়াছে? অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার মাল মশলার নাম ও পরিমাণের হিসাব জানা যেমন আবশ্যক, জাতীয় চরিত্র সংগঠন অথবা জাতীয় জীবন সংরক্ষণ বা পরিপোষণ জন্য তদ্রূপ উপযুক্ত উপকরণের নাম ও পরিমাণ জানার বিশেষ প্রয়োজন। জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় জীবন ছেলের হাতের নাড়ু নহে—জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করিতে হইলে অনেক কাট্ খড়্ পোড়ান আবশ্যক। যথোপযোগী উপাদান না লইয়া জাতীয় চরিত্র সংগঠন করিবার চেষ্টা করা আর বালকের ধূলিখেলার প্রশ্রয় দেওয়া, একই কথা; একটু প্রবল বায়ু বহিলে বালকের খেলায় ধূলি যেমন উড়িয়া যায়, উপযুক্ত উপকরণ না থাকিলে জাতীয় জীবনের পরিপোষণের চেষ্টা তদ্রূপ একটু সামান্য কারণে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারত এখন এমনই সুষুপ্ত যে, ইহাকে জাগাইলেও ইহা শীঘ্র জাগে না, ইহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলে ইহা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার ঘুমায়, সুতরাং একটু আধটু সামান্য চেষ্টায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে সকল মহোপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, যে সকল মহাগুণে তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সুসভ্যতম এবং বিক্রমীতম বলিয়া সুপ্রখ্যাত হইয়াছেন, আমাদিগকে সেই সকল গুণের এবং সেই সকল উপকরণের অনুসরণ করিতে হইবে; এই সমুদয় গুণ ও উপাদানকে আমি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি; ইহাদের একটীর নাম আভ্যন্তরিক, অপরটীর নাম বাহ্যিক। বাহিরে এবং ভিতরে এই উভয় দিকেই কতকগুলি উপকরণের আবশ্যক। আমাদের ভিতর ও বাহির, এই উভয় দিকটা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা ভাল নয় কি?

ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সাহসী এবং বিক্রমী জাতি বাস করেন, কিন্তু ইঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজ জাতির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর, সুতরাং ব্রিটিশের জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবনের উপাদানগুলির সহিত তুলনা করিলেই আমরা আমাদের অভাব, অসামর্থ্য, দুর্ব্বলতা এবং দারিদ্রতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতে পারি। সর্ব্ব প্রথমেই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতে ইচ্ছা করি। পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই বিগত বুয়র যুদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, ক্রমাগত তিন বর্ষাধিক কাল পর্য্যন্ত সমভাবে এই মহা প্রলয়ঙ্কর সংগ্রাম সমগ্র সভ্যজগতকে ত্রস্ত ও চমকিত করিয়া রাখিয়াছিল। ইংরাজেরা এই তিন বর্ষকাল পর্য্যন্ত, এই যুদ্ধ উপলক্ষে, তিন কোটী ২৭ লক্ষ লোককে অন্ন ও বস্ত্র দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন ক্রমাগত ৭৩ মাস কাল পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৬ সহস্র সেনার পোষাক, খোরাক, টিফিণ, লেমনেড, সোডাওয়াটার, মদিরা, বরফ, ফল, মূল, অস্ত্র, শস্ত্র, পীড়ায় ঔষধ, শুইবার বিছানা, খেলিবার সরঞ্জাম, পড়িবার বই, এবং তদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার ভাবিয়া দেখি কি ইংরাজের ধনবল কত প্রবল! এই লক্ষ লক্ষ সেনা পাঠাতে না জানি তাহারা জলের মত কত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে; গোরাদের জন্ম চাকর, পাচক, ডাক্তার, পাত্রী, অধ্যক্ষ, উপদেষ্টা, শিক্ষক, মদ-ওয়ালা, দোকান-ওয়ালা প্রভৃতি না জানি কত লোকই গিয়াছে এবং কত লোকেরই খরচ যোগাইতে হইয়াছে।। তা ছাড়া, হাতি, ঘোড়া, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, গরু, পক্ষী ইত্যাদি এবং সহিস, সেবক, কোচম্যান, টহলদার, কুলী, প্রভৃতির ত কথাই নাই! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ইংরাজ জাতির ধনবলটা কিরূপ! পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, বর্ত্তমান সময়ে লণ্ডন সহরে এবং সহরতলিতে প্রায় ৯ লক্ষ ৫২ সহস্র অট্টালিকা আছে। যেখানে বার মাসই শীত, সেখানে গৃহস্থের খরচ

অসাধারণ, সুতরাং প্রত্যেক গৃহে যদি কয়লা, খোরাক, পোষাক, আস্‌বাব প্রভৃতি বহুবিধ কারণে প্রতিদিন গড়ে ৪৲ টাকা খরচ হয়, তাহা হইলে কেবল এই সাড়ে চারি লক্ষ গৃহ রাখিবার জন্ত রোজ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকারও অধিক খরচ হইয়া যায়। ভাবিয়া দেখিলে, বৃটীশের ধন-বিক্রমটা কিরূপ? অতএব ধনবলটা একটা প্রধান বল; জাতীয় উন্নতি সংসাধন করিতে গেলে যে সকল বাহ্যিক বলের প্রয়োজন তাহার প্রথমটার নাম ধনবল। আমরা জাতীয় জীবন সংগঠন বা পরিপোষণ করিতে চাই বটে, কিন্তু ধন বৃদ্ধির দিকে কাহারও দৃষ্টি আছে কি? অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রে, সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ মহামতি আডাম স্মিথ বলেন—"A nation that struggles for existence—struggles against poverty and lives from hand to mouth, is the most miserable of all nations" অর্থাৎ যে জাতি দরিদ্রতা দুঃখে পীড়িত, যে জাতি দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহারা কখনও একটা "বিক্রমী জাতি" বলিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে শোভা পায় না। সুতরাং জাতীয় জীবন সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করিতে হইলে, প্রথমে জাতীয় ধনের (National wealth) পরিমাণ বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তির সমষ্টির নাম জাতি, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি যদি দরিদ্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে সমগ্র জাতি ধনবলে বলীয়ান হইতে পারে। ইংরাজের ধনবল দেখিয়া আমরা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই; বুয়র যুদ্ধে কোটি কোটি, পদ্ম পদ্ম টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ঐরূপ মহা সংগ্রাম যদি আবার বাধিয়া উঠে এবং আবার যদি (তিন বৎসর নহে) ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে, তাহা হইলেও ইংরাজ জাতি ধনহীন হয় না, তাহারা সমভাবে অযুত খর্ব্ব নিখর্ব্ব টাকা যোগাইয়া উঠিতে পারে। ভাবিয়া দেখ দেখি, ব্যাপারটা কি!! গত ৬৫ বৎসর মধ্যে রুশ যুদ্ধে, ক্রিমিয়া যুদ্ধে, আফ্রিকার যুদ্ধে, আফগানিস্থানের যুদ্ধে এবং

বহু স্থানে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সংগ্রাম দমন করিতে ইংরাজ প্রায় সত্তের শত পদ্ম টাকা খরচ করিয়াছে, বোধ হয়, এই সংখ্যা আমাদের অঙ্ক পুস্তকে নাই! এখনও ইংরাজ জাতির ঘরে ঘরে যে টাকা মজুত আছে এবং যে টাকা ইঁহারা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে, তাহা একত্রিত করিলে সতেরটা কুবের ভাণ্ডার অথবা তিনশতটা কারুণ বাদসাহের খাজনা খানা পরিপূর্ণ করা যাইতে পারে! ভায়া! কেবল "জাতি" "জাতি" বলিয়া চীৎকার করিলে জাতীয় জীবন সংরক্ষিত বা জাতীয়-চরিত্র সংগঠীত হইবে না, প্রথমে খাইবার পরিবার উপায়টার দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক, নতুবা জগত অন্ধকার!! যেখানে অন্ন বস্ত্রের ঠিক থাকে, সেখানে নিশ্চিন্ততার সঙ্গে উৎসাহ, উদ্যোগ, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং নির্ভীকতা আসিয়া উপস্থিত হয়, পেট-খালি লোকের দ্বারা জগতে কোন কালে কাহারও উপকার হয় নাই; ভিখারী দ্বারা কখনও কোন জাতির "জাতিত্ব" সংরক্ষিত হয় নাই; অতএব যাহাতে জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায়, তাহারই প্রথম উদ্যম করা আবশ্যক। জাতীয় জীবনের প্রথম বাহ্যিক বল—ধনবল। জাতীয় জীবনের দ্বিতীয় বাহ্যিক বলের নাম—জন বল। বুয়র যুদ্ধ দ্বারাই দেখান যাইতে পারে যে, ইংরাজের জনবল ধনবল অপেক্ষা কম নহে। ইরাজ মনে করিলে আজ ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব ধাতুর এবং সর্ব্ব প্রকারের অসংখ্যাসংখ্য লোক বাহির করিয়া জগতকে দেখাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, যদি আবশ্যক হয়, সমগ্র পৃথিবী হইতে তাহারা আপনাদের অধিকৃত রাজ্যমধ্য হইতে অসংখ্যাসংখ্য লোকের আমদানী করিতে পারে। কবি, দার্শনিক, তার্কিক, বৈজ্ঞানিক, সংগীত-শাস্ত্র পারদর্শী, যোদ্ধা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, দাতা, জ্ঞানী, ধনী, সাহসী, জ্যোতির্ব্বেত্তা, চিন্তাশীল, সুলেখক, চিকিৎসক, শিল্পী, অসাধারণ পরিশ্রমী কুলী, সমরকুশল সেনা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক ইংলণ্ড হইতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে তাহা আছে কি? ইংরাজের দেশের সকল শ্রেণীর লোককে এদেশের

অনেকে দেখেন নাই। যাহারা সেখানকার সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান শ্রেণীর লোক, তাহারা প্রায়ই স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যায় না, যাইবার অবকাশও নাই; এই শ্রেণীর লোকেরা মন্ত্রিগিরি, কোষাধ্যক্ষগিরি, হাউস-অব-লর্ডের মেম্বরীগিরি অথবা পার্লামেন্টের সভ্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বড় বড় জমিদার—ইহাঁরা আপনার ঘরে রৈইস, ইহাঁদেরই এক একটা লোক কখনও কখনও ভারতবর্ষে লাটগিরি করিতে আইসেন—যথা লর্ড রিপন, লর্ড কর্জ্জন, লর্ড নর্থকোর্ট ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর লোক মহাজন ও সওদাগর এবং বণিক। চতুর্থ শ্রেণীর লোক, সম্বাদ-পত্র সম্পাদক, কবি, দার্শনিক, চিন্তাশীল লেখক, অধ্যাপক ইত্যাদি; ইহারাও প্রায় দেশের বাহিরে যান না। পঞ্চম শ্রেণীর লোক চাকুরে, যথা ইংলণ্ডের মাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি। ষষ্ঠশ্রেণীর লোক প্রবাসী, এই শ্রেণীর মহাপ্রভুরা আমাদের দেশের জেলার জজ এবং জেলার বড় সাহেব অর্থাৎ ডিস্‌ট্রিক্‌ট্ মাজিষ্ট্রেট; সপ্তম শ্রেণীর লোক গোরা, পুলিশের বড় কর্ত্তা এবং নীলকর ও চা-কর প্রভুগণ। জাহাজের কাপ্তেনেরাও এই শ্রেণীর লোক। অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে কুলি, খালাসী, মুটে, মজুর প্রভৃতি। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি কত লোক এবং কত শ্রেণী!! অথচ সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ঈশ্বর না করুন, আজি যদি কেহ লর্ড কর্জ্জনকে হত্যা করে, তাহা হইলে ভাবিও না যে, আর কর্জ্জন মিলিবে না, আবার তাহারা কুড়িজন কর্জ্জন পাঠাইয়া দিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, যদি প্রয়োজন হয়, কর্জ্জন অপেক্ষাও উচ্চতর বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার লোক পাঠাইতে ইংরাজি জাতি অক্ষম হয় না। আবার এদিকে দেখ, যদি আবশ্যক হয়, ইংলণ্ডের দশবৎসর বয়স্ক বালক ও তের বৎসরের বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বুড়া ও বুড়ী পর্য্যন্ত, প্রত্যেক লোক স্বদেশের ও স্বজাতির জন্ম বন্দুক তরবারী চালাইতে চালাইতে অকাতরে হাস্যমুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে; ইংলণ্ডে বৎসর বৎসর লোক

বৃদ্ধি হয়, আমাদের দেশে মাসে মাসে লোক কমে। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প, ঝড়, অত্যাচার, অতি বৃষ্টি, দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, উপার্জ্জনের উপায়াভাব, অনাবৃষ্টি, কৌমার্য্য, কুলীনদিগের অন্যায় বিবাহ প্রথা, প্রভৃতি অসংখ্য কারণে এদেশের লোকক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যে দেশে লোক কম, যে দেশে লোকের সংখ্যার বৃদ্ধি নাই, সে দেশের উন্নতি অসম্ভব। ইংলণ্ডে সংখ্যা এবং গুণ এই দুইটাই আছে, আমাদের quality নাই এবং quantityও নাই। যাঁহারা জাতীয় উন্নতি লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের একথা সদাসর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতীয় জীবনের দ্বিতীয় বাহ্যিক উন্নতির উপাদানের নাম—জনবল।

এইবার তৃতীয় বলের কথা বলিব, জ্ঞানবল। উপরে ইংরাজের যে জ্ঞানবলের কথা বলিয়াছি তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, এতটা জ্ঞানবল না থাকিলে বৃটীশজাতি পৃথিবীর এত স্থানে এত বড় বড় অধিকার রাখিতে সক্ষম হইত না। এতগুলা রাজ্য রক্ষা করিতে কতটা বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রয়োজন, ভাবিয়া দেখ দেখি? জ্ঞানবল না থাকিলে কি ইংরাজজাতি এত বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বহু প্রকার লোকের মধ্যে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিত? আমরা পাঁচ জনকে লইয়া একত্রে ঘর রাখিতে পারি না, কিন্তু ইহারা কোটি কোটি লোককে বশীভূত করিয়া রাখিয়া অবাধে রাজ্যশাসন করিতেছে; ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের জ্ঞানের সীমাটা কত প্রশস্ত। যাহারা আকাশে মানুষ উড়ায়, সলিলে শিলা ভাষায়, এক মিনিটে পেশোওয়ারের খবর গঙ্গা নদীর ধারে আনিয়া দেয়, তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বাহাদুরীর বলিহারী যাই।। প্রকৃত "জাতি" বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে এইরূপ জ্ঞানেরই প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞান ছিল বলিয়া, সেকালের ঝিকিনাড়া, মাথাঙ্গাড়া, তিলককাটা ব্রাহ্মণেরা মত্ত মাতঙ্গসম মহাবিক্রমী ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে মুষ্টির

মধ্যে রাখিয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলেই উঠাইত ও বসাইত এবং বসাইত ও উঠাইত, অতএব জাতীয় জীবনের তৃতীয় বাহিক বল—জ্ঞান-বল।

এতক্ষণ বাহিক বলগুলির কথা বলিতেছিলাম, এবারে আন্তরিক বলের কথা বলিব। ধনবল, জনবল এবং জ্ঞানবল খুব ভাল বল, এবং খুব প্রয়োজনীয় বল হইলেও কেবল এগুলি দ্বারায় জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট হয় না। কেবল ধনে, জনে এবং জ্ঞানে যে জাতির জাতিত্ব রক্ষা হয় না, তাহার অকাট্য প্রমাণ রোমের অধঃপতন। রোমকেরা যখন রূপার চেয়ারে বসিয়া, হাতির দাঁতের টেবিলের উপরে সোণার চামচের দ্বারায় খানা খাইত, তখনই রোমের পতন। অর্থাৎ ধনের অভাব ছিলনা, কিন্তু তবুও পতন হইয়াছে। যখন রোমকেরা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল, যখন ইঙ্গিত মাত্রে ইহারা কোটি কোটি লোক একত্র করিতে পারিত, যখন ইহাদের লোকবল অতুলনীয় ছিল, তখনই ইহাদের পতন! পৃথিবীর তৎকালীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা রোমক সম্রাটদিগকে ঘেরিয়া থাকিত, কিন্তু তবুও রোমের পতন হইল সুতরাং কেবল ধনে, জনে, আর জ্ঞানে জাতির "জাতিত্ব" থাকে না— কেবল বাহিক বলে সমাজ থাকেনা, আভ্যন্তরিক বল চাই। "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" দৈববল অপেক্ষা বল নাই। এই দৈববল ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। যদি বল, ধর্ম্ম কাহার নাম? আমি বলি, সত্যে শ্রদ্ধা অসত্যে ঘৃণা ঈশ্বরে বিশ্বাস, দেশের প্রতি প্রেম ও স্বজাতির প্রতি স্নেহ, হৃদয়ে আশা, মনে উৎসাহ, আত্মায় শুদ্ধতা, চরিত্রে নির্ম্মলতা, অত্যাচার ও অবিচারে তীব্রতা, অন্যায়াচরণে প্রতিবাদ, সদা সত্যের দিকে দৃষ্টি, ন্যায়ের জয় ঘোষণার জন্য অধ্যবসায়, প্রভৃতির নাম ধর্ম্ম। এই আভ্যন্তরিক বল; এই বলের প্রভাবে আর সকল প্রকার বল আপনা হইতে উপস্থিত হয়।

জগতে দুই প্রকার শক্তি থাকে, একটীর নাম সামাজিক, অপরটীর নাম ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত শক্তির সমষ্টির নাম সামাজিক শক্তি,

এই শক্তির বলে ব্রাহ্মণবর্গ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উপরে চিরদিন প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। যে শক্তি কেবল যথেচ্ছাচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহার নাম ব্যক্তিগত শক্তি, যেমন রুসিয়ার সম্রাটের অথবা তুরস্কের সুলতানের শক্তি। বিলাতে বড় বড় ধর্ম্মঘট করিয়া প্রজারা রাজাকে হারাইয়া দেয়। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত শক্তি এবং সামাজিক শক্তি এই উভয় শক্তিরই অভাব আছে। সামাজিক শক্তি কিছু পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু তাহাও অসার এবং অপদার্থ।

এতক্ষণ যে সকল কথা লিখিয়া আসিলাম, তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, আমাদের বাহিরের বল ও ভিতরের বল এই উভয় বলেরই সম্পূর্ণ অভাব। আমাদের ভিতর ও বাহির, দুই দিকেই কেবল খালি, আর খালি, আর খালি!!

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---



## মেওয়ার রাজ্য।

কাশ্মীর ভারতের ভূস্বর্গ বলিয়া পরিচিত; উদয়পুর কাশ্মীর অপেক্ষা কোনও অংশেই অবরতর নহে। এই প্রাচীন ও প্রখ্যাত নগর মেওয়ার রাজ্যের রাজধানী। যে অত্যুচ্চ অভ্রভেদী আরাবলী পর্ব্বতমালা সমগ্র রাজপুতানাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারই একদিকে মরুভূমি সমাচ্ছন্ন মারোয়ার এবং আর একদিকে গহনকাননসঙ্কুল মেওয়ার অবস্থিত। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি মেওয়ার রাজধানী উদয়পুরে গমন করিয়াছিলাম। আজমীর হইতে রাজপুতানা মালওয়া নামক রেলওয়ে লাইন দিয়া প্রথমে চিতোর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। আমি যখন উদয়পুরে গিয়াছিলাম, তখন চিতোর পর্য্যন্ত রেল ছিল, তাহার পরে আর রেলওয়ে লাইন ছিল না, সম্প্রতি চিতোর হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। এখন আরও তিন

মাইল পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন প্রশস্ত হইলে উদয়পুর নগরের ভিতর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটযোগে যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ভেদ্য পাহাড় ভেদ করিয়া রেলের বিস্তৃতি হওয়া অসম্ভব। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের একদিন বুধবারে আজমীর হইতে আমি সায়ংকালে চিতোর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছিলাম, তখন বেলা ৫ ঘটিকা। ষ্টেশন কম্পাউণ্ডের বাহিরে আসিয়া চাহিয়া দেখিলাম, চারিদিকেই প্রশস্ত ময়দান, মধ্যে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন, একটু দূরে সাহেবদের জন্ত একটি ছোট ডাকবাঙ্গালা, এবং তিনটি সামান্ত দোকান ব্যতীত আর সেখানে কিছুই ছিল না। চিতোর নগর অনেকটা দূর, এবং রাত্রি নিকট দেখিয়া আমি একটা দোকানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই দোকানটি, অপর দুইটি দোকান ঘরের ন্তায় সামান্ত পর্ণকুটির মাত্র, তাহাতে ছিটেব্যাড়ার তিনটি ছোট ছোট ঘর, একটি ঘরে দ্রব্যাদি থাকে, একটি ঘরে দোকানী ও তাহার চাকর শোয় এবং পার্শ্বের খালি ঘরটিতে পথিকেরা ভাড়া দিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। চিতোরে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে যেরূপ শীত বোধ হয়, বাঙ্গলা দেশে মাঘ মাসেও তত শীত বোধ হয় না। আমি দোকানে উপস্থিত হইবামাত্র দোকানদারের গুজরাটি চাকর তাহার প্রভুকে সম্বোধন করিয়া তাহার নিজের ভাষায় বলিল "জুয়োতো থয়ো য়াওলা! ও ছে?" মেওয়ারী দোকানদার কহিল "পদারো! পদারো। বিরাজো" আসুন, আসুন, বসুন। তাহার পরে বলিল, "আপনি যদি রাত্রে এখানে থাকেন তাহা হইলে ঘরের ভাড়ার জন্ত এক পয়সা দিউন, আর যদি শয়নের জন্ত খাটিয়া ব্যবহার করেন তাহা হইলে আরও এক পয়সা অতিরিক্ত দিতে হইবে।" আমি তাহাতে সম্মত হইয়া নারিকেল দড়ির তৈয়ারী খাটিয়া অধিকার করতঃ সেই খালি ঘরে একাকী অবস্থান করিলাম। কিন্তু দোকানদার আবার বলিল, "আপনি আমার ঘরে আছেন; জল খাবার প্রভৃতি প্রয়োজন হইলে আমার দোকান ভিন্ন অন্ত দোকানে খরিদ

করিতে পাইবেন না। তদ্ভিন্ন আর এক কথা! আপনি যদি অন্নাদি পাক করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এখানে আপনার অসুবিধা হইবে। কারণ আপনি বাঙ্গালী; বাঙ্গালীরা মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু প্রভৃতি ভক্ষণ করে, আমাদের এখানে সে সকল স্পর্শ করাও হয় না। মাংসাশী বাঙ্গালীকে এখানে পাক করিতে দিই না এবং ঘটী থালা ইত্যাদি ব্যবহার করিতেও দিই না।" আমি দোকানদারকে অভয় দিয়া নীরবে রহিলাম, কিন্তু খাটিয়ায় শুইয়া দেখিতে লাগিলাম দোকানদারের কাপড়খানি এমন মলিন ও দুর্গন্ধময় যে বোধ হয় যেন সেই বৎসরের মধ্যে বস্ত্রখানি জলস্পর্শ করে নাই; গায়ের জামাটি মলিনতায় ভূষো কালিকেও টেক্কা দিয়াছে; গামছা খানির গন্ধে ভূত পলায়, আর দাঁতগুলি বোধ হয় ছয় মাসের মধ্যে একবারও পরিষ্কার করা হয় না। শ্রীমানের গায়ে বিশেষতঃ মোটা পেটের মধ্যস্থিত নাভিস্থলে কোদাল দিয়া চাঁচিলে বোধ হয় দুই চারি সের ময়লা একত্রিত হইতে পারে; তিন দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আটা বা ময়দা মাখিয়া লুচি তৈয়ার করিয়াছিল, হাতের ময়লা হাতেই লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিলাম কেবল লোটাটি খুব পরিষ্কার। আর পর্ণকুটীরের ত কথাই নাই। ঝুল, ঝিয়াণী, মাকড়শার জাল, ধূয়ার মলিনত্ব, "শুকা" তামাকু পোড়া ভস্ম, গোবর লেদী প্রভৃতিতে ঘরগুলি যেন ভূতের আড্ডা বলিয়াই বোধ হইল। শ্রীমান দোকানদার এক দিন তরকারী পাক করেন, তাহাই ৪ দিন ধরিয়া খান তথাচ "বাসী" হয় না; শ্রীমান দোকানদার মেওয়ারী বেণে সুতরাং মাছ মাংস খান না বটে, কিন্তু তাঁহার পাকশালায় মুসলমান কশাই বসে, খৃষ্টান ঢুকে, মেথরের সম্মার্জ্জনীও প্রবিষ্ট হয়, ডোমদিগের শূকরও দৌড়াইয়া আইসে, আর মুসলমানীর হাতের তৈয়ারী তাম্বুলটীও চর্ব্বণ করা হইয়া থাকে, অথচ মৎস্যভোজী বাঙ্গালী অস্পৃশ্য!!

"হেথায় ঝুটা যে সে সাচ্চা বলে
সাচ্চা হয় যে ঝুটা

বাঁবুরিটি ছুঁইকে বলেন—
তোমার অঙ্গে ফুটা।"

য়িহুদীরাও অন্ত জাতির সম্পর্কে বিশেষতঃ সামেরিয়াবাসীদিগের সম্পর্কে এই রূপ ব্যবহার করিত। যিশুখৃষ্ট তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন **Blind guides which strain at a gnat and swallow a camel!**

যাহা হউক আমি সেই খালি ঘরে শুইয়া উপরের বাঁশগুলি গুণিতে লাগিলাম; আর চালের মধ্য দিয়া যে কয়টা নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল তাহারও হিসাব রাখিতেছিলাম। আমার সঙ্গে একখানি কম্বল, একটি ছোট ব্যাগ এবং একটি লাঠি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সঙ্গে ২৬১টী টাকা ছিল, ইহার মধ্যে দুইশত টাকার নোট এবং ৬১ টাকা নগদ রাখিয়াছিলাম। টাকা বা নোট ব্যাগে রাখি নাই, একটা সাদা রুমালে ঐ গুলি অতি সাবধানে কোমরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। দোকানীকে পয়সা দিবার সময় দুই একবার তাহা খোলা হইয়াছিল, কয়েকটা লোক তাহা দেখিয়াছিল। কুটীরের দরজা কঞ্চির আগোড়ের (ঝাঁপের বা দরমার) দ্বারা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, দ্বার খোলাই ছিল। আমার মাথায় তখন খুব লম্বা চুল ছিল, খাটিয়ায় শুইয়া থাকিবার সময় চুলগুলি ঝুলিয়া ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। রাত্রি দুইটার সময় নিদ্রিতাবস্থায় বোধ হইল আমার চুল ধরিয়া কেহ যেন সজোরে টানিতেছে, আমি ঝটিতি জাগিয়া উঠিলাম, উঠিবামাত্র একটা ভয়ানক মোটা, বলবান্, দীর্ঘশ্মশ্রুসমাযুক্ত লোক আমার বিছানার পার্শ্ব হইতে লম্ফ দিয়া গৃহের বহির্দ্দেশে উপনীত হওনানন্তর অতি তীব্র বেগে ময়দানের দিকে দৌড়িতে লাগিল। আমার সন্দেহ হওয়ায় কোমরে হাত দিয়া দেখিলাম, সে রুমালও নাই, আর একটি কপর্দ্দকও নাই। লাঠি হাতে লইয়া সেই শীতের রাত্রে সেই অপরিচিত মাঠে, সেই চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি বাঘের মত দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। সেই

প্রকাণ্ড ময়দানে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না ; কাহাকেই বা ডাকি আর ডাকিবার সময়ই বা কোথায় ? সুতরাং ক্ষণ মাত্র সময় নষ্ট না করিয়া ক্রমাগত সেই শিকার লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে লাগিলাম। চোর যত দৌড়ে আমিও ততই দৌড়াই। উভয়ের মুখে কথাটি নাই, কেবল দৌড় আর দৌড় আর দৌড়! সম্মুখে রেলওয়ের তারের বেষ্টন (ব্যাড়া) আসিয়া গতিরোধ করিল, কিন্তু সে লোকটা বানরের মত এক লম্ফেই নিমেষ মধ্যেই সেই উচ্চ বেষ্টন পার হইয়া চলিয়া গেল ; আমারও বানর সাজিবার সাধ ছিল, কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না, ব্যাড়া ডিঙ্গাইতে একটু বিলম্ব হইল, সুতরাং ধাবমান চোর আমার অপেক্ষা একটু দূরে গিয়া পৌঁছিল। আমার গা দিয়া তখন স্বেদ নির্গত হইতেছে, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাচ দৌড়িতে থামি নাই। তীরের মত খুব জোরে দৌড়িতে দৌড়িতে তাহাকে প্রায় ধরি ধরি করিয়া উঠিলাম, কিন্তু ধরিতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম "ইহারই ভাগ্যে ভগবান্ অর্থলাভ লিখিয়াছিলেন ; সুতরাং আর দৌড়িয়া ফল কি ?" তথাচ অল্পে অল্পে দৌড়িতে লাগিলাম, শেষে সেই মাঠে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিরুপায় অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। লোকটা ক্রমাগত সেই ভাবেই দৌড়িতে লাগিল, কিন্তু বিধির বিধি কে বুঝিবে ? দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ অত্যন্ত আহত হইয়া চোরটা ময়দানে পড়িয়াগেল। সেই খানে এক প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষাধিকারী ঐ গাছের শাখা ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে কিন্তু কাটা গাছের গুঁড়িটা এখনও লইয়া যাইতে পারে নাই, অসাবধানতায় অকস্মাৎ সেই গুঁড়ির আঘাতে চোরের এই দুর্গতি। তাহাকে পতিত দেখিয়া আমি উঠিয়া দ্বিগুণ বল, সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত বাটতি অতীব তীব্র বেগে দৌড়িয়া গিয়া তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলাম, বসিয়াই একহাতে তাহার লম্বা দাড়ি এবং আর একহাতে তাহার কাপড়ের "কাচা" খুব জোরে ধরিয়া রাখিলাম। শেষে উভয়ে সেই মাঠে লোটাপাটি হইতে লাগিল

গুরুর কৃপায় আমি কিছুতেই হারি মানিলাম না, লোকটাকে খুব "কাবু" করিয়া রাখিলাম। ইত্যবসরে একটু দূরে একটা লোককে লণ্ঠন হাতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম "গাড়ীর সময় হইয়াছে বোধ হয় রেলের জমাদার সিগ্‌নেল দিতে আসিয়াছে।" আমি চীৎকার করায়, জমাদারও চীৎকার করিতে লাগিল, তখন রেলওয়ের লোকেরা আসিয়া চোরকে মায় টাকা ও নোট গ্রেপ্তার করিল। যেখানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা রেলওয়ের সীমানার বাহিরে, সুতরাং বৃটিশ পুলিশের সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল না; দেশীয় রাজাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করা অনেক সময়ে বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে; নাকে তেল দিয়া কুম্ভকর্ণের মত এক বৎসর পর্য্যন্ত বিচারকেরা নিদ্রিত থাকেন, তাহার পরে বলেন, "হাঁ, হাঁ, আপনার নালিশ যথাসময়ে পেশ করা যাইবে।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ফৌজদারী হাঙ্গামা করিলাম না; রেলের ভদ্রলোকেরা আমার টাকা ও নোট আমাকে দিয়া চোরটাকে খুব প্রহারপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিল। আমি আবার সেই খালি ঘরে গেলাম, দ্রব্যাদি অবশ্য সেই স্থানেই ঠিক ছিল। প্রভাতে ফৌজদার সাহেব আসিয়া নিজের ইচ্ছায় তদন্ত করিতে লাগিলেন। রাজপুতানার দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে পুলিশ মাজিষ্ট্রেটদিগকে ফৌজদার বলে, ইহারা প্রায়ই তদ্দেশীয় অর্দ্ধশিক্ষিত লোক। ইনি চিতোরের ফৌজদার; কোনও কার্য্যবশতঃ রাত্রে রেলওয়ে ষ্টেশনে ছিলেন। ফৌজদার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উর্দ্দুতে লেখা পড়া করিয়া শেষে বলিলেন, "অ্যায়সা হামেসা হোতাই হায়, ইয়ে কুচ নয়ী বাৎ নেহি। লেকেন আবকে হঁসিয়ার হোনা চাহিয়ে," অর্থাৎ "এমন প্রায়ই হইয়া থাকে (বোধ হয় চিরদিনই এমনি হইতে থাকিবে,) ইহা কিছু নূতন কথা নহে, যাহা হউক অতঃপর সাবধান হওয়া দরকার।" কাহার সাবধান হওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু ফৌজদারের চাপ্‌রাসী ও সিপাহি আসিয়া আমাকে বলিল, মহাশয়! আপনার জন্ম অনেক লেখা পড়া করা

গিয়াছে, প্রাতঃকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অন্ত কিছুই করিতে পারি নাই। যাহা হউক আপনার কাছে আমরা আর অধিক প্রার্থনা করিতেছি না, আমাদিগকে আপনি কেবল আট আনা পয়সা দিউন।" আমি ঝটিতি গিয়া ফৌজদারকে এ কথা বলিলাম। ফৌজদার তাঁহার লোকদিগকে একটি কথাও না বলিয়া আমাকে কহিলেন, "মহাশয়! উহারা নির্ব্বোধ, উহাদের কথায় কাণ দিবেন না, এরকম সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে; উহারাও চাকুরী করিতে আসিয়াছে, রাজ্য করিতে আইসে নাই, আর রাজারাই কি সহজে সুযোগ ছাড়ে?" তাহার পরে চাপরাশীকে কহিল, "তোমরা কি চাও?" সিপাহি ও চাপরাশী বলিল, "হুজুর! সকাল থেকে এখানে বোসে আছি, বাসি মুখে এখনও জল দিই নাই——"। ফৌজদার বলিল, "আচ্ছা, তবে দোকান হইতে এক সের মিঠাই লইয়া আইস।" কিয়ৎক্ষণ পরে সিপাহী আসিয়া কহিল, "হুজুর! দোকানীর এখনও বউনি হয় নাই, সে দাম বিনা এখন মিঠাই দিবে না।" শুনে নাগরা জুতা ঠুকিয়া, আরক্ত লোচনে সক্রোধে ফৌজদারজী বলিল, "আরে বউনি কি এসি তেসি! জল্দি যাও আর চিজ্ উঠা লাও।" সিপাহী দৌড়িয়া গিয়া এক সের মিঠাই আনিল, সেই মিঠাইগুলি রেলের কর্ম্মচারীরা, সিপাহী, চাপরাশী এবং ফৌজদার ভক্ষণ করিলেন। দোকানী আসিয়া মূল্য প্রার্থনা করায় ফৌজদার বলিল, "সবর্ করো, দাম ভেজ্ দিয়া যাগা।" কিন্তু এপর্য্যন্ত দাম যে "ভেজ্" দেওয়া হয় নাই তাহা আমি অষ্ট আনা দামের ষ্ট্যাম্প কাগজে নিশ্চয় করিয়া লিখিয়া দিতে পারি। যাহা হউক অতঃপর আমি অর্দ্ধঘণ্টাকাল পদব্রজে গমন করিয়া চিতোর নগরে প্রবেশ করিলাম। চিতোর নগর যাইতে হইলে একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হয়, তাহার জল বড় সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ। দেওয়ারী স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া এবং শুষ্ক বালুকার উপরে ঘাগরাদি রাখিয়া সন্তরণ ও স্নান করিতেছে দেখিলাম। রাজবাড়, মথুরা, বৃন্দাবন, মধ্যভারত,

রাজপুতনা, বিশেষতঃ পঞ্জাব প্রদেশে সম্পূর্ণোলঙ্গ হইয়া স্নান করার প্রথা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এখনও খুব প্রচলিত আছে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত রূপবতী; পদ্মিনী, সরোজিনী, কর্ম্মদেবী, তীমাবাই প্রভৃতির ইহাই জন্মস্থান।

চিতোর নগরের একদিকে জল (নদী), অপর তিন দিকে পর্ব্বত; পর্ব্বতের ধারে ধারে বড় বড় সুদৃঢ় দেওয়াল দ্বারা সহর বেষ্টিত আছে। যে চিতোর নগরে একসময়ে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিত, যেখানে প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সাতাইশ সহস্র পুরুষ এবং একাদশ সহস্র স্ত্রীলোক তরবারী বা বন্দুক লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিত, এখন সেখানে কয়েক হাজার মাত্র লোকের বসতি এবং সেখানে সাতাইশ জন লোক রীতিমত লাঠি ধরিতে পারে কি না সন্দেহ। চিতোর এক্ষণে আর সহর নহে, একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। গ্রামে দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকের বাস, মধ্যে মধ্যে দুই একজন মেওয়ারী মহাজন ও শেঠ বা সওদাগর বাস করে। আমি যখন চিতোর গিয়াছিলাম তখন গ্রামে একটিও পণ্ডিত ছিল না, একজন রীতিমত মৌলবী পাওয়া যায় নাই এবং চারিজন মাত্র পুরুষের ইংরাজী বর্ণ-পরিচয় ছিল। গ্রামে রাজার ফৌজদারী কাছারী, থানা, একটী ক্ষুদ্র হাঁসপাতাল, ক্ষুদ্র সেনানিবাস এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটী ডাকঘর আছে। গ্রামটি পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। মুসলমান শাসন সময়ে পাহাড়ের উপরে শোভাময়ী প্রাচীনা চিতোরপুরী প্রতিষ্ঠিতা ছিল। যবনকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংশ হইবার পরে পর্ব্বতের নীচে নূতন চিতোর বসিয়াছে। গ্রামের সর্ব্বত্রই প্রাচীন শোভা, সম্ভ্রম, বিভব ও কীর্ত্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়; সর্ব্বত্রই ভগ্নাবশেষ, সর্ব্বত্রই প্রাচীন বিক্রম ও বিভবের ভগ্ন-নিদর্শন। একদিকে নদীতীরে মহাপ্রকাণ্ড পবিত্র শ্মশান-ক্ষেত্র, সেইস্থানে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রাণত্যাগী লক্ষ লক্ষ হিন্দুবীরের সমাধি। তাহারই পার্শ্বে বন, সেই বনে কত অসংযতেন্দ্রিয় মুসলমানের অস্থি

প্রোথিত। বনে এখনও ফুল ফোটে, এখনও ফল ধরে, কিন্তু সে ফুল born to blush unseen আপনার রূপে আপনি মজিয়া থাকে, কেহ তাহা দেখিতে পায় না। বনের পরেই মরুভূমি, তাহা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া যশলমীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আর একদিকে মহাবিশাল প্রান্তর, তাহাতে প্রাচীন চিতোরের অনেক সুকবি সমাধিস্থ, অনেক সমর-রবি অস্তমিত। এখানে অনেক "Inglorious Milton" অথবা Guilless Cromwell থাকিতে পারে। বর্ত্তমান চিতোর দেখিলে প্রাচীন চিতোরের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না; যে দিকেই দেখ, মনে মনে তীব্র বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুরই উদয় হয় না; মনে হয়, মানবের ক্ষণস্থায়ী জীবন, যৌবন, বিক্রম ও বিভব যেন সত্য সত্যই "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং।" চিতোর দেখিয়া কাঁদিলাম; সেখ সাদির কবিতা মনে পড়িল——

চে হংগম্ বপ্‌তম্ কুনৎ জনে পাক্।
চে বর্ তক্‌তে মুর্দ্দন্ চে বর্ রুবে খাক্॥

সকলই ছাই আর ভস্ম বটে। এই সংসার দুই দিনের সরাই, দুই দিনের ছাউনী, চিতোরে আসিলে অহঙ্কারীর অহঙ্কার, বৃথাভিমানীর অভিমান এবং গর্ব্বীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়।

চিতোরে যে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বাটীতে ছিলাম, তাঁহারই সাহায্যে হস্তিপৃষ্ঠে চিতোর পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। পাহাড়ে শীঘ্র উঠা যায় না, একটু পরিশ্রম ও বিলম্ব হয়। পাহাড়ে উঠিয়া সুবিশালা প্রাচীনা চিতোরপুরী দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। সেই প্রাচীনা নগরীর সমুদয়ই ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, কিন্তু এখনও কেবল সেই ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলে একাদশ দিবস ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আমি চারি দিন পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সেই পাহাড়ের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। মিরাবাইয়ের প্রাসাদ ও স্তম্ভ, পুরাতন মুহায়াজার রাজবাটী, আলাউদ্দিনের শিবির স্থান, বহুল ভগ্ন দেবালয়,

পুস্তকালয়, শস্ত্রশালা, অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার আশ্রয়, সেনানিবাস, রত্নভাণ্ডার, ধনাগার, নারীমহল, রাজপুত রমণীদিগের চিতা, রাজা সঙ্গণ সিংহের যজ্ঞভূমি, মুসলমানের বিজয়স্তম্ভ, গ্রহাচার্য্যের জ্যোতিষালয়, দরবার গৃহ, নৃত্যশালা, রামস্তম্ভ, গুরুপাদ, পশালয়, দুর্গ প্রভৃতি বহুল প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। পর্ব্বতের মধ্যে এখন "আতার" খুব বন দেখা যায়, মেওয়ারীরা আতা ফলকে "সরিফা" বলে। ইহা এখানে খুব সস্তা, আমি একপয়সায় ১৬টা খরিদ করিয়াছিলাম। এখানে সর্ষপ তৈল মিলে না, একদিন প্রয়োজন হওয়ায় দশআনা পয়সায় অতি কষ্টে অর্দ্ধ পোয়া তৈল পাইয়াছিলাম। পাহাড়ের উপরে মহাকালীর মন্দির ও মূর্ত্তি আছে; কর্ণেল টড্ এবং সুলেখক বাবু জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের গ্রন্থে এই কালীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই মহামায়া মূর্ত্তি বাস্তবিকই ভয়ঙ্করী এবং সর্ব্বগ্রাসিনী বটে। পর্ব্বতের উপরে প্রাচীনা চিতোর পুরীতে, ৮৪টি কূপ, প্রায় অর্দ্ধশত পুষ্করিণী ছিল, এখনও অনেক কূপ এবং সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে খুব বড় বড় গুহা আছে; তাহার মধ্যে এখন আর সাধুরা প্রায়ই থাকেন না। শুনা যায়, মধ্যে মধ্যে কদাচ এক একজন যোগীন্দ্র পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কেহ কেহ কৃতার্থ হয়েন। আমি যখন চিতোরে গিয়াছিলাম তখন উদয়পুরের মহারাজার লোকেরা ঐ দুর্গ মেরামত করিতেছিল; পাহাড়ের উপর হইতে নীচের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম বলিয়া বোধ হয়। পাহাড়ের উচ্চতা, দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা খুব বড়, কোন দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি চলে না। আর এক দিকে একটী অতীব মনোহর ঝরণা দেখা যায়। এই সুন্দর ঝরণা হইতে বারমাস দিবা রাত্রি প্রচুর পরিমাণে অতি শীতল, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ সলিল নির্গত হইয়া থাকে। এত বড় ঝরণা ভারতবর্ষে খুব কমই দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে স্থানে স্থানে এখনও মনুষ্যের বসতি আছে, কিন্তু অনেক স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ

এবং নানা কারণে পথিকদিগের পক্ষে ভয়ঙ্কর ও বিপদান্বিত। মুসলমান হস্তে বিধ্বস্ত চিতোর দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে ইংরাজ প্রভুত্বেরও স্থানে স্থানে চিহ্ন দেখিলাম। এখানে সর্বত্র শান্তি বিরাজমান। দেখিয়া কবির ভাষায় তখন কহিলাম—

"হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহবারিদচয়
আর যেন বিষ না বরিষে।
শান্তির সরসী মাঝে, সুখসরোরুহরাজে,
মন-ভৃঙ্গ মজুক হরিষে॥"

চিতোর দেখিয়া একা যোগে আমি উদয়পুর প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইলাম।

একজন রাজপুতের একা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আমি চিতোর হইতে উদয়পুরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। রাজপুত গাড়োয়নকে বলিয়া দিলাম, "পথে যদি কিছু দেখিবার আশ্চর্য্য পদার্থ থাকে তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দিও"। চিতোরের প্রকাণ্ড প্রান্তর হইতে সার্দ্ধেক মাইল দূরে গিয়া একাওয়ালা গাড়ীর গতি রোধপূর্ব্বক বলিল, "পথের পার্শ্বে একটা দেখিবার স্থান আছে, আপনি আমার সঙ্গে আইসুন।" রাজবর্ত্ম হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে গিয়া দেখিলাম, এক স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটি সুবৃহৎ সুদৃঢ় স্তম্ভ এবং এই স্তম্ভ দ্বয়ের মধ্যে একটি লৌহনির্ম্মিত প্রকাণ্ড মুদ্গর ভূমিতে প্রোথিত, ইহার প্রায় পঞ্চবিংশ হস্ত দূরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ, তাহার শাখায় একটি সুদীর্ঘ বংশ বাঁধা এবং সেই বংশের অগ্রভাগে কৃষ্ণ বর্ণের একটি ধ্বজা-উড্ডীয়মান। ধ্বজাটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে আবার নূতন ধ্বজা দেওয়া হইয়া থাকে। গাড়োয়ান বলিল, "এই স্তম্ভের সম্মুখে অবনত মস্তক হইয়া নমস্কার করুন।" আমি বলিলাম, "নমস্কার করিবার কারণ কি?" এই কথা শুনিয়া ছোলাভাজা চিবাইতে চিবাইতে গাড়োয়ান যে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক উপাখ্যান আরম্ভ করিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

গাড়োয়ান বলিল, "মুসলমানগণকর্ত্তৃক শোভাময়ী চিতোরনগরী ধ্বংস

হইয়া গেলে, রাণা উদয় সিংহ চিতোর নগরীকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বহুদূরে গিয়া নিজের নামে উদয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করতঃ উদয়পুরে মেওয়ার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। যে স্থলে এই স্তম্ভ ও ধ্বজা দেখিতেছেন, সেই স্থানে মহারাণা উদয় সিংহ গুরু ও পুরোহিতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অসি হস্তে দর্পতঃ প্রতিজ্ঞা করেন যে, যেরূপে যবনেরা চিতোর ধ্বংস করিয়াছে, যতদিন সেইরূপে দিল্লী ধ্বংস করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আর চিতোরের ভূমি স্পর্শও করিব না, যতদিন পর্য্যন্ত মেওয়ারের তরবারীর আঘাতে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই স্তম্ভ, এই মৃণয় ও এই ধ্বজা এইখানে বর্ত্তমান থাকিবে এবং যতদিন এই স্তম্ভকে ভঙ্গ করিবার আদেশ দেওয়া না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত রাণাবংশের কেহ মস্তোকপরে কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণের পাগড়ী ব্যবহার করিবেন না. তদ্ব্যতীত কোন মেওয়ারী হিন্দুর মাথায় কিম্বা দাড়ীতে নাপিতের ক্ষুর ব্যবহৃত হইবে না। যে দিন মহারাণা উদয় সিংহের শ্রীমুখ হইতে এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিঃসৃত হয়, সেই দিবসের রাত্রে চিতোর পর্ব্বতস্থিতা মহাকালী দেবী মহারাণাকে এই স্থানে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, চিন্তা নাই, ভয় নাই, সত্বরেই ভীষণ শত্রুর হস্তে যবন রাজত্ব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় উৎসন্ন হইয়া যাইবে।" গাড়োয়ান আরও বলিল, এই স্তম্ভের সীমা পার হইয়া চিতোরাভিমুখে আগমন করা রাণাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা এক্ষণে আর নাই, তাহা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ বলিতেছি। চিতোরের যুদ্ধ সময়ে জয়পুরের রাজারা গোপনে গোপনে মুসলমানের সহায়তা করায় মেওয়ার রাজ-বংশের সহিত জয়পুর রাজবংশের কথোপকথন, আলাপ, পরিচয় প্রভৃতি বহুবর্ষ কাল পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণা শ্রীল শ্রীযুক্ত ফতে সিংহ বাহাদুরের পিতা কোনও সময়ে আবু পর্ব্বত হইতে মেওয়ারে প্রত্যাগমন করিবার সময়, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জয়পুর নগরের কিছু

দূরে শিবির স্থাপন করতঃ বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন। এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া জয়পুরের তদানীন্তন শিক্ষিত ও বিবেকী রাজা রামসিংহ বাহাদুর ঝটিতি ঐ শিবিরমধ্যে আগমনপূর্ব্বক রাণার পদযুগল স্পর্শ করতঃ কাঁদিতে লাগিলেন। মেওয়ারের রাজা, রামসিংহ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং সম্পর্কে বড় ভাই বলিয়া গণ্য হইতেন। ছোট ভাইকে কাঁদিতে দেখিয়া মেওয়াররাজ, রামসিংহকে সপ্রেম আলিঙ্গন করেন এবং সেই অবধি জয়পুর ও উদয়পুরে আর বিবাদ নাই। জয়পুর হইতে বিদায়গ্রহণ করিবার সময়, রামসিংহ বলেন, "দাদা! এখন ত আর যবন রাজত্ব নাই, এখন সর্ব্বত্রই ইংরাজের রাজত্ব, সুতরাং চিতোরভূমি স্পর্শ না করিবার প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, আর আমাদের রাজসম্মানোচিত এবং দেশীয় প্রথানুযায়ী লাল পাগড়ীই বা কেন না ব্যবহার করিবেন?" এই বলিয়া রামসিংহ, মেওয়ার রাজার মাথায় বহুমূল্যের লালপাগড়ী পরাইয়া দেন। জ্যেষ্ঠ ভাই, কনিষ্ঠ ভাইয়ের উপহার ও অনুরোধ অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না, সেই অবধি মেওয়ার রাজবংশে আবার লাল পাগড়ীর প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। যদিও রাণা ফতেসিংহের পিতা চিতোর-ভূমি স্পর্শ করেন নাই কিন্তু বর্ত্তমান মহারাজা (ফতেসিংহ) চিতোরে অনেকবার গমনাগমন করিয়াছেন। চিতোরদর্শন সম্বন্ধে এবং লাল পাগড়ী সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু এই স্তম্ভ ও ধ্বজা এখনও এখানে রাখিবার আদেশ আছে। বুড়ো বুড়ো মেওয়ারী হিন্দুরা এখনও উদয়সিংহের প্রতিজ্ঞানুসারে মাথা ন্যাড়া হয় না এবং দাড়ির চুল কাটায় না। যে দিন চিতোরের পতন হইয়াছিল এখনও সেই দিন মেওয়ারবাসীর পক্ষে অশৌচের দিন।" *

---

* কর্ণেল টড্ ইহার অনেক কথা তাঁহার রাজস্থানের ইতিহাসে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জয়পুর সম্বন্ধীয় কথার সত্যাসত্য নিরাকরণ জন্য জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে মর্ম্মীয়

এই সকল কথা শুনিয়া আমি আবার একা আরোহণে গন্তব্য নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম গাড়োয়ানকে বলা ছিল "যেখানে সন্ধ্যা হইবে, সেইখানেই গাড়ী থামাইবে ; এই পথ দিয়া রাত্রিতে যাতায়াত করা বিদেশী পথিকের পক্ষে সুসঙ্গত নহে। পথের ধারে, এক মাঠের মধ্যে, সাহেবদের থাকিবার জন্য, উদয়পুরের রাজা একখানি ক্ষুদ্র ডাক বাঙ্গলো প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, প্রথম দিনে সেইখানেই সূর্য্য অস্ত হওয়ায় আমরা সেই বাঙ্গলো ঘরে নিশিযাপন (অথবা পালন) করিলাম। চিতোরের মাঠ হইতে এই মাঠ পর্য্যন্ত কোথাও একখানি গ্রাম দেখিয়াছিলাম বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় দিবস প্রত্যূষে বাঙ্গলো হইতে রওয়ানা হইয়া এক ক্রোশ দূরে যাইবার পরে দেখিলাম, চারিধারেই পাহাড় এবং সেই সকল পাহাড়ের ধারে ধারে অসংখ্যাসংখ্য ছোট বড় বন। আরও একটু দূরে গিয়া বুঝিলাম, আমাদিগকে ক্রমশঃই নীচের দিকে যাইতে হইবে ; পথটি ক্রমান্বয়ে এমন ঢালু হইয়া গিয়াছে যে বোধ হয় যেন আমরা ক্রমাগত পাতালের দিকে যাইতেছি। এইরূপে অনেক নীচে আসিয়া আমরা আবার উপরে উঠিতে লাগিলাম, পথে দুই একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইয়াছিল। সায়াহ্নে একটা গ্রামে পৌছিলাম, সেখানে রাজার নির্ম্মিত সরাই ছিল, সেই সরাইয়ে দ্বিতীয় রাত্রি যাপিত হইল। চিতোর হইতে এই সরাই পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা প্রথম গ্রাম দেখিলাম। পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া বেলা নয়টা পর্য্যন্ত একা চালাইবার পরে দেখা গেল, রাস্তাটি এবারে খুব বক্রভাবে বিস্তৃত হইয়া এক বিশাল বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরাও পথানুসরণ

কান্তি বাবুর নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজবাটীতে অনুসন্ধান করিলে কান্তি বাবু আমাকে বলেন "হাঁ, এইরূপ একটা জনরব আছে। কথাটা অলীক বলিয়া বোধ হয় না।" মেওয়ার রাজ্যে অনুসন্ধান করায় সর্ব্বত্রই একপ শুনিয়াছিলাম। —লেখক।

করিয়া বনে ঢুকিলাম, সেই বনে বিমানবিহারী বিহঙ্গবর্গের বিনোদ কলরবে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকার সময় নশাপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে গাড়ী থামান গেল। বন অতিক্রম করিতে সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল। নশাপুর তদ্দেশীয় ভীলদিগের গ্রাম; গ্রামের প্রায় শতকরা ৯৮ জন ভীল, বাকি রজপুত। আমরা ভীল-সর্দারের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সে ব্যক্তি আমাদিগকে খুব যত্ন করিয়াছিল। ভীলের ভাষা, মেওয়ারী ভাষা হইতে ভিন্ন, কিন্তু ইহাদের অনেকে মেওয়ারী হিন্দি বলিতে পারে। এই ভীল-সর্দার খুব ভাল লোক এবং আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসার সহিত তাহার গৃহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ইহার মুখে মেওয়ারের অনেক ঐতিহাসিক কথা শ্রবণ করিলাম। নশাপুর পল্লীর পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের পাথরের রং খুব লাল, নীচের মাটিও খুব লাল বর্ণের দেখা যায়। সমুদয় পাহাড়টিকে যেন কেহ সিন্দূর মাখাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। চতুর্থ দিবস প্রাতে রওয়ানা হইয়া সায়াহ্নে বেলা ৫টার সময় এক স্থানে গাড়োয়ান এক্কা থামাইয়া বলিল, "মহাশয়! এই স্থানে দেখিবার একটা জিনিষ আছে, একটু অপেক্ষা করুন। এখানে তাড্ সাহেবের হাবেলী দেখিয়া লউন।" আমি বলিলাম, "তাড্ সাহেব কে?" গাড়োয়ান বলিল, "বলেন কি মহাশয়! তাড্ সাহেবের নাম কি জানেন নাই? ইঁহার পূর্ব্বে এদেশে আর কোনও ইংরাজ আইসেন নাই। ইনি ইংরাজীতে আমাদের দেশের খুব বড় কেতাব লিখিয়াছেন, ইঁহার মত দয়ালু, ধর্ম্মভীরু ও সদাচারী ইংরাজ বোধ হয় আর নাই। এই তাড্ সাহেবের কুঠি দেখিবার জন্ম নানাস্থান হইতে দেশীয় ও ইউরোপীয় পুরুষেরা আসিয়া থাকেন!" কথা শুনিয়া, অনেকে ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহা বোধ হয় লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেল টড্ (Todd) সাহেবের বাটী। ইত্যবসরে একটি মেওয়ারী ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার মুখে শুনিলাম একজন ইংরাজ

ঐখানে দাঁড়াইয়া ঐ কুঠির ফটো লইতেছেন। ঝটিতি গিয়া সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ইনি বোম্বাইএর সুপ্রসিদ্ধ টাইমস্ অভ্ ইণ্ডিয়া নামক সমাচারপত্রের সহকারী সম্পাদক। সাহেবের মুখে টড্ সাহেবের বদান্ততা, সাধুতা, * বিজ্ঞাবত্তা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎস্বভাব প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলাম। সাহেব আমাকে কর্ণেল টডের জীর্ণ কুঠি, জলাশয়, কূপ,পুস্তকালয়, কাছারী, চিড়িয়াখানা, ঐতিহাসিক গৃহ সংস্কতশিক্ষায় কুঠির *প্রভৃতি ভাল করিয়া দেখাইলেন। কুঠিটির অনেক দিন মেরামত হয় নাই, একবার রাজপুতানায় সর্ব্বোচ্চ পলিটিকাল পুরুষের ( Governor General's Agent ) চেষ্টায় এবং উদয়পুরের রাণার ব্যয়ে সামান্য মাত্র সংস্কার হইয়াছিল। সার কর্ণেল ট্রেভর (Trovor) সাহেব এই জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনেক দিন মেরামত হয় নাই বটে, কিন্তু টডের ব্যয়ে ও যত্নে কুঠির দেওয়ালে রাজপুতানায় যে সকল প্রধান প্রধান স্থানের চিত্রাবলী অঙ্কিত হইয়াছিল এখনও তাহা অপরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে উদয়পুর নগর প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি পত্রানুসারে তখনকার "রেসিডেণ্ট" গণ সহরের মধ্যে হেড্ কোয়ার্টার করিতে পাইতেন না। এই কুঠির নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ; তাহার নাম হরিপুর ; এই খানে কয়েকটি দরিদ্র নেটিভ্ খৃষ্টান বাস করে। আমরা সন্ধ্যার পরে উদয়পুরে প্রবেশ করিলাম। মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাস নামে এক মেওয়ারী পণ্ডিতের গৃহে আমি অতিথি হইয়াছিলাম, তাঁহার নামে আমার চিতোরের বন্ধু, পত্র লিখিয়াছিলেন, এই জন্য পণ্ডিতজী আরও যত্নের সহিত আমার অভ্যর্থনা

* সহকারী সম্পাদক মহাশয় ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সাহেবের সুবৃহৎ গ্রন্থ (সচিত্র) Times of India কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কুড়ি টাকা মূল্যে ঐ গ্রন্থ বিক্রীত হইতেছে।—লেখক।

করিলেন। শ্যামলদাস ভিন্ন তখন রাজপুতনায় আর কেহ মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই ; বোধ হয়, এখনও এই উপাধি তথায় আর কাহারও নাই। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞান কম থাকিলেও,শ্যামলদাস প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। বড় বড় ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লেখকেরা ইঁহার নিকটে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বড় বড় ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থে ইঁহার নাম সম্মানের সহিত উল্লিখিত আছে। একে শীতকাল তাহাতে রাত্রি—বিশেষতঃ পথের কষ্টে, ক্রমাগত একার হেলন দুলনে এবং অনাহারে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং রাত্রে অধিক কথাবার্ত্তা না কহিয়া আমি বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। শয়নের পূর্ব্বে শ্যামলদাসজীর দক্ষিণ পদে আমি একটা সোনার মোটা "মল" দেখিয়াছিলাম ; অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পণ্ডিতজী! একটা সোনার মল আপনার পায়ে কেন ?" মহামহোপাধ্যায় বলিলেন, "এ দেশে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজদত্ত সম্মান। উদয়পুরের মহারাজা বাহাদুর আমাকে কৃপা করিয়া এই সম্মান দান করিয়াছেন। রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে এদেশে কেহই সোনার মল পরিতে পারে না, পরিলে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়।" পণ্ডিতের সহিত এই কথাটি হইবার পরে আমি শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম এবং রাজপুত গাড়োয়ানের তাড়া চুকাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম।

পর দিবস স্নান ও আহারের পরে, পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কোনও বাঙ্গালী আছেন কি ?" পণ্ডিতজী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন, "এখানে বাঙ্গালী নাই এবং না থাকাই ভাল।" ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্যামলদাস কহিলেন, "পঞ্চানন বাবু নামে এক জন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবা আজমীর সহরে বড় চাকুরী করিতেন, সাহেবদিগের অনুরোধে তাঁহাকে উদয়পুরের ফৌজদারের (পুলিষ ম্যাজিষ্ট্রেটের) পদ প্রদত্ত হইয়াছিল, কয়েক মাস পরে তাঁহাকে বিষ

খাওয়াইয়া এখানকার লোকে মারিয়া ফেলে। সন্দেহযুক্ত মৃত্যু জন্ম বৃটিশ রেসিডেন্টের আদেশে মৃতদেহের শবান্তক পরীক্ষা (Post Mortem Examination) পর্য্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই অপরাধী বলিয়া সন্দিগ্ধ হয় নাই। মৃত বাবুর পরিবারকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি (পেন্সন) দিবার জন্ম মহারাজা আদেশ করিয়াছেন।" এ বিষয়ে অধিক কথাবার্ত্তা না করিয়া আমি উদয়পুর দেখিতে গেলাম। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের রূপ এবং সহরের রমনীয় শোভা দেখিয়া বোধ হইল, ইহা দ্বিতীয় কাশ্মীর। রাজপুতনার মধ্যে জয়পুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সহর কিন্তু জয়পুরের শোভা মানুষিক; উদয়পুরের শোভা সম্পূর্ণ নৈসর্গিক। সহরের চারিধারে সুন্দর সুদৃঢ় এবং উচ্চ দেওয়াল আছে, তাহার ৮টী দ্বার, এই দ্বার সমূহে দিবারাত্রি প্রহরীগণ বিরাজ করে। নগরের তিন ধারে জল এবং এক ধারে খুব উচ্চ পর্ব্বত। উদয়পুরে রাজার একটী স্কুল, দুইটী হাসপাতাল, সেনানিবাস, পান্থাশ্রম, কয়েকটী দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, কাছারী, তোপখানা এবং বৃত্যশালা আছে; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ডাকখানা, তার আফিস এবং রেসিডেন্সীও বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন পাদ্রী সাহেবদের চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, স্কীলস্কুল এবং গির্জ্জাবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সহর খুব বড় নহে, ধুমধাম বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু প্রাকৃতিক শোভা খুব মনোমোহিনী। রাজবাটীর পার্শ্বদিয়া যে সুবিশাল হ্রদ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ও প্রধাবিত হইয়াছে, তাহার জল অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং তাহার শোভা অতীব নয়নানন্দদায়িনী। এই হ্রদের বৃহদাকার মৎস্য ধরা যায়। এই হ্রদের ধারে দাঁড়াইয়া পর্ব্বত, প্রান্তর, জঙ্গল ও জাঙ্গাল বেষ্টিত উদয়পুরকে দেখিতে কি অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। এমন শোভা প্রায়ই দেখা যায় না। অনেক স্থানের শোভাকে কাশ্মীরের শোভা বলিয়া ভ্রম হয়। রাজার কাছারীতে গিয়া দেখিলাম, মোটা মোটা সৎরঞ্চের উপরে মোটা মোটা গদি পাতা আছে, তাহার

উপরে তুলার তোষক এবং তাহার উপরে চাদর, সেই চাদরের উপরে বিচারক আসীন। বিচারকের সম্মুখে তাম্বুলের পিক ফেলিবার জন্ত পিতলের "পিক্‌দান" এবং তামুক খাইবার জন্ত ফুর্শী বর্ত্তমান। রাজপুতনার সকল সহরেই বিচারকদিগের বসিবার জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা আছে। বিচারের প্রথাটার উল্লেখ এস্থলে না করাই ভাল। আমি যে সময়ে উদয়পুরে গিয়াছিলাম, সে সময়ে উদয়পুরে মহা ধুমধাম ছিল। মহারাজার এক কন্তার সহিত কোটার মহারাজার বিবাহের ঘটা ছিল। আমার উদয়পুরে পৌছিবার তিন দিন পরে এই বিবাহোৎসব মহা সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া আজমীর রেল আফিসের ফিরিঙ্গিয়া পর্য্যন্ত বহু সাহেব তথন উদয়পুরে একত্রিত হইয়াছিলেন। সাহেবদিগের নাচ, ঘোড়দৌড়, শিকার, খানা, "পোলো," "বল," "স্বাস্থ্যপান, "বিলিয়ার্ড," ফুটবল, উপহার প্রভৃতিতে না জানি কত লক্ষ রৌপ্য মুদ্রাই উড়িয়া গিয়াছিল !! সাহেব ও মেমেদের নাচ দেখিতে গেলাম। রাজা চোক্ষে অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় পরস্পরের গলা ধরিয়া তাহারা এমন উন্মত্ত হইয়া নাচিতে ছিল যে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া অনেকে হাঁক ছাড়িবার অবসর পায় নাই, সাহেব মেমেরা অতি মজার সুরে কবিবর বায়রণের একটী গীত গাহিতেছিল, তাহা এই—

A glass is good, A lass is good,
A pipe is good in cold weather,
The world is good, the people are good,
And we are all good fellows together.

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# হিন্দুর ভাবীদশা।

অতীতের আলোচনায় উপকার হয় এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু ভবিষ্যতের আলোচনায় যে অত্যন্ত উপকার জন্মে ইহা কি অস্বীকার্য্য? যাহা অতীতের অধিগত হইয়াছে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক,

সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই, সুতরাং পণ্ডিতেরা গতানুশোচনায় অভিমতি দেন নাই।

ভবিষ্যৎকে ছাড়িয়া কেবল অতীতের আলোচনা করা অলস, অকর্ম্মণ্য ও স্বল্পবুদ্ধি মানবের কাজ। অতীতের গরিমা ও মহিমায় স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-বৎসলতা জন্মে একথা স্বীকার করি, কিন্তু কেবল অতীতের গৌরব চিন্তায় কেহ কি কখন বড় হইয়াছে? কেবল চিন্তায় বড় হওয়া যায় না, চিন্তার সহিত কার্য্যকরী শক্তির সম্বন্ধ প্রয়োজন। ভবিষ্যতের গম্ভীর চিন্তায় আমরা ভাল, মন্দ, ক্ষতি, লাভ, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি বুঝিতে পারি। অতীতের সহিত বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত, ভারতের ভাবী দশাটা একবার ভাবিয়া দেখিলে হয় না? মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীমধ্যে পরিগণিত হইলেও, সমগ্র ভারতবর্ষ "হিন্দুস্থান" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; হিন্দুর ভবিষ্যতের উপরে সমগ্র ভারতভূমির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। হিন্দুর ভবিষ্যতে কি হইবে, পাদ্রী প্রভুরা তাহার এক চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাদ্রী মহাশয়েরা খৃষ্টান—হিন্দু নহেন। মুসলমান গ্রন্থেও ভারতের ভাবী দশার সুবৃহৎ চিত্র আঁকা আছে, কিন্তু ইঁহারাও অ-হিন্দু; কেবল হিন্দুই হিন্দুর ঘরের কথা জানে বুঝে ও বলিতে পারে; একজন বৃদ্ধ হিন্দুর তুলিতে ভারতের হিন্দু জাতির ভাবী দশার চিত্র অঙ্কিত হইলে ভাল হয় না? কল্পনা বা খেয়াল দ্বারা এই চিত্র আঁকিব না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভূত বৈষয়িক বিবেক দ্বারা অক্ষপাতসহ এই চিত্র আঁকিয়া দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা করি।

কোনও জাতি, সমাজ বা দেশের ভবিষ্যৎ বুঝিতে গেলে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার দিকে সর্ব্ব-প্রথমে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের ছায়া স্বরূপ। বর্ত্তমানের দিকে চাহিয়া ঐ জাতি, সমাজ বা দেশের কতকগুলি শক্তির অনুসন্ধান করিতে হয়, তন্মধ্যে প্রধান

প্রধান শক্তিগুলির নাম এই,—(১) দৈহিক শক্তি, (২) রাজনৈতিক শক্তি, (৩) আর্থিক শক্তি, (৪) সংখ্যা শক্তি, (৫) সমাজ শক্তি, (৬) মানসিক শক্তি, (৭) ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি, এবং (৮) আধ্যাত্মিক শক্তি— (নৈতিক বল বা চরিত্র বল এই শক্তির অন্তর্গত)।

## (১) দৈহিক শক্তি।

প্রথমে হিন্দুর দৈহিক শক্তির কথা বলিব। হিন্দু রাজত্বের লোপ হইলে এদেশে গ্রীকেরা আসিয়া প্রবেশ করে এবং তাহাদের নিকটে হিন্দু পরাজিত হয়। গ্রীকের সমকালে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে অনেক স্থানের অনেক প্রকার ছোট বা বড় বীরজাতি ভারতে আসিয়া উপদ্রব করে, হিন্দু তাহাদিগের উপদ্রবে পর্যুদস্ত হয়। তদনন্তর সপ্ত শতাধিক বর্ষকাল ব্যাপিয়া মুসলমানেরা ভারত শাসন করেন। হিন্দুরাজত্বের লোপকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন পর্য্যন্ত প্রায় একাদশ শতবর্ষকাল, ভারতের হিন্দু জাতি, বিদেশীয়ের গোলামী করিয়াছে। হিন্দুর যদি দৈহিক বল ছিল, তাহা হইলে হিন্দু যুদ্ধে পরাজিত হইল কেন? অনেকে বলিতে পারে, ছলে ও কৌশলে মুসলমানেরা ভারতাধিকার এবং ভারতশাসন করিয়াছে। সাত শত বৎসরকাল কি ছলে কৌশলেই মুসলমানেরা হিন্দুস্থান শাসন করিয়াছিল? কেবল কৌশল ও কপটতায় পৃথিবীর কোন্ জাতি বড় হইয়াছে, শুধু কৌশল ও কপটতায় কয়দিন রাজত্ব রাখা যায়? আর কয় দিনই বা রাজ্যশাসন করা যায়? পৃথিবীর ইতিহাস দেখ, নরনারীর যৌবন, ছেঁচা জল, বালুর বাঁধ, আর মিথ্যা কথা যেমন স্থির থাকে না, কপটতার রাজত্বও তেমনি স্থির থাকে না। প্রাচীন রোমক, প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক ইংরাজ, ফরাসি, রুষ ইঁহারা কি কেবল ছল, কৌশল ও কপটতার উপরে নির্ভর করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে অমর নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? মহারাষ্ট্রীয়দিগের শিবাজি, শিখধর্ম প্রবর্ত্তক নানক, যবনবৈরী গুরু গোবিন্দ, নাগপুরী বিমল রাও প্রভৃতি

রাজনৈতিক ছল-বিদ্যায় অপটু ছিলেন না, কিন্তু মুসলমানকে তাড়াইতে পারিয়াছিলেন কি? তাঁহাদের হস্তে মুসলমান রাজত্বের লোপ হইয়াছিল কি? স্বীকার করি, মুসলমান শাসনকালে, উদয়সিংহ প্রতাপ সিংহ, শ্রীমন্ত রাও, মানসিংহ, পৃথ্বীরাও প্রভৃতি যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মুসলমানের সমকক্ষতায় যুদ্ধ করিয়া ভারতে হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে, আমেদাবাদের আহবে, অনঙ্গপালের সময়ে, পৃথিরাজার রণে, সোমনাথের আক্রমণে সর্ব্বত্রই মুসলমানের নিকট হিন্দুর বলহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান নিজের দোষেই ভারতরাজ্য হারাইয়াছে, হিন্দুর বৈরীতা বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা তাহার পতনের কারণ নহে। নাদিরসাহ, তৈমুরলঙ্গ, মহম্মদ ঘোরী (আলাউদ্দীন) প্রভৃতি বার বার আসিয়া ভারতকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হিন্দু কি প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিল? দৈহিক বল থাকিলে হিন্দুর এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। দৈহিক শক্তি থাকিলে, সপ্ত শত-বর্ষাধিক কাল যবনের গোলামী করিয়া হিন্দুজাতি অধঃপতিত হইত না। নাদিরসাহ দিল্লীতে এক লক্ষ হিন্দু হত্যা করে; ইতিহাসে প্রমাণ নাই যে, নাদিরসাহ বা আলাউদ্দীন ছলে বা কৌশলে কোনও কার্য্য সমাধা করিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে সম্বাদ দিয়া, যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, ইহারা লুণ্ঠন ও নিহত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন "Their correspondence, if any, was never found to be *sub rosa.* They came in broad day-light and proclaimed the intended massacres by beats of tomtoms," সংখ্যায় হিন্দু মুসলমানের অপেক্ষা কোনও কালেই কম ছিল না, সর্ব্বত্রই হিন্দুযোদ্ধার সংখ্যা অধিক ছিল, কিন্তু তাহাতেও হিন্দু জয়ী হয় নাই। জয়ী হইলে সাত শত বৎসরকাল গোলামী করিবে কেন? দৈহিক শক্তি থাকিলে, সাধ করিয়া কি কেহ গোলামী করে? দৈহিক শক্তি থাকিলে

স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা, মামী, মাসী প্রভৃতির সতীত্বহরণ, স্বধর্ম্মের উচ্ছেদ, দেবালয় ভঙ্গ, শূদ্রদাহ প্রভৃতি মর্ম্মান্তিক অত্যাচারে হিন্দু যবনের নিকটে প্রপীড়িত হইবে কেন? ভারতের নেপাল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজা এবং রাজাদিগের সেনারা একত্র হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ও ধন দিয়া, বুদ্ধি ও কৌশল সহকারে, মুসলমানের সহিত বার বার যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু শেষে বিজয়লক্ষ্মী মুসলমানের প্রাসাদে গিয়া প্রবেশ করিয়াছেন; একথা বলা বাহুল্য, মুসলমানদিগকে সিন্ধুনদ পার হইয়া পর্ব্বত, প্রান্তর, জঙ্গল ও জাঙ্গাল ভেদ করিয়া, বহুদূর, দুর্গম ও ব্যয়জনক পথহইতে সামান্যমাত্র লোক আনিয়া লড়াই করিতে হইয়াছিল। স্বীকার করি, অতীতকালে হিন্দুর মহাবলী ভীম এবং মহাযোদ্ধা অর্জ্জুন ও অভিমন্যু প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা "আপোষে" অর্থাৎ নিজে নিজে, হিন্দুতে হিন্দুতে, ঘরে ঘরে লড়াই করিয়া একে অপরে হারাইয়া দিয়াছিলেন, তখন তুলনায় উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্বের সম্বাদ লইবার কেহ ছিল না, তখন ঘরেঘরেই লড়াই হইত, অপরের সহিত লড়াই হয় নাই। মুসলমানের হাতে পড়িয়া হিন্দুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, হিন্দু বুঝিল "আমার অপেক্ষাও বীর আছে, আমার দৈহিক শক্তির অপেক্ষা মুসলমানের দেহের শক্তি অত্যন্ত অধিক।" হিন্দু বার বার চেষ্টা করিয়াও, শারীরিক ও মানসিক এই উভয় শক্তি সহযোগেও মুসলমানকে হটাইতে পারে নাই—মুসলমানকে বলহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই। তুলনায় হিন্দুর দৈহিক বল কোথায়? মুসলমানের গোলামী করিবার পরে, হিন্দুজাতি, পর্টুগিজ, ফরাসীশ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ প্রভৃতির প্রায় তিনশত বৎসর কাল ধাপিয়া দাসত্ব করিতেছে। ইহারাও কি সকলেই কেবল ছলে বলে এই তিন শত বৎসর কাল নেপাল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত রাজত্ব স্থাপন এবং শাসন বিস্তার করিয়াছে? জেম্‌স্ মিল নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিকের সুবৃহৎ ভারতেতিহাসে দেখিতে পাই,

অতি সামান্ত সামান্ত লোক এবং সামান্ত সামান্ত জাতি ইউরোপ এবং এসিয়ার কোন কোন স্থান হইতে ভারতে আসিয়া দুই দিন চারি দিনের চেষ্টায় এক একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া স্বাধীন নরপতি ভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। হিন্দুরা চোখ কাণ বুঁজিয়া তাহা দেখিত; হাঙ্গামা আরম্ভ হইলেই দুই এক তরবারীর আঘাতে হিন্দু পলাইয়া যাইত। বর্ব্বর মূর জাতির দেহস্থ ধমনীতে মুসলমান শোনিত প্রবাহিত; এই মূরেরা প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষকাল মালাবার উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহল পর্য্যন্ত শাসন করে। বালি দ্বীপের লোকেরা চিরকালই হিন্দু (শৈব), এবং চিরকালই বিদেশীয়ের গোলাম। ইতিহাস পড়িয়া এবং ভারত ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, ইংরাজের অপেক্ষা সর্ব্বত্রই হিন্দুর সেনা ও অস্ত্রের সংখ্যা অধিক ছিল। চিলিয়ানালা, মুদকী, গুজরাট প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া অনেকে হিন্দুর দৈহিক শক্তির পরিচয় দেন,—দৈহিক শক্তি থাকিলে হিন্দু হারিবে কেন? দৈহিক শক্তি থাকিলে শত শত হিন্দু জাতি ও হিন্দু রাজ্য মুসলমান জাতি ও মুসলমান রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল কেন? কেহ কেহ বলিবেন, তোপের মুখে হিন্দু উড়িয়া যায়, টিঁকিতে পারে না; এ কথায় বালকত্ব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না।* কয়টা তোপ লইয়া ইউরোপীয়েরা ভারত জয় করিয়াছে? কয়টা তোপ লইয়া গ্রীক ও মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে বিজয় পতাকা উড়াইয়াছিল? সতের জন মাত্র সেনা লইয়া একদিনেই বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করেন। * আর তের জন বৃটীশ গোরা অটল অচলোপরিস্থিত সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত, গোয়ালিয়র ও ইন্দোর সেনা-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, আসিরগড নামক মধ্য ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ

* অনেকে একথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদে কোনও অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তি পাই নাই। স্বদেশবৎসলতা ভাল জিনিষ বটে, কিন্তু সত্যের জয় ঘোষণা তাহা অপেক্ষা আরও ভাল।—লেখক।

হস্তগত করিয়া লয়। এখনও গরু কাটা হাঙ্গামায় যেখানে যেখানে হিন্দু মুসলমানে লড়াই বাধিয়াছে, কচু কাটার মত মুসলমানেরা হিন্দুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অথবা লাঠি মারা হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু এখনও বৃথা অহঙ্কার ছাড়ে নাই; এখনও বিশ্বাস করে, "আমার শারীরিক বল ইংরাজ ও মুসলমান অপেক্ষা বেশী।" মহরম, চেহেলম, ঈদ, রামলীলা প্রভৃতির উৎসবে হিন্দু ও মুসলমানে যখনই লড়াই হইয়াছে, হিন্দু ঘৃণিত ভাবে আহত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরাজিত হইয়াছে। এটোয়া, দিল্লী, বোম্বাই, মিরট, সালেম, পেশোয়ার প্রভৃতির অসংখ্য লড়াই ইহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও সাক্ষী, তবুও হিন্দু দৈহিক শক্তি লইয়া বৃথা বড়াই করিতে চাহে! তাহার পরে, ভারতের হিন্দু অধিবাসীর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচার করিয়া দেখুন। বাঙ্গালীর শারীরিক বলের কথা না তুলাই ভাল; মাটিয়াদির রামদাস বাবু অথবা ঢাকার বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কয় জন লোক আছেন? বলশালী লোকের সংখ্যা দুই, চারি, ছয় করিয়া অঙ্গুলিতে গণনা করা যায় এবং অঙ্গুলিতে গণনা করিতে করিতেই তাহা সমাপ্ত হইয়া যায়। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া বাঙ্গালীর চিরকালই একটা রোগ। যে দেশে বার বছরের বালিকার গর্ভ সঞ্চার হয়, যে দেশের লোকের বলহীনতার অপনোদন জন্য কন্‌সেন্ট্ আইনের প্রয়োজন, যে দেশে "হরিমতি"র মোকদ্দমার সংখ্যা প্রতি মাসে দুই চারি শত বলিলেই হয়, সে দেশের লোকের আবার বলশালীত্ব দেখাইতে লজ্জা হয় না? এদিকে মান্দ্রাজীর দৈহিক বল বাঙ্গালীরই তুল্য; তেঁতুল-খাওয়া, লংকামরিচজীবি, পান্তাভাতভক্ষী মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী ভ্রাতারই অনুরূপ। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের শিক্ষিত পুরুষেরা পেনেল কোডের ভয়েই আতঙ্কিত, লাল পাগড়ী সিপাই দেখিলেই দরজা বন্ধ করেন। অশিক্ষিত লোকদিগের দৈহিক বলের কথা পরে বলিব। উড়িয়া ও আসামীর দৈহিক বলের কথা না তুলাই ভাল। রাজপুত ও শিখ

এখন সারমেয়রতাড়িত মেষশাবকের অবস্থায় পতিত। ভারতের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকেরা কিরূপে উদরপূরণ করিয়া শরীর ও আত্মাকে রক্ষা করে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতির গড়ে প্রাত্যহিক আহারীয় খরচের একটী তালিকা দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

| নাম। | গড়ে দৈনিক আহারীয় ব্যয়। | নাম। | গড়ে দৈনিক আহারীয় ব্যয়। |
|---|---|---|---|
| বৃটিশ দ্বীপ (যায় ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স্) ... ... | ॥৴০ | অষ্ট্রিয়া ... ... | ৶১০ |
| ফ্রান্স . ... | ।৵০ | চিন ... ... | ৵০ |
| বৃটীশ আমেরিকা ... | ।৵০ | তুরস্ক ... . | ৶১৫ |
| জর্ম্মণি ... ... | ।৴০ | পারস্য ... .. | ৶০ |
| রুষ .. ... | ।১০ | মিশর ... ... | ৴১৫ |
| | | জাপান ... .. | ৴৫ |
| | | ভারত ... ... | ৻১৫ |

হতভাগ্য ভারতের অধিবাসী—ঋষিদিগের, যোগীদিগের, জগতের প্রধান রাজন্তদিগের কামধেনু ভারতভূমির অধিবাসী—সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং ভারতভূমির অধিবাসী—প্রত্যহ গড়ে দুই বেলায় তিনটি মাত্র পয়সায় শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করে। এক বেলায় ভোজনের ব্যয় গড়ে দেড় পয়সা মাত্র। একথা অসত্য নহে, ইহা পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় জলন্ত সত্য। ভারতের কোটি কোটি লোক কেবল এক বেলা মাত্র আহার করে, লক্ষ লক্ষ লোক "চাবানা" (ছোলা ভাজা) খাইয়া এক বেলা উদর পূরণ করে, আর রাত্রে মকাইয়ের রুটি ও পুদিনার চাট্‌নী খায়। কোটি কোটি লোক কেবল লবণ মরিচ দিয়া পান্তাভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরে। গড়ে প্রত্যহ তিনটি মাত্র পয়সা ভারতবাসীর খোরাক! খাইবে কি? ছাই আর ভস্ম! ছাই ভস্ম খাইয়া কি সাংসারিক লোকের কখনও দৈহিক বল হয়? যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী বা মুনিদিগের হইলে হইতে পারে, সাংসারিক মানুষের তাহা হয় না,

ইহা নিশ্চয়। দশ বৎসর গত না হইতে হইতে কতবার দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ হয় তাহা বলা যায় না। দৈহিক বল থাকিবে কেমনে? অসময়ে পুত্র হইলে যেমন সে পুত্র ভালরূপে বলবান, বুদ্ধিমান ও শ্রীমন্ত হয় না, সময় মত বৃষ্টি না হইলে শস্যসমূহও পরিমাণে অপ্রচুর এবং বলহীন হইয়া থাকে। বীর্য্যহীন শস্য খাইয়া দেহের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। আমি বাল্যকালে এক টাকায় এক মণ দুই সের চাউল, দশ সের সর্ষপ তৈল, আড়াই সের ঘৃত এবং কুড়ি সের দুগ্ধ স্বহস্তে খরিদ করিয়াছি। এখন টাকায় আট সের চাউল, সাত পোয়া খাঁটি সরিষার তৈল, তিন পোয়া ঘৃত এবং সাত সের দুগ্ধ। খাইবে কি! পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক টাকায় ২৩ সের ভাল আটা বিক্রয় হইত, এখন সেখানে নয় সের আটা এক টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। কি খাইয়া বলবান হইবে বল দেখি? এ দিকে ধর্ম্মধ্বজী হিন্দু প্রচারক মহা সুযোগ বুঝিয়া, ঘৃত ও দুগ্ধের দুর্ম্মূল্যতা দেখিয়া, অবলা গাভীর নামে হিন্দুকে ঠকাইবার জন্য গোরক্ষিণী সভা স্থাপনা পূর্ব্বক চাঁদা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতেছে। কিন্তু গরু কাটা কোথাও বন্দ হয় নাই; ছাউনীতে (কাণ্টনমেণ্টে), কসাইখানায় প্রতি নিয়ত শত শত গোহত্যা হইতেছে। একটা গাভীও রক্ষা হয় নাই, রক্ষা হইতেও পারে না। মোট কথা এই, যে জাতির প্রাত্যহিক খোরাকের খরচ তিন পয়সা, যে জাতি দ্বাদশ শত বর্ষাধিক কাল ব্যাপীয়া গোলামী বিদ্যায় পটু হইয়াছে, তাহার আবার দৈহিক বলের পরিচয় কি? যাহার উদরে ভাত নাই, গাত্রাবরণের কাপড় নাই, লাঠি ধরিবার ক্ষমতা নাই, যাহার "ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে" এমন ক্ষুধিত, পিপাসিত, কৃশদেহ, কাঙ্গাল ক্রীতদাসের ভাবী দশাকে কি কখনও মহত্বব্যঞ্জক বলিয়া আশা করা যায়? এমন হতভাগ্য দেশ ও এমন হতভাগ্য তুচ্ছ জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও স্থান পায় নাই,

জগতের মানচিত্রে ইহাদের জন্মভূমি কখনও অঙ্কিত হয় না। বৃথা অহঙ্কার, বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর ভাবী দশাটা একবার ভাবিয়া দেখিবে কি? আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। হে ভগবান! সমাজসংস্কারক এবং স্বদেশহিতৈষীদিগের চক্ষু উন্মীলিত হউক, তাহাদের ভ্রমপনের ভ্রম অপনোদিত হউক, বিনীতভাবে তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

## ( ২ ) রাজনৈতিক শক্তি।

ভারতবাসী হিন্দুর রাজনৈতিক শক্তি কেবল সবাদ পত্রের বড় বড় প্রবন্ধে, টাউনহলের সুদীর্ঘ বক্তৃতায়, কংগ্রেসের "লেফাফা দোরস্ত" রিজোলিউশনে। সমগ্র পৃথিবী খুঁজিয়া আসিলেও হিন্দুর এক কাঠা জমিও "নিজের" বলিবার নাই। ভারতে মুসলমান ইংরাজের গোলামী করিলেও, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, তাতার, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান মিশর, জাঞ্জিবার, কুর্দিস্থান, মেসোপটেমিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে তাহাদের স্বাধীনতা আছে এবং রাজ্য ও রাজত্ব আছে। আজি যদি মুসলমানকে ইংরাজ ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলেও মুসলমানের চিন্তা বা আতঙ্ক নাই, তাহারা ভারতের সীমা পার হইয়া অসংখ্য স্বধর্মীর সহিত মিলিয়া নিজের ধর্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহার, শাস্ত্র, সমাজ, স্বাধীনতা এবং শক্তিকে রক্ষা করিতে পারে; এইরূপ পরিবর্ত্তনে তাহাদের ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। ভারতে মুসলমান গোলাম, ভারতের বাহিরে ( স্বরাজ্যে ) মুসলমান স্বাধীন! খৃষ্টানেরা ভারত হইতে তাড়িত হইলে, প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীকে তাহারা নিজের বলিয়া পরিচয় দিতে পারে। বৌদ্ধেরা ভারত পরিত্যাগ করিয়া চীন, তিব্বত, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিতে সক্ষম হয়। স্বল্প সংখ্যক পার্শীরা পারস্যে গিয়া আবার প্রাচীন অগ্নি-উপাসকদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে। কিন্তু ভাই হিন্দু! আজি যদি ইউরোপীয় পুরুষ তোমাকে ভারত হইতে নির্ব্বাসন করে, বল দেখি, তুমি কোথায়

যাইবে? এই সুবিশাল বিশ্বসংসারে তোমার "নিজের" বলিবার এক কাঠা জমিও আছে কি? ভারতের সীমা পার হইলেই তোমাকে মুসলমান না হয় খৃষ্টান অথবা বৌদ্ধ হইতে হইবে। অ-হিন্দু না হইলে তোমার আর ভারত ছাড়া হয় না। অ-হিন্দু হইলে তোমার ভাষা, তোমার ধর্ম্ম, তোমার বেশ ভূষা, তোমার শাস্ত্র—এমন কি তোমার নাম ও রক্ত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তোমার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। রোমকেরা যখন য়িহুদীদিগকে য়িহুদি দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাদের তখন কি দশা হইয়াছিল, পুরাতন বাইবেল পড়িয়া দেখিয়াছ কি? সাত কোটি য়িহুদির মধ্যে এখন পৃথিবীতে য়িহুদির সংখ্যা মোটে ৪০ লক্ষ! মাথা রাখিবার জন্ত শৃগালীর একটা ভূগর্ত্ত থাকে, পাখীর মাথা রাখিবার জন্ত বৃক্ষ কোটর বা নীড় আছে, মকর কুম্ভীরের জন্ত নদ নদী আছে, বাঘ ভালুকের জন্ত বন জঙ্গল আছে,—বল দেখি ভাই হিন্দু। তোমার মাথা রাখিবার জন্ত জগতের কোনও স্থলে একটুকু, স্থানও আছে কি? শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষায় যাহার মাথা রাখিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই, সমস্ত পৃথিবীতে যে জাতি "স্থানশূন্ত", তাহার আবার রাজ-নৈতিক শক্তির পরিচয় দিতে লজ্জা হয় না?

## (৩) আর্থিক শক্তি।

জাতীয় ধন বৃদ্ধি, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির অন্ততম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম ধনী, এখানে টাকা ব্যক্তিবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজে টাকাটা কোথাও সঞ্চিত থাকে না, কেবল জনসাধারণের মধ্যে অতি অল্প অল্প পরিমাণে বিভাগ হইয়া থাকে। যেখানে টাকা জমা আছে সেখানে তাহার ব্যবহার নাই, যেখানে টাকাটা জনসাধারণের মধ্যে বিভাজিত হইয়া গিয়াছে সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে অতি সামান্তমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সামান্ত

মাত্র টাকার জাতীয় ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা হয় না। ভারতের সহিত পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যের জাতীয় ধনের পরিমাণটা একবার তুলনা করিয়া দেখিলে হয় না? কৃষি, বাণিজ্য, ব্যবসা, আমদানি, রপ্তানী প্রভৃতিতে জাতীয় ধনের উৎপত্তি হয়; মুসলমানেরা বিদেশীয় রাজা ছিলেন একথা সত্য. কিন্তু তাঁহাদের শাসন সময়ে এ দেশের টাকা এ দেশেই থাকিত, এখনকার মত সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে টাকা রপ্তানী হইত না, এবং বিদেশীয় হস্তে বিদেশীয় ভোগের জন্য টাকা চালান যাইত না। পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যের জাতীয় ধনের হিসাবটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর দেখি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমস্ত পৃথিবীর সভ্যরাজ্যের যদি মূলধন ১১০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ সম্রাজ্য গড়ে নিম্নলিখিত হিসাবে জাতীয় ধন প্রাপ্ত হয়েন।

| রাজ্যের নাম। | জাতীয় ধন (গড়ে) | রাজ্যের নাম। | জাতীয় ধন (গড়ে) |
|---|---|---|---|
| বৃটীশ দ্বীপ | ... ... ১৯৲ | পর্টুগাল | .. ... ১০৲ |
| আমেরিকা | ... ... ১৭৲ | পারস্ত | ... ... ৪।৵০ |
| ফ্রান্স | ... .. ১১।০ | স্পেন | ... ... ৫৲ |
| জর্ম্মণি | .. .. ৭৲ | তুরস্ক | ... .. ৩।০ |
| অষ্ট্রিয়া | .. . ৬।০ | চীন | ... ... ৪॥০ |
| রুসিয়া | . ... ৮৲ | জাপান | .. ... ৩।৵০ |
| মিসর | .. ৩৲ | ভারতবর্ষ | ... ... ১।০ |
| দিনেমার রাজ্য | . ... ৬৲ | | |

এই হিসাবে শত অংশের একাংশাপেক্ষাও কম ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হয়। তাহাও ইংরাজের—বিদেশীয়ের হস্তে! ভারতের আর্থিক শক্তিটা বুঝিলে কি? দেশীয় রাজাদিগের কাহারও ঘরে নগদ টাকা নাই, প্রাচীন জমিদার বংশ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া আসিতেছে, আধুনিক জমিদারদিগকে গবর্ণমেণ্ট—রেভিনিউ দিবার সময়ে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়, চাকুরীবৃত্তিধারীবৃন্দ প্রায়ই কোনও প্রকারে কেবল

মোটা ভাত ও মোটা কাপড় লইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করেন, শেঠ-সওদাগরেরা যাহা পায় তাহা বাতৃশ্রাদ্ধে বা কন্যা পুত্রের বিবাহে অপব্যয় করে, আর দেশের চা, কাফি, জঙ্গল, খনি প্রভৃতি বিদেশীয়-দিগের হাতে। কৃষকের অবস্থার কথা না তুলাই ভাল। হিন্দুর ভবিষ্যৎটা কেমন উজ্জল তাহা দেখিতেছ? অবশিষ্ট কয়টী শক্তি সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

## (৪) সংখ্যা শক্তি।

এই বারে হিন্দুর চতুর্থ শক্তির কথা বলিতে আকাঙ্ক্ষা করি, এই শক্তির নাম সংখ্যা শক্তি। হিন্দুর কোনও প্রাচীন গ্রন্থে হিন্দুর মোট সংখ্যা কখনই লিখিত হয় নাই; সেকালে সেন্সস্ বলিয়া কোনও গণনা ছিল কি না সন্দেহ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক স্থলে লিখিত আছে, জগদ্বিখ্যাত কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের সমর স্থলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রিত হইয়াছিল। অক্ষৌহিণী বলিলে কি বুঝায় তাহা দেখাইতে গেলে এক পাতা অঙ্ক কসিতে হয়; স্থূল কথা এই, এই মহাপ্রসিদ্ধ সমরক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তৎকালীয় সমুদয় প্রধান প্রধান হিন্দুরাজা, হিন্দুবীর, সমরকুশল রথী এবং অগণ্য সৈনিক পুরুষ একত্রিত হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, এখন তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা মৃত, একথা সত্য, কিন্তু তাহাদের বংশধরেরা কি তাঁহাদের সংখ্যা পূরণ করিয়াছে? নাদির সাহ, দিল্লীতে একাদশ লক্ষ হিন্দু দেখিয়াছিলেন; এখন দিল্লীতে এক লক্ষ হিন্দু আছে কি না সন্দেহ। নাদির সাহ, থানেশ্বরে (কুরুক্ষেত্রে) দেড় লক্ষ হিন্দু নিহত করেন, তাহার পরেও কুরুক্ষেত্রে ৬৭ হাজার হিন্দুর বাস ছিল। এখন সেখানে মোটে ৬ হাজার ৭ শত হিন্দুর বসতি। নাসিকে (পঞ্চবটীতে) শিবাজীর শাসনকালে একলক্ষাধিক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এখন সেখানে মোটে ১৪ হাজার ব্রাহ্মণের আবাস। আলাউদ্দীনের আক্রমণকালে চিতোর নগরে চারিলক্ষ ৫৬ সহস্র হিন্দুর বাস ছিল, এখন সেখানে তিন হাজার

হিন্দুর বাস। আওরঙ্গজেব যখন "জিজিয়া" কর স্থাপন করেন তখন প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক হিন্দুর সংখ্যা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা হইত; দেখা গিয়াছিল ৩১ জন মুসলমান আর একটী পরিবারভুক্ত হিন্দু সংখ্যার সমান ছিল। অর্থাৎ শতকরা ৩ জন মুসলমান, বাকি হিন্দু। এখনকার সেন্সসে ভারতবর্ষে মুসলমান হিন্দুর সংখ্যার প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানশাসনকালে কতকগুলি নগরে হিন্দুর সংখ্যা কিরূপ ছিল আর ইংরাজ-শাসনে সেই সংখ্যার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। গবর্ণমেণ্টের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে ইহা দেখাইলাম।

| নগরের নাম | মুসলমানশাসনে হিন্দুর সংখ্যা | ইংরাজশাসনে হিন্দুর সংখ্যা |
|---|---|---|
| বর্দ্ধমান | দুই লক্ষ ৬৪ সহস্র | ২৮ সহস্র |
| সাহেবগঞ্জ | ৭৫ সহস্র | ৯ ঐ |
| মুঙ্গের | ৫২ ঐ | ৪১ ঐ |
| পাটনা | ৪ লক্ষ | ৮৩ ঐ |
| আরা ( সাহাবাদ ) | ৬৪ সহস্র | ৩৯ ঐ |
| কানপুর | ৭২ ঐ | ২৫ ঐ |
| আগ্রা | ৫ লক্ষ | ৮৮ ঐ |
| ফতেপুর | ২ ঐ | ১ লক্ষ ১০ ঐ |
| এটাওয়া | ৬০ সহস্র | ২৬ ঐ |
| মথুরা | ১ লক্ষ | ৪৯ ঐ |
| আলিগড় | ৪২ সহস্র | ৩৭ ঐ |
| দিল্লী | একাদশ লক্ষ | ১ লক্ষ ১২ হাজার |
| কুরুক্ষেত্র | ৩ লক্ষ | ৮১২৬ |
| কর্ণাল | ২০ সহস্র | ১৪ সহস্র |

অযোধ্যা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশেই মুসলমানের

সংখ্যা অধিক, প্রাচীন ও বর্ত্তমান হিন্দুর সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে হয় না? সর্ব্ব প্রথমে বর্ত্তমান (১৯০১) অব্দের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে ভারতের মোটামুটি লোকসংখ্যা জানা ভাল।

ভারতের লোকসংখ্যা। (১৯০১ অব্দের রিপোর্ট)

বঙ্গদেশ—৭ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৪ সহস্র। বোম্বাই প্রদেশ—৪ কোটি ৮৫ লক্ষ। মান্দ্রাজ প্রদেশ—৩ কোটি ৪২ লক্ষ। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যা—৪ কোটি ৮০ লক্ষ। পঞ্জাব—২ কোটি ২৪ লক্ষ। আসাম—৬১॥০ লক্ষ। আজমীর-মারোয়ার—৪ লক্ষ ৭৬ সহস্র। বরোদা—১৯ লক্ষ ৭ সহস্র। পঞ্জাব দেশীয় মিত্ররাজ্য—৪৪ লক্ষ ২৪ সহস্র। বঙ্গদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য—৩৭॥০ লক্ষ।

এইবারে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ কিরূপ কমিয়া আসিয়াছে তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন।

| প্রদেশের নাম। | মুসলমানশাসনে হিন্দুর সংখ্যা | ইংরাজ-শাসনে হিন্দুর সংখ্যা |
|---|---|---|
| অযোধ্যা | ২ কোটি ৭২ লক্ষ | ১৩ সহস্র |
| উত্তরপশ্চিমাঞ্চল | ৯ ঐ ৪ ঐ | ২ কোটি ৩২ লক্ষ |
| পঞ্জাব | ২॥০ ঐ | ১ ঐ ৬ ঐ |
| মধ্যভারত (মালব) | ২॥০ ঐ | ৯৯ ঐ |
| রাজপুতনা (সমগ্র) | ২ ঐ | ১ ঐ ১২ সহস্র |
| বোম্বাই প্রদেশ | ৬ ঐ | ২॥০ ঐ |

ইহাতে বেশ বুঝা যায়, হিন্দুশাসনকালে হিন্দুর সংখ্যা যেরূপ ছিল, মুসলমানশাসন সময়ে তাহা ছিল না, ইংরাজ আমলে আরও কমিয়া গিয়াছে। চিতোরের যুদ্ধে মুসলমানের হস্তে এত উপবীতধারী হিন্দু নিহত হইয়াছিল যে, তাহাদের উপবীত ওজন করিয়া ৭৪ মণ হয়; এখনও সে দেশে গোপনীয় পত্রে ৭৪।০ দাগ দেওয়া হয়, যে কেহ ঐ গোপনীয় পত্র খুলে সে অতগুলি হিন্দুহত্যার পাতকী বলিয়া গণ্য হইয়া

থাকে! বল দেখি, এত হিন্দু গেল কোথায়? প্রত্নতত্ত্বশাস্ত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে, মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, সমগ্র আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সোয়াট এবং কাফ্রিস্থান প্রভৃতি হিন্দুর দেশ ছিল। রঘু রাজার দিগ্বিজয়ে ও প্রাচীন ভূগোলে তাহার প্রমাণ আছে। এখন সেখানে কেবল মুসলমান আর মুসলমান! ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্ব্বর জাতি ভারতের প্রান্তদেশে বাস করিত, ইহাদের মধ্যে আফ্রিদি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও সুশ্রী জাতি ছিল, ইহারা সকলে প্রাচীন হিন্দু-বংশাবতংস বলিয়া পরিচয় দিত, ইহাদের আচার ব্যবহারও হিন্দুর মত ছিল, প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল কাবুলের আমীর আবদর্ রহমন ইহাদের সকলকে মুসলমান করিয়া লইয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের "বোরা" নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান জাতির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা সকলে আগরওয়ালা বেণে ছিল। মালাবার উপকূলের কালিকট প্রভৃতি নগরে মোপ্‌লা প্রভৃতিবত মুসলমান বাস করে, জামোরীণের শাসন সময়ে ইহারা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সবক্তাগীন, আলপ্তাগীন ও মার কাশমের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে একটিও মুসলান ছিল না, এখন ভারতে ৬৫ কোটি মুসলমান, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কি হিন্দু ছিল না? হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে না বাড়িয়াছে? গ্রেগরী নামক পোপের পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপ কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত ছিল না, এখন সমগ্র ইউরোপ খৃষ্টান; কলম্বস এবং কাপ্তেন আমেরিগো কর্ত্তৃক আমেরিকার আবিষ্কারের পূর্ব্বে তদ্দেশবাসীগণ অসভ্যজনোচিত ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এখন সমগ্র আমেরিকা খৃষ্টান, অষ্ট্রেলিয়ার সমুদয় অংশই খৃষ্টান রাজ্য ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীর বাস; তাহার পরে মুসলমানের সংখ্যা দেখ। সমস্ত তুরস্ক, পারস্য, আরব্য, তাতার, মিশর, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সোয়াট, কুর্দ্দিস্থান, আফ্রিকার নানা প্রদেশ, ইউরোপের মূর জাতি, স্পেনের অংশ বিশেষ, জাঞ্জিবার, মলয় দ্বীপ, আফ্রিদিস্থান, ভারতের প্রান্তপ্রদেশ,—এই সমুদয়

স্বলই মুসলমানে আচ্ছন্ন। এতদ্ভিন্ন জগতের সকল দেশেই খৃষ্টান এবং মুসলমান আছে। বৌদ্ধেরা হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এখন হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধের সংখ্যা অধিকতর। ভারত ছাড়িয়া হিন্দুর সংখ্যা কোথায় ? পৃথিবীর কোন অ-হিন্দু দেশ হিন্দু হইয়া গিয়াছে কি ? হইবার ভরসাও আছে কি ? হওয়া সম্ভবপর কি ? সমুদয় পৃথিবীর অন্তর্গত আসিয়া নামক খণ্ডের এক অংশের নাম ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষের খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, মুসলমান, জড়োপাসক প্রভৃতির মধ্যে হিন্দু একটা জাতি। পৃথিবীর তুলনায় ভারত একটা সামান্ত দেশ এবং হিন্দুর সংখ্যা আরও সামান্ত। প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। পাত্রী ওয়েল্‌ডন্ বলিয়াছেন, গত বৎসরে ভারতবর্ষে নানা কারণে ৫০ লক্ষ হিন্দু খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম কখনও "কল্‌মা পড়া" বা "বাপ্‌তাইজ্ করার ধর্ম্ম" মধ্যে গণ্য ছিল না, এখনও নাই, সুতরাং ইহা Proselytizing Religion নহে; অন্ত সম্প্রদায় হইতে কাহাকেও হিন্দু করিয়া লওয়া অসম্ভব। হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে ? কমিবার লক্ষ উপায় আছে, বাড়িবার একটা উপায়ও দেখিতেছি না। হিন্দুর মতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, বিধবা বিবাহ থাকিলে বৃদ্ধির একটু ভরসা থাকিত, লক্ষ লক্ষ বিধবার পুত্রোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইতেছে। এদিকে আবার দেখ, কেহ যদি বিলাত গেলেন, কেহ যদি অ-হিন্দুর অন্ন স্পর্শ করিলেন, কেহ যদি হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার করিলেন, কেহ যদি দেশাচার বা লোকাচারের বিরোধী হইলেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দুসমাজভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে না বরং কমিতেছে। অযোধ্যা, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান হইয়া যায়। সেখানে যে সকল হিন্দু স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি করে তাহাদের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান হইতে বাধ্য হয়, কারণ মুসলমান না হইলে তাহাদের সুবিধা নাই। সে দেশে মুসলমানেরা

একটা দরিদ্র হিন্দু বালক বালিকাকে ভিক্ষা করিতে দেখিলে তাহাকে রুটি খাওয়াইয়া দেয় এবং রুটি খাওয়াইয়া দিয়া বলে "তোমরা যবনার গ্রহণ করিয়াছ", সুতরাং তাহারা মুসলমান হইয়া যায়। রাজপুতনার টঙ্ক, বাঙ্গালার মুর্শীদাবাদ, হয়দ্রাবাদের নিজামরাজ্য প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে সাহায্য দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের খৃষ্টান-মিশন-ফণ্ড হইতে হিন্দুর খৃষ্টান হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে; অন্যধর্ম হইতে হিন্দু হইবার কোনও সাহায্য, উৎসাহ বা উপায় আছে কি? এখন জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুর সংখ্যা কমে না বাড়ে? দুর্ভিক্ষ মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতির ত কথাই নাই, খৃষ্টান হওয়া, মুসলমান হওয়া অ-হিন্দু হওয়া প্রভৃতির ত কথাই নাই, এখন জিজ্ঞাসা করি এইরূপে ক্রমশঃ কমিতে থাকিলে, সংখ্যার আধিক্য কতদিন থাকিতে পারে? হিন্দুর ভবিষ্যৎটা কেমন উজ্জ্বল বুঝিতেছ কি? যাঁহারা বলেন, আবার হিন্দুরাজত্ব স্থাপিত হইবে, আবার সমস্ত ভারত—সমস্ত জগৎ—হিন্দুময় হইয়া উঠিবে, তাঁহারা তাঁহাদের কথার কোনও প্রমাণ দিতে পারেন না। যাঁহারা বলেন হিন্দুরা লাখে লাখে বাড়িতেছে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত? হিন্দুর এখন আর যোগ বা গুণ নাই এখন কেবল বিয়োগ! আডিশন হইবার যে ভরসা টুকু ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ভরসা টুকুর সম্বাদ রাখ কি? দিন কতক ধূয়া উঠিয়াছিল, বৌদ্ধেরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু হইয়া যাইবে, থিয়োসফিষ্ট সোসাইটির কর্ণেল অল্‌কট্ হিন্দুর মনস্তুষ্টির জন্য এই কথার প্রথম প্রসঙ্গ করেন, কিন্তু বেল পাকিলে তাঁহাতে কাকের যে কোনও উপকার হয় না, কাক তাহা বুঝিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় বৌদ্ধ সাম্রাজ্য এই বৃদ্ধ লেখক তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, চীন, তিব্বত, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল দেখিয়া আসিয়াছি। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, বর্ত্তমান বৌদ্ধের সহিত হিন্দুরা কখনই সম্মিলিত হইবে না, হইতেও পারে না।

সমুদয় বৌদ্ধ জাতিই প্রায় নাস্তিক এবং ধর্ম্ম, চরিত্র, শাস্ত্র, সমাজ, আচার, শুদ্ধতা, প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের মধ্যে কিছুই নাই। পৃথিবীতে বৌদ্ধ জাতির যেমন অধঃপতন হইয়াছে এমন অধঃপতন আর কাহারও হয় নাই। ক্যাণ্ডি, কলম্বো প্রভৃতি স্থানের বাজারে গিয়া দেখ, জবাই করা গরু এবং শূকরের মুণ্ড ঝোলান আছে, বৌদ্ধ তাহা বিক্রয় করে এবং খায়। হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের মিলন একেবারেই অসম্ভব। হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির ভরসা কোথায়? হিন্দুর ভাবী-দশা চিন্তা করিলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

## (৫) সামাজিক শক্তি।

হিন্দুর পঞ্চম শক্তির নাম সামাজিক শক্তি। সামাজিক বন্ধন, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক একতা হইতে এই শক্তি উদ্ভূত হয়। মনে কর, ক একটী দেশের নাম, এই দেশের উত্তরে খ, দক্ষিণে গ, পূর্ব্বে ঘ এবং পশ্চিমে ঙ। খ হইতে গ এবং ঘ হইতে ঙ এই সমুদয় দেশটিতে যদি এক ভাষা ও একই ধর্ম্ম প্রচলিত থাকে তাহা হইলে মানবসমাজের সামাজিক একতা ও শৃঙ্খলা বড় সুন্দর হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে পৃথিবীর অনেক স্থলে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশ যত বড় হয়, ভাষা ততই ভিন্ন হয় এবং ধর্ম্ম এক থাকিলেও সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি ভিন্ন হইয়া পড়ে, খণ্ড দেশে এইরূপ একতা সম্ভব, বৃহদ্দেশে সম্ভবপর নহে; কিন্তু তাহা হইলেও ভারতে হিন্দু সমাজে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য এরূপ আর কোথাও নাই। তুরস্কে যদি এক মুসলমানের সহিত এক মুসলমানীর বিবাহ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের একজন মুসলমান মোল্লার ভাষা ও পরিচ্ছদ ভিন্ন হইলেও তিনি ঐ বিবাহের পৌরহিত্য করিতে পারেন। একজন জর্ম্মন (খৃষ্টিয়ান) পাদ্রীর ভাষা ভিন্ন হইলেও ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় বিবাহের তিনি পুরোহিত হইতে পারেন, কিন্তু একজন উড়িয়া বা আসামী ব্রাহ্মণ একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে পারেন

না। হিন্দুস্থানীর বিবাহে বোম্বাইবাসী, বোম্বাইবাসীর বিবাহে মাদ্রাজী, মাদ্রাজীর বিবাহে পঞ্জাবী কিম্বা পঞ্জাবীর বিবাহে বাঙ্গালী পুরোহিত হইতে পারে না। "ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বিনির্গত" ইহা বেদবাক্য বেদমতে সকল ব্রাহ্মণই এক পদবীতে উপবিষ্ট; শাস্ত্রকারেরা কেবল দেশ ভেদে পঞ্চবিধ গৌড়ীয় ও পঞ্চবিধ দ্রাবিড় এই দশ প্রকার ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কেহ কাহারও হস্তে তৈয়ারী অন্ন গ্রহণ করেন না; এক বাঙ্গালা দেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, আচার্য্য, মহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা পরস্পরের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন। ভারতের অন্যান্য অংশে সার্দ্ধেক শতাধিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন, ইহাঁদের নামও হয়ত অনেক পাঠক শ্রবণ করেন নাই। ইহাঁরা পরস্পর কাহারও অন্নগ্রহণ বা বিবাহাদি আদান প্রদান করেন না। অন্যান্য জাতির ত কথাই নাই; এই প্রকার সকল বর্ণেই সহস্র সহস্র শ্রেণী আছে; সামাজিক বন্ধন কেমন করিয়া দৃঢ় হইতে পারে? তদ্ভিন্ন শাক্ত বৈষ্ণবের কিম্বা বৈষ্ণব শাক্তের অন্নগ্রহণে প্রায়ই সন্দিগ্ধ, মাদ্রাজে শৈবেরা বিষ্ণুভক্তদিগের সহিত আহার করেন না। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসী প্রভৃতিদিগের মধ্যেও জাতিভেদ আছে; গৌড়ীয় শ্রেণীর বৈরাগীরা রামায়ৎ শ্রেণীর বৈরাগীদিগের অন্ন গ্রহণে অসন্তুষ্ট, তান্ত্রিক অঘোরীদিগের অন্ন অন্য সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকেরা প্রায়ই গ্রহণ করেন না। হিন্দু মরিয়া গেলেও জাতি ভেদের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার মৃতদেহ কেবল ব্রাহ্মণেই বহন করিতে অধিকারী। সমাজবন্ধনে একতা হয়, এরূপ একতা হিন্দুসমাজে অসম্ভব। মনে কর, আজি যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটি আইন করেন যে মাংস আহার করিলে ভারতবাসী হিন্দুর প্রাণদণ্ড হইবে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জন কতক বাঙ্গালী, জনকতক উড়িয়া ও আসামী এবং রাজপুত বিদ্রোহী হইতে পারে, কিন্তু মাদ্রাজ, বোম্বাই, গুজরাট, অযোধ্যা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মালাবার উপকূলস্থ হিন্দুর নেতারা কখনই

এই বিদ্রোহে যোগ দিবেন না এবংএ কতায় বদ্ধ হইবেন না; তাঁহার বলিবেন, "ইহা সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ আইন নহে, ইহ হিন্দুধর্ম নাশের আইন নহে।" যাহার সহিত আহার চলে না, বিবাহ চলে না, যাহার জলপাত্রটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পার না, তাহার সঙ্গে প্রকৃত সখ্য কয়দিন থাকে? যদি বল, আহার বিবাহাদি না চলিলেও এক ধর্ম্মের (হিন্দু ধর্ম্মের) নামে একতা হইতে পারে, কিন্তু তাই বা কৈ? উত্তরের হিন্দুধর্ম দক্ষিণের হিন্দুধর্ম নহে, পূর্ব্বের হিন্দুধর্ম পশ্চিমের হিন্দুধর্ম নহে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি হিন্দুর বড় বড় ক্রিয়া ও প্রথা এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্বতন্ত্র। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ধর্ম্মবিশ্বাসও এক নহে বঙ্গের কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি ভারতের আর কোনও হিন্দু সম্প্রদায়ে নাই; মাদ্রাজের সুব্রামনি, মালাবারের নাগকোরেলা, বোম্বাইয়ের বিঠুল, বাঙ্গলার শীতলা, কচ্ছদেশের পুণিয়া, পাঞ্জাবপ্রান্তের শোহাজা প্রভৃতি বিগ্রহমূর্ত্তি তদ্দেশেই সীমাবদ্ধ, অন্য দেশের লোক তাহা জানেনা। সারস্বত ব্রাহ্মণবর্গ ক্ষত্রিয়ের হস্তে তৈয়ারী অন্ন আহার করেন, এবং ক্ষত্রিয় শিষ্যের সহিত একাসনে বসিয়া অবাধে ভোজন করিয়া থাকেন। ভারতের অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট ইহা অ-হিন্দু জনোচিত ব্যবহার বলিয়া গণ্য হয়। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বিশেষতঃ সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর (মায় মহীশুর, কর্ণাট কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর এবং মালাবার উপকূল) ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও হাতে পানীয় বা ব্যবহার্য্য জল গ্রহণ করেন না, অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের হাতে জল খান। বাঙ্গলায় নাপিতের হাতে জল লওয়া অপবিত্র নহে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নাপিতের জল অস্পৃশ্য। পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে প্রায় সর্ব্বত্রই এমন কি ত্রিসন্ধ্যাযুক্ত বেদাচার্য্য ব্রাহ্মণের গৃহে মুর্গীমাংস নিত্য ভোজন, সে দেশে মুর্গীকে "চুচা" কহে, ভদ্রলোক অভ্যাগত হইলে চুচা মাংস দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করা বড় সম্মানের

কথা। বিকানীর, যশলমীর প্রভৃতি স্থানে মুসলমান ভিস্তিরা হিন্দু গৃহস্থের ঘরে পানীয় জল পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বড় বড় আসরে মুসলমান বাঁই নৃত্য করে অথচ সেই বিছানায় বসিয়া হিন্দুরা পান খায়, তামাক খায় এবং সরবত পান করে। বাঙ্গালায় বা আসামে অথবা অন্ত প্রদেশে হিন্দুপুরুষ মুসলমানীর সহিত অবৈধ প্রণয়াসক্ত হইলে পতিত হয়; অযোধ্যা, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রকাশ্যভাবে হিন্দুরা মুসলমানী বেশ্যাকে রাখে। মান্দ্রাজের নাইডু, পিলে মুদালিয়ার প্রভৃতি বড় বড় হিন্দুদের মুর্গীমাংস নিত্য ভোজন; মান্দ্রাজে চেটি এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন মুর্গী সকলেই প্রকাশ্যভাবে খায়। তাহারা ঘরে মুর্গী পোষে। বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে অতি শৈশবে কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রথা আছে; ভারতের অনেক স্থানে ব্রাহ্মণ কন্যারও ১৮ বৎসরে বিবাহ হয়। তাহাতেই বলিতেছি, আহারে, বিবাহে, ক্রিয়ায়, পরিচ্ছদে, উৎসবে কোনও বিষয়েই হিন্দুর পরস্পর একতা নাই। মালাবার উপকূলের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রানীর পাণিগ্রহণ করে এবং তাহাদের অপত্য ব্রাহ্মণ হয়; ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দু পুত্র হিন্দু পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, মাতুলের বিষয় অধিকার করে; কোচিনে ব্রাহ্মণেও মাসীর কন্যা, মামীর কন্যা, খুড়ীর কন্যা, জ্যেঠার কন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ করে; কাচ্ছদেশে জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিধবা ভার্য্যার পাণিগ্রহণের প্রথা আছে। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নানা মূর্ত্তি—দেখিলে কি? ক দেশের হিন্দুধর্ম্ম খ দেশের হিন্দুধর্ম্ম নহে কিন্তু ক দেশের খৃষ্টানধর্ম্ম আর খ দেশের খৃষ্টানধর্ম্ম অবিকল এক। উত্তরের হিন্দুয়ানী দক্ষিণের হিন্দুয়ানী নহে কিন্তু উত্তরের মুসলমানধর্ম্ম আর দক্ষিণের মুসলমানধর্ম্ম এক। তাহার পরে আর একটা কথা আছে, এটা খুব প্রয়োজনীয় কথা। দেশের যাহারা গণ্য, মান্য, বিদ্বান, বিবেচক, ক্ষমতাপন্ন এবং হিতৈষী তাহারা তোমাদের চক্ষের শূল, আর যাহারা ঠক-বিদ্যায় পটু, অলস, কুসংস্কারাপন্ন, নিঃস্ব, ক্ষমতাহীন, অকর্ম্মণ্য, স্বার্থপর, ধর্ম্মধ্বজী

তাহারাই তোমাদের খুব প্রিয়। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া যাঁহারা অতি উচ্চ উচ্চ সম্মানিত পদে নিযুক্ত হইতেছেন, নানা বিদ্যায়, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন, যাঁহারা ক্ষমতায় কেশরীতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বাগ্মীতায় বর্ক, ধনোপার্জ্জনে যাঁহারা পটু, দরিদ্র পালনে যাঁহারা রিক্তহস্ত, যাঁহাদের দ্বারায় নানা প্রকারে দেশের, জাতির ও সমাজের হিতসাধন হইতেছে, তোমরা তাঁহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করিবার জন্ত বড়ই উৎসাহী ; তবে কাহাকে লইয়া সমাজরক্ষা করিবে ? জনকতক টিকিনাড়া, তিলককাটা, নিঃস্ব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অলস, কপটাচারী, লোভী, "শিষ্যের মাথায় হাত বুলাইয়া খানেওয়ালা," বুড়ো গোঁড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা কি সমাজ রক্ষা হয় ? হিন্দুর সামাজিক শক্তি কোথায় ? যাঁহাদিগকে সমাজের নেতা করিয়া রাখিয়াছ তাহারা পদার্থহীন। প্রাচীন রোমক জাতি সামাজিক শক্তির অভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে আর অতি পুরাতন প্রসিদ্ধ ও বিক্রমী রিহুদীরা প্রায় লুপ্ত হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে ক্রোট কোটি রিহুদী ছিল, এখন ৪০ লক্ষের অধিক নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুর ভবিষ্যতের ভরসা করা যায়, কি ? তবে কি তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারকগণের দ্বারায় সমাজ রক্ষিত হইবে ? তাহা অসম্ভব—কারণ তাহাদের শতকরা৯৮ জন ব্যবসায়ী ধর্ম্মধ্বজী।

---

## ( ৬ ) মানসিক শক্তি।

ষষ্ঠ শক্তির নাম মানসিক শক্তি। আধ্যাত্মিকভাবে ইহার অনেক অর্থ হইতে পারে কিন্তু ইংরাজিতে যাহাকে Intellectual Culture বলে এখানে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। মাধাতার আমলে কোন্ সময়ে তোমাদের কালিদাস, ভবভূতি, লীলাবতী, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ছিল, তাহা এখন চিন্তা করিয়া অহঙ্কৃত হইও না ; কারণ এক সময়ে সকল দেশেই বসন্ত আসে এবং কোকিলও ডাকে,

সে কথাটা কিছু বড় কথা নহে; এখনকার বুদ্ধিগত উৎকর্ষণটা একবার ভাব কি? যাহা হইয়া গিয়াছে সেই টুকুই তোমার গৌরব, এখন আর বিন্দু বিসর্গও নাই, এখন সমগ্র হিন্দু জাতির দিকে চাহিয়া দেখ। কেবল বাঙ্গালা দেশের, ইংরাজি শিক্ষিত জনকতক বাবু কিম্বা বোম্বায়ের জনকতক মারাঠা ব্রাহ্মণ অথবা মান্দ্রাজের জনকতক "আইয়ার" বা "আয়েংগার" এর দিকে তাকাইলে চলিবে না, সমগ্র হিন্দু সমাজের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পড়িয়া দেখ, লোকশিক্ষা (Mass Education) হিন্দু রাজত্বে কতদূর প্রচলিত ছিল; হিন্দু রাজত্বের হিন্দুর সহিত কিম্বা মুসলমান রাজত্বের হিন্দুসাধারণের সহিত এখনকার হিন্দুসাধারণের তুলনা করিলে, হিন্দুর হৃদয়ক্ষেত্র যেন সাহারা মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা এখন শিক্ষিত বলিয়া গৌরব করেন তাঁহারা মৌলিকতা-বিহীন, তাঁহারা মুখ-ভারতী মাত্র, তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক উন্নতিতে হীন। তোমরা বলিতে পার "আমরা সম্বাদ পত্র ও মাসিক পত্র চালাইতেছি," কিন্তু তোমাদের সম্বাদ পত্রে তোমরাই রং ফলাইয়া তুলি ও কলম চালাইয়া, কত কি মনোমত আঁকিতেছ—কত কি লিখিতেছ; আমরা ত তোমাদের গোলকধাঁধার ছবি বুঝিও না আর তোমাদের সসেমিরের লেখার সারবত্তা দেখিতে পাই না। সারবত্তার মধ্যে এই টুকু যে, তোমরা মাসের মধ্যে পনের দিন মানহানির মোকদ্দমা লইয়া ফৌজদারী আদালতে ঘুরাঘুরি কর আর আপনা আপনি ঘরে ঘরে মারামারি, পিটাপিটি, গালাগালি করিয়া মর। যখন তোমাদের "বেণের মশলা বাঁধা কাগজের মত" বড় বড় থাউল খুঁড়িরূপ সমাচার পত্র ছিল না, যখন তোমাদের নব্যভারতের শোভা বর্দ্ধনকারী রেল, তার বা ডাকখানা ছিল না, তখন টাকায় এক মণের অধিক চাউল, বার সের সর্ষপ তৈল, আর আড়াই সের ঘি খাইয়াছি, এখন তোমাদের উন্নত ভারতে এক বেলাও পেট ভরিয়া

খাইতে পাই না ; আর তোমাদের মানসিক শক্তির বন্যা এতই প্রবল যে বোধ হয় ভারত যেন ডুবু ডুবু হইয়া পড়িল! প্রকৃত মানসিক শক্তি হইলে যে সমস্ত গুণ হয় তাহারও কিছুই লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। দারিদ্র্যদুঃখ সকল গুণের নাশক, সকল উন্নতির বিঘ্নকারক ; ইহা কি জান না? যাহার পেটে ভাত নাই, গাত্রাচ্ছাদনের বস্ত্র নাই, শীত গ্রীষ্মে বর্ষায় মাথা রাখিবার স্থান নাই, তাহার আবার মানসিক শক্তি কোথায়? তোমাদের কংগ্রেসকে তোমরা শিক্ষিত ভারতবাসীর "খুব মানসিক চিন্তা, শিক্ষা ও চর্চ্চার ফল" বলিয়া থাক, কিন্তু এই ঊনবিংশবর্ষ কালব্যাপী কংগ্রেস-বক্তৃতায়, নিত্য নিত্য সমাচার পত্রের প্রবন্ধে, বর্ষে বর্ষে বিলাতের আন্দোলনে, অগণ্য আবেদন পত্রে আর তিনশত চৌষট্টি দিনের লেক্‌চর বা স্পিচে যাহার বিন্দু বিসর্গও করিতে পার নাই, তখনকার মানসিক চিন্তাবলে বলীয়ান হিন্দুর বাঁশের লাঠিতে এক দিনেই তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

## (৭) ভাষা ও সাহিত্যশক্তি।

সপ্তম শক্তির নাম ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি। একা ভারতবর্ষে প্রায় ৩৬৩ প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পাদ্রী লং সাহেব বলিতেন, ভারতের একটা নদীর এধারে যে ভাষা ঐ নদীর ওধারে সে ভাষা নয়। কথাটা অসত্য নহে। একা বাঙ্গালাভাষারই ১৭ প্রকার মূর্ত্তি দেখান যাইতে পারে। হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহাই। তবে আশ্চর্য্য ও প্রশংসার সহিত একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, ভারতের সর্ব্বত্রই উর্দ্দু একরকমই ভাষা, উহার মোটেই বিকৃতি হয় নাই। কিন্তু যাহারা উর্দ্দু জানে না অথবা উর্দ্দু যাহাদের মাতৃভাষা নহে তাহাদের কাছে উর্দ্দু কেন, সকল ভাষাই বিকৃত। লাহোরের উর্দ্দু আর আমেদাবাদের উর্দ্দু

এক ; ঢাকার উর্দ্দু আর করাচি বন্দরের উর্দ্দু একই। পেশোয়ার, আটক প্রভৃতি প্রান্ত প্রদেশস্থ অনেক মুসলমানে পস্তু ভাষায় কথা কয় কিন্তু উর্দ্দু কহিলে তাহাতে পস্তু মিশায় না। ইরাণপ্রবাসী এবং আরব্যপ্রবাসীও সেই একই রূপের উর্দ্দু বলিয়া থাকে। ভারতের হিন্দুর ভাষায় একতা কোথায়? "যোজনান্তে ভাষান্তর"—সুতরাং ভাষায় শক্তিতে এক হওয়া ভারতবাসী হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ভারতে কখনও এক ভাষা থাকিবে না। সমগ্র ভারতের ভাষা ইংরাজি হওয়া অসম্ভব হইতেও অসম্ভবপর। ভারতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, তেমনই থাকিবে, কখনও এক ভাষা হইয়া উঠিবে না এবং উঠিতে পারে না। ভারতবর্ষ আমেরিকা নহে, সুতরাং আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র; ভারত কখনও আমেরিকা হইবে না ইহা নিশ্চয়। ভাষা এক না হইলে সাহিত্যও এক হইবে না সুতরাং এক দেশের ভাষা অন্ত দেশের লোকের কথোপকথনে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। ইংরাজি কখনও জনসাধারণের ভাষা হইবে না ইহা স্থির কথা। বাঙ্গালা ভাষার তুলনায় হিন্দি, গুজরাটা, মহারাষ্ট্রী, কানাড়ী, তামিল, মালয়লী প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্য অতীব দরিদ্র। ভারতবাসীর "ভাষা এবং সাহিত্যশক্তি" মোটেই নাই বলিলেই হয়, এখনও এদেশে রিডিং পবলিক হয় নাই সুতরাং ভাষা ও সাহিত্য শক্তির উপরে ভবিষ্যতের ভরসা কোথায়?

এতক্ষণ যাহা লিখিয়া আসিলাম তাহাতে নির্ভরসারই কথা, কিন্তু তথাপি এই নির্ভরসার মধ্যে ভরসা আছে, এই ঘোর নিরাশার মধ্যে মনোমোহিনী আশা আছে, এই অমানিশার আকাশে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের অভাব নাই। ভারতবাসী হিন্দুর এই মহারোগের প্রতীকারের এখনও ভরসা আছে।

কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্রমতে, হাকিমি প্রথায় কিম্বা আলোপ্যাথিক অনুসারে এ রোগের ঔষধ নাই। প্রতিকার আছে—হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নীতি এই যে, যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই

নিবৃত্তি Simili Similibus Curatur. হিন্দুর যাহাতে পতন তাহাতেই উত্থান। কবি বলেন—

যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হলে কে কোথায় মরে?

যে মাটিতে হিন্দু পড়িয়াছে সেই মাটি ধরিয়াই হিন্দুকে আবার উঠিতে হইবে। জগতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ, এই সুবিশাল পৃথিবীর মধ্যে কেবল দুইটি সভ্যজাতি ভিন্ন আর কোনও সভ্যজাতিই পরাধীন নহে—একটির নাম হিন্দু, অপরটির নাম য়িহুদী। কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর জাতি এবং এই দুইটি জাতি ভিন্ন পৃথিবীর সকল জাতিই এক্ষণে স্বাধীন; হিন্দু ভিন্ন সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই এক্ষণে স্বাধীনতা আছে। ইহাদের পতনের কারণ কি জান? মানব ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলে সকল গুণ, অধিকার, ক্ষমতা ও ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ব্যক্তি সম্বন্ধে এই নিয়ম, জাতি ও দেশ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। হিন্দু ও য়িহুদী যে দিন হইতে ধর্ম্ম-বিমুখ হইয়াছে সেই দিন হইতে ইহাদের লক্ষ্মী শ্রী চলিয়া গিয়াছেন। একদ ধর্ম্মবলেই হিন্দুও য়িহুদী এই দুই প্রাচীন জাতি সমগ্র বিশ্ব সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ধর্ম্মবলের হীনতাই ইহাদের অধঃপতনের মূল। ইহারা বহু শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া ধর্ম্মের যেরূপ অযথা অপমান করিয়াছে—ধর্ম্মের নামে যেরূপ পাপজনিত অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে—তাহারই কুফলস্বরূপ বহুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ইহারা নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করিতেছে, এখনও পুরাতন পাপের সম্যক প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। ভগবান বলিয়াছেন—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥

অর্থাৎ "আমাকে (ঈশ্বরকে) সতত যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্তির সহিত ভজনা করে, সে ব্যক্তি নিরুপায় হইলেও তাহার আমি এমন সুউপায় করিয়া দিই যাহাতে (পার্থিব অভাব ত সামান্য কথা!) মুক্তি পর্য্যন্ত

তাহার নিকটে অনায়াসলভ্য হইয়া উঠে।" শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ শ্লোক কি মধুর! এই শ্লোক কি অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশে পরিপূর্ণ! সঞ্জয় কহিতেছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

অর্থাৎ "হে রাজন্! যেখানে ভগবান আছেন (অর্থাৎ তাঁহার কৃপা আছে), সেখানে বিজয়, লক্ষ্মী শ্রী, বল, বিক্রম, বিভব প্রভৃতি বর্তমান থাকে, ইহা নিশ্চয়।" হিন্দুর বেদ হইতে রামায়ণ এবং রামায়ণ হইতে পুরাণাদি পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখ, একমাত্র ধর্ম্মবলের সহায়তায় হিন্দু সকল বিষয়েই জগতের শ্রেষ্ঠতম হইতে সমর্থ হইয়াছিল, এই জন্ত হিন্দু শাস্ত্রকার পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন "স্বল্পমপিধর্ম্মস্ত ত্রায়তে মহতোভয়াৎ" অর্থাৎ স্বল্পমাত্র ধর্ম্ম বলেও মহৎ ভয় (বিপদ) হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দিন হিন্দুর ধর্ম্ম হইতে পতন হইয়াছে, সেই দিন হিন্দুর স্বাধীনতা, শ্রী, জয়, নীতি, বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, প্রভৃতি সকলই লোপ পাইয়াছে। It is righteousness that exalteth a nation—সততাই (ধর্ম্মবলই) জাতীয় উন্নতির কারণ। মহামতি খৃষ্ট বলিয়াছেন—First seek the kingdom of heaven then everything shall be added unto you অর্থাৎ প্রথমে আধ্যাত্মিক রাজ্যের পথিক হও তাহা হইলে সকল (পার্থিব সুখ—পার্থিব রাজ্য) তোমার করগত হইবে। বস্তুতঃ, ঋতুরাজ বসন্ত সমাগমে যখন সুন্দর সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে সরোজিনী প্রস্ফুটিতা হয়, তখন মধুপান জন্ত ভৃঙ্গবৃন্দকে কেহ কি ডাকিয়া আনে? তাহারা যেমন আপনা হইতেই সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকৃপা হইলে—ধর্ম্ম পথে স্থির থাকিলে—সকল ক্ষমতা, সকল গুণ, সকল অধিকার আপনা হইতেই জন্মে। আইস, আমরা আবার ধর্ম্মবলে বলীয়ান হই। তখনকার ব্রাহ্মণেরা কেবল ধর্ম্মবলেই সমস্ত মহাবীর

ক্ষত্রিয় রাজন্তবর্গের পরিচালক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাভারতে হবির্বিধ নামে এক ঋষি বলিয়াছিলেন, "এই মহাপ্রকাণ্ড সমর ক্ষেত্রে মহারথীগণ অসংখ্য শাণিত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাহা করিতে সমর্থ হইতেছে না, ধর্ম্মবলীগণ তাহা এক কটাক্ষে (বিনা অস্ত্রে) সমাধা করিয়া দিতে পারেন।" যোগীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উদ্বেলিত-হৃদয় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "হে পাণ্ডববীর! তুমি নিমিত্তমাত্র স্বরূপ, আমি (কটাক্ষে) পূর্ব্ব হইতেই (ঐশী শক্তিতে) ঐ সকল অসংখ্য বীরকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি।" তাহাতেই বলিতেছি, ধর্ম্মবলই আমাদের ভরসা—সেই ধর্ম্মবলই আবার অধঃপতিত হিন্দুর মহা আশা। গ্রীক, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি আমাদিগকে তীর, তোপ, তরবারী প্রভৃতি দ্বারা জয় করিয়াছে; আইস, আমরা সকল অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ধর্ম্মবল—ব্রহ্মশক্তি—দ্বারা কটাক্ষে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া আবার সসাগরা পৃথিবীর নেতা হই। ফ্রান্সের মহাপণ্ডিত জাকোলিয়ৎ বলিয়াছেন, "ভারতের হিন্দুর রাজনৈতিক শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে কিন্তু তাহাদের একটা শক্তি এখনও খুব প্রবলা; ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি বা মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় তাহাদের ধর্ম্মবল এখন প্রচ্ছন্ন; যদি এই শক্তি আবার জাগিয়া উঠে ভারতের হিন্দুজাতি সমগ্র জগতের আবার একাধীশ্বর হইবে, ইহা নিশ্চয়।" ঈশ্বর করুন, জাকোলিয়তের লেখনীর উপরে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হউক। "আনন্দ-মঠ" নামক রাজনৈতিক নবন্যাসে অমর বঙ্কিম জননী ভারতভূমির তিনটি মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন—মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন, মা যাহা হইবেন। হিন্দুর ভাবীদশার মূর্ত্তি এখনও আশাময়ী।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# লুপ্ত হিন্দুরাজ্য।

প্রাচীন ভূগোল, কাব্যশাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং রঘুরাজার ন্যায় (দিগন্তব্যাপী রাজ্যের) শাসনকর্ত্তাদিগের দিগ্বিজয়াদির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান যুগে আমরা যে প্রশস্ত ও প্রখ্যাত মহাদেশকে ভারতবর্ষ বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি, এক সময় তাহার বহির্দেশে বহুসংখ্যক হিন্দুরাজ্য অবস্থিত ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম বা মুসলমানধর্ম্মের অণুমাত্র প্রভাব এই সকল দেশে অনুভূত হয় নাই। আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান, গজ্‌নি, বোখারা, পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহ তখন হিন্দুর রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং সমুদ্র পারবর্ত্তী সুদূর দেশসমূহেও তখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজার অধীনে অসংখ্য হিন্দুপ্রজার বসতি ছিল। কাবুল প্রান্তে আফ্রিদি ও কাফির নামক প্রাচীন হিন্দুজাতি বাস করিত, অতি অল্পদিন হইল আফানিস্থানের মুসলমান আমিরের আক্রমণে এবং ভারতীয় খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় প্রান্তবাসী সমগ্র প্রাচীন হিন্দুজাতি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপে কতশত প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ও প্রাচীন হিন্দুজাতি যে গুপ্ত বা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি এইরূপ দুইটি বিখ্যাত হিন্দুরাজ্য দর্শন করিয়াছিলাম, এই দুইটি স্থান এক্ষণে আর হিন্দুরাজার অধীন নহে এবং ইহাদের অধিবাসীপুঞ্জকে ও আর হিন্দু বলা যায় না। ইহাদের একটীর নাম কম্বোজ বা কম্বোজ; অপরটীর নাম অণিমা। বর্ত্তমানকালের ইংরাজী ভূগোলের নব্য পাঠক-পুঞ্জের নিকটে প্রথমটি কাম্বোডিয়া এবং দ্বিতীয়টি আনাম নামে পরিচিত।

আমরা শ্যাম দেশ হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অষ্ট্রোহঙ্গেরিয়ন লয়েড্

কোম্পানীর "কেজিভা" নামক বাষ্পীয় তরণী যোগে কম্বোজ বা কাম্বোডিয়া দেশে গমন করিয়াছিলাম। সমুদয় নিজামরাজ্য যত বড়, কাম্বোজের আকার তদপেক্ষা ন্যূনতর নহে। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া উত্তরদিকে নৌকাযোগে মিকং নদী পার হইয়া আমরা কম্বোজে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সর্ব্বত্র তামুক, চাউল, তুলা, লবণমিশ্রিত শুষ্কমৎস্য এবং কর্পূরের অসংখ্য দোকান দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, এদেশের বুঝি অধিকাংশলোকই ধনবান এবং সমৃদ্ধশালী, কিন্তু পরিণামে জানিতে পারিলাম চীন, আনাম, মালয় ও ইউরোপের লোকেরা কম্বোজের ধনে ধনী হইয়াছে কিন্তু অসভ্য কম্বোজ যেমন অন্ধকারে ছিল, এখনও তেমনি নিবিড় অন্ধকারে পদস্খলিত হইতেছে। অধিবাসীদিগের সুদীর্ঘ ও সবল শরীর এবং অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগপটুতা অবলোকন করিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, ইহারা বুঝি খুব সাহসী ও উন্নত, কিন্তু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা শেষে জানিয়াছি ইহাদের শারীরিক সবলতা ইহাদের স্বাধীনতা বা সামাজিক কিম্বা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিতে আদৌ সমর্থ হয় না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলের পরাক্রমবাহু নামক নরপতির সহিত কম্বোজবাসীদিগের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। বৌদ্ধেরা কম্বোজকে হস্তগত করিয়া পালি ভাষা মতে ইহাকে কম্পুজ নামে আখ্যাত করে। এই যুদ্ধে কম্বোজের হিন্দুরাজা বৌদ্ধশত্রুহস্তে নিহত হয়েন। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে আনামের রাজা এবং অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে শ্যাম নরপতি কাম্বোডিয়ার অনেক অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট সমগ্র কাম্বোডিয়াকে ইউরোপীয় শাসনভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। একণে ইহা ফরাসীর অধিকারভুক্ত রাজ্যবিশেষ।

কম্বোজ দেশে একপ্রকার মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া তীব্র রৌদ্রে কিছুদিন শুষ্ক করিয়া লইলে, মানুষের আহারের যোগ্য হইতে পারে। ঐ শুষ্ক মাটি জিহ্বায় রাখিলে শর্করার

ন্যায় সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়। কম্বোজের লোকেরা এই তরল মাটিকে ছোট ছোট বটিকাকারে পরিণত করিয়া,শুকাইয়া লইয়া থাকে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ইহা খায় এবং, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ইহা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের ভোজনপাত্রে দেওয়া হয়। এই কর্দ্দমবর্ত্তুলকে মাটির লাড্ডু বলা যাইতে পারে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই মাটি খুব পছন্দ করেন। এখানকার সিংহ, শূকর ও বানরেরা, এই সুস্বাদু মাটি প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে। গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায় এবং ছোট ছোট গাছের গোড়ায় এই মাটি রাখিয়া দিলে তিন দিবসের মধ্যে গাছগুলি প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডময়ূখদগ্ধ তরুশাখার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়। মালয়, জাবা, বর্ণিও প্রভৃতি দেশেও অনেকে মাটি খায়। আমাদের বাঙ্গলা দেশে অনেক গর্ভবতী স্ত্রীলোককে "খোলা" এবং পুরাতন দেওয়ালের মাটি খাইতে দেখিয়াছি। অনেকে বলেন, মাটির বলকারিতা গুণ আছে কিন্তু কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, 'মনুষ্যের উদরাভ্যন্তরে বহুপরিমাণে মাটি প্রবেশ করিলে নানাবিধ উৎকট রোগের উদ্ভব হয় এবং পরিণামে সেই রোগী পাগল হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।' আমি এক কাম্বোডিয়ানের গৃহে কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোককে তপ্ত বটির উপরে মাখনের ন্যায় তরল মাটি মাখাইয়া খাইতে দেখিয়াছি।

আমরা কম্বোজের ন্যূনাধিক চৌষট্টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি এবং হিন্দুরাজ্যের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলাম। দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, প্রাচীরবেষ্টিত পুরী প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু হিন্দুদেবদেবীর চিত্রাঙ্কিত উপাসনালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। প্রাচীন হিন্দু কম্বোজের রাজধানী নাম "অঙ্কুর। এই অঙ্কুর নগর তালিসপ্ নামক হ্রদের তটদেশ হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও এ স্থানে পাঁচটি প্রকাণ্ড দ্বার, কয়েকটি কূপ ও সরোবর, তিনটি বিজয়স্তম্ভ এবং একটি কৃত্রিম হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্নাবশিষ্ট অঙ্কুর

নগরের পার্শ্বদেশে যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহাদের আকৃতি প্রায় বাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায়; বাওরিং সাহেব অনুমান করেন, "ইহাদের আদিপুরুষ বঙ্গদেশস্থ গঙ্গের* প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।"

"Their forcfathers came from the Ganges valley, and prabably they were the people of Bengal * * The cut of the face is like that of a Bengali. * * At one time Cambodia was a powerful Hindoo Kingdom and the Bengalee Merchants and traders used to frequent the island. * * The descendants of the Bengalee 'Baniks' (traders and navigators) are found in Ceylon, Siam, Anam and Borneo." Bowring's Siam, Vol. II

সপ্তক্রোশ দূরে ইন্দ্রপ্রস্থপুরীর ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়। ইহার পরিধি প্রায় ৫ ক্রোশ। রাজধানী হইতে ৩ক্রোশ দক্ষিণে একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির অদ্যাপ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় অবস্থিত। একটী মনোমোহন পর্ব্বতের যবল গাত্র ভেদ করিয়া এই সুন্দর মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার স্তম্ভের সংখ্যা ১৫৩২ ॥ বাওরিং সাহেব লিখিয়াছেন, "It is one of the most extraodinary architectural relics in the world." যে প্রাচীর দ্বারা এই মন্দির পরিবেষ্টিত তাহার পরিধি দেড় ক্রোশের কম* নহে। এখানকার লোকেরা বলে, "এই মন্দির মানুষের হাতে তৈয়ার হয় নাই, ইহা দেবতাদিগের যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাওরিং সাহেব লিখিয়াছেন, "It is an overwhelming spertacle. * * The joinings are scarcely perceptible——no sign of mortar, no mark of chisel, the surface is polished as marble. বাস্তবিক এই মন্দিরের গাত্রে চূর্ণ, সুর্কি, কাষ্ঠ, ইষ্টক বা লৌহাদি ধাতুর চিহ্নও দেখা যায় না, কোথাও মিস্ত্রির যন্ত্র ব্যবহারের চিহ্ন মাত্রও নাই, অথচ এই মন্দির যেন মর্ম্মর (Marble) নির্ম্মিত মন্দিরের ন্যায় মসৃণ ও মনোহর বলিয়া বোধ হয়। বহুশত বৎসর ব্যাপিয়া

এই সুবৃহৎ দেবালয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অথচ ইহা কি উপাদানে নির্ম্মিত এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রবেশদ্বারের উপরে কতকগুলি শ্লোক খোদিত আছে, শ্লোকের অক্ষর কিয়দংশ বাঙ্গালা, কিয়দংশ, দেবনাগর ও কিয়দংশ পালী অক্ষরের সমতুল্য। যাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা অক্ষর আধুনিক, এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারের খোদিত শ্লোকের অক্ষর দেখিলে তাঁহাদের ভ্রম দূর হইতে পারে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষর বর্ত্তমান ছিল বলিয়া কেহ কেহ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহা সম্পূর্ণ সত্য।*

অনিমা বা আনাম রাজ্য এক্ষণে ফরাসী রাজার শাসনভুক্ত। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর পরিচ্ছদ রেশমে তৈয়ার হয়, তুলার (সূত্রের) তৈয়ারী বস্ত্র এখানে অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেশে রেশম খুব সস্তা; ঘরে ঘরে গুটি পোকার চাষ আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শোক প্রকাশের সময় আনামের লোকেরা শুভ্র বসন পরিধান করে; পীত বা হরিদ্রা বর্ণের পরিচ্ছদ রাজকীয় পদের অথবা উৎসবের পরিচায়ক। পান, চা ও চুরুটের এখানে প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অধিক বয়সে বিবাহ করে। এইজন্ত এখানকার অধিবাসীরা বলবান, বুদ্ধিমান ও সাহসী। স্ত্রীলোকদিগের মুখের চেহারা ঠিক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মত। এখানকার রমণীগণ অত্যন্ত সাহসিক এবং স্বাধীনতাপ্রিয়; তীর বা তরবারি চালাইতে না পারে এমন স্ত্রীলোক এদেশে নাই। আবশ্যক হইলে একদিনে

* বহুবর্ষ পূর্ব্বে উজ্জয়িনীনগরীতে অবস্থানকালে আমি তথাকার একজন পোদ্দারের দোকানে একটি পুরাতন রৌপ্যমুদ্রা খরিদ করিয়াছিলাম। ঐ মুদ্রা মাটির ভিতর হইতে পাওয়া গিয়াছিল। উহাতে আমি বাঙ্গালা অক্ষর এবং বাঙ্গালী রাজার নাম দেখিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে বোম্বাই নগরে ঐ মুদ্রাটি একজন দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। —লেখক।

সেক্রলক্ষ আনামী সেনার সমাবেশ হইতে পারে; স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া যুদ্ধ করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সৈনিক বিভাগে এখনও ২৭৮১ জন স্ত্রীলোক চাকুরি করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই সিপাহি নহে, অন্যান্য কর্ম্মও সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তলোয়ার চালাইতে কুণ্ঠিত হয় না।

আনামীরা মৃতদেহকে দাহ করে না, ভূগর্ভে প্রোথিত করে। মৃত্যু হইবার তিনমাস পর পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে মৃতদেহকে কাষ্ঠের সিন্দুক মধ্যে লবণ সহ রক্ষা করা হয়; তিনমাস পরে গৃহ হইতে ঐ সিন্দুক সমাধিস্থানে লইয়া গিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। আনামী লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, মৃতদেহ তিনমাসকাল পর্য্যন্ত গৃহে আবদ্ধ থাকিলে, তাহার আত্মা স্বর্গবাসের অধিকারী হয়। খাস আনামে হিন্দু বা বৌদ্ধের সংখ্যা এখন খুব কম, এখন এদেশে লক্ষ লক্ষ রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান বাস করে। যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের উপাসনা-প্রণালী তেলুগু প্রদেশের "লিঙ্গায়ৎ শৈব" দিগের অনুরূপ। হিন্দু ও বৌদ্ধের সংখ্যা কম হইলেও তাহারা খ্রীষ্টান অপেক্ষা অধিকতর প্রভুত্ব ও সমৃদ্ধিশালী। এই সকল বৌদ্ধ ও হিন্দু, খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের প্রবল বৈরী। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পাদ্রীকে ধৃত করিয়া ইহারা নদীর জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। যে সকল লোক পাদ্রীদিগকে প্রশ্রয় দেয়, এখনও ইহারা সুবিধা পাইলে তাহাদিগকে নিহত করে। ইং ১৮৫১ অব্দে এবম্প্রকারের বহুসংখ্যক খ্রীষ্ট-প্রশ্রয়কারী ব্যক্তি কাম্বোডিয়ানদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতি অল্পকাল হইল এদেশে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং পাদ্রীরা এখন নিরাপদে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে আনামে প্রায় ৬২ জন পাদ্রী বাস করেন।

অনিমা বা আনাম রাজ্যের একটা অংশের নাম বরোঁ পরোঁ (Boront Poront)। তালিদপ্ হইতে নৌকাযোগে আমরা তিন দিনে

রাজধানী হইতে প্রায় ২৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী জলপথ অতিক্রম করিয়াছিলাম। ফরাসীরা এই স্থানের নাম রাখিয়াছেন—বরেঁা পরেঁা, কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম "ব্রহ্মপুর" (Brahmapore)। এখানে আজিও বহুসংখ্যক হিন্দুসন্তানের বসতি আছে। ইহাদের অনেকে ঠিক হিন্দুর মত নহে কিন্তু ইহারা হিন্দুবংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা "বদ্য" নামে পরিচিত, ইহাদের অধিকাংশ লোক চিকিৎসাব্যবসায়ী, কাহারও কাহারও গলায় যজ্ঞোপবীত দেখিয়াছি। বোধ হয় বদ্য শব্দ বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশ। এই ক্ষুদ্র বরেঁা পরেঁা (ব্রহ্মপুর) এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইহা শ্যাম, আনাম, জাপান, চীন অথবা ফ্রান্সের অধীন নহে। অদূরবর্ত্তী কপা পরেঁা গ্রাম, কমলপুর শব্দের অপভ্রংশ। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী এখনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। ইহাদের ভাষা, বেশভূষা, আচারের প্রণালী, প্রকৃতি এবং মুখের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীর মত। ইহারা রামোপাসক, অনেকের গৃহে পালি ও সংস্কৃত রামায়ণ দেখিয়াছি। কতকগুলি ব্রাহ্মণের নাম অবিকল বাঙ্গালী হিন্দুর নামের মত, তদ্যথা—বিহঙ্গম চনদ্ (চন্দ্র), মনোরঞ্জন, পদরজ, শিখিধর, কৈলাসেশ্বর, নারায়ণ কুণ্ডার (কুমার), হৃৎপতি, বিজ্ঞাননাথ, দীপালোক, নীরদ, অঙ্করাজ, গোলকচন্দ্র, কানাই, সতীশা, ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের নাম এইরূপ—সুন্দরী, মোহিনী, ভবরাণী, ভবানী, গিরিরাণী, শিখরী, কমলা, তটনী (তটিনী), কাবেরী কাঞ্চনী, ইত্যাদি। বাঙ্গালীর জিহ্বাশক্তির সহিত অর্থাৎ বাঙ্গালীর উচ্চারণের দোষগুণের সহিত তুলনা করিবার জন্য ইহাদিগকে অনেক বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ করিতে দিয়া দেখিয়াছি, ইহারা ঠিক বাঙ্গালীর উচ্চারণের দোষ ও গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী। ব্রাহ্মণেরা "শিরমাই" বলিয়া পরিচয় দেয়, এই শিরমাই শব্দ শর্ম্মা শব্দের নিশ্চয়ই অপভ্রংশ। একজন ব্রাহ্মণ বলিল আমরা "দেব।" ষেডাঁরেও যেমন নিকলসন্ আমাকে বলিয়াছিলেন,

"এখানকার ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি দিউতা ;" এই দিউতা শব্দ দেবতা শব্দের অপভ্রংশ।

আনামের এই অংশে ইউরোপের খৃষ্টীয় প্রচারকেরা প্রথমে পরিব্রাজক বেশে আসিয়া ক্রমে বাণিজ্য, তাহার পরে বাইবেল এবং তদনন্তর বেওনেটের (Bayonet) প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মপুরের অধিবাসীরা, লর্ড সালিসবরির ন্যায় বুঝিতে পারিয়াছিল যে, Wherever a missionary goes, a gun-boat has to follow him. এই জন্য বুররজাতি অপেক্ষা অধিকতর সাহসী, অধিকতর সবল এবং অধিকতর অধ্যবসায়ী ও স্বাধীন প্রকৃতিসম্পন্ন ব্রহ্মপুরবাসী-দিগের তীব্র তীর ও তরবারীর ভয়ে ইউরোপীয় সেনা হিম্‌শিম্ খাইয়াগিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে জল, পর্ব্বত ও গহন অরণ্য, সুতরাং এস্থলে সুসভ্য সম্রাটের সামর্থে কুলায় না। এই গৌরবান্বিত প্রাচীন হিন্দুরাজ্য (ব্রহ্মপুর ও কমলপুর) এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন, এখনও স্বদেশ-গৌরবে মহিমান্বিত। বাউরীং সাহেব লিখিয়াছেন—

"These jungli people would not give up the in dependence of their island even for half the world. Their mind is stubborn and their body is stalwart * * It was once a province of a great Hindoo kingdom and Brahmanism was anciently the religion of this independent province Many ruins of temples dedicated to Hindoo Gods still exist. The first state religion which the whole of Cambodia and Anam imposed upon their tributary states was Brahmanism. * * Traces of Brahmanism appear in nearly all the national festivals."

বাস্তবিক, বিবাহ, শস্তচ্ছেদন, গৃহপ্রবেশ, কর্ণবেধ, শিরমুণ্ডন প্রভৃতি কার্য্যে এখনও যাহারা উহাদের পৌরোহিত্য করে তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দেয়। বাউরীং সাহেবও লিখিয়াছেন—

"The chief officiators are Brahmins, not Buddhist monks They have also adopted the Hindoo belief that this is the Kali Yug."

ব্রহ্মপুর স্থানে আমরা বহুসংখ্যক শিবমন্দির দেখিয়াছি। শিবের

"লিঙ্গমূর্ত্তি" (Phallic form) এবং "রত্নমূর্ত্তি" এই উভয় প্রকারের বিগ্রহ বহুল পরিমাণে অবস্থিত আছে। আমি একটি ছোট শিব আনিয়া কলিকাতার মিউজিয়মে দিয়াছিলাম, এখনও সেখানে উহা রক্ষিত আছে। এখানকার বিবাহপ্রথা বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রায়ই মিলে। ইহাদের আদিপুরুষ যে বাঙ্গালী ছিলেন, আমার তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আনামে কেবল হিন্দু আছে, তাহা নহে তথায় বাঙ্গালী হিন্দুর বংশধর সমগ্র দেশকে আলো করিয়া রহিয়াছে। তথাকার হিন্দুরা বাঙ্গালী বংশধর, এ কথা ভাবিলে আমরা আমাদের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া স্বজাতিপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইতে পারি। কিন্তু এই গৌরবাত্মক আনন্দের মধ্যে, অকস্মাৎ একটা নিরানন্দের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। বাঙ্গালী সিংহল জয় করিয়াছে, পণ্ডিচারী স্থাপন করিয়াছে, বলী দ্বীপে বসতি করিয়াছে, কম্বোজ ও আনামে (বিশেষতঃ ব্রহ্মপুর ও কমলপুরে) রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে এবং কাঙ্গালী বাঙ্গালীর পূর্ব্ববংশীয় চাঁদ সওদাগর শ্যামে বাণিজ্য করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? প্রাচীন পরাক্রমী বাঙ্গালীজাতির অর্দ্ধসভ্য বংশধরগণ জঙ্গলপূর্ণ সুদূর ব্রহ্মপুরে বাস করিয়া স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতেছে কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা, এবং ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে আলোকিত হইয়া, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজার অধীনে বাস করিয়াও, একটা ক্ষুদ্র ফিরিঙ্গি ডলন্টিয়ারের সমতুল্য অধিকার প্রাপ্ত হই না!!. আমাদের জাতীয় মহাকবি—অন্ধ কবি শ্রীমৎ হেমচন্দ্র——স্বর্গের সুবর্ণ সিংহাসনে সম্প্রতি সমাবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু এখনও শুনিতে পাইতেছি,——

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

# শারদীয় পূজা।

"পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।"

ঋতুরাজ কুসুমাকর (বসন্ত) সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম ঋতু বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু শরতের শোভা বসন্তাপেক্ষা অল্পতর বলিয়া বোধ হয় না। শরতের সুবিমল শশধর, স্বচ্ছসলিলপরিপূর্ণ সুন্দর সরোবরের শুভ্র সরোজ, হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের অতীব মনোমোহিনী শোভা, কিশলয়গুচ্ছমধ্যস্থিত বিবিধ বিচিত্র বিহঙ্গের সুমধুর কাকলী লহরী, নানা জাতীয় অপূর্ব্ব প্রসূন পুঞ্জের পরিস্ফুটন, প্রভৃতিতে মনোহর শরৎ বাস্তবিকই বসন্তের সমতুল্য। শরৎসমাগমে প্রকৃতি সুন্দরী মধুময়ী হাস্যময়ী ও স্ফূর্তিময়ী হইয়া জগতের জীবকুলকে আমোদিত করেন। মহাকবি কালিদাস ভাবে বিভোর হইয়া শরতের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতেন, তিনি বলিয়াছেন—

> স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং
> মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
> শ্রিয়মতিশয়রূপং ব্যোমতোয়া শয়নং
> বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্।
> শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা
> বিগতজলবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
> বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী
> বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোমতারা বিচিত্রম্॥

নবীন জলধরের নীল-কৃষ্ণাভ ক্রোড়ে শরতের শুভ্র বিহঙ্গদিগের ক্রীড়া অতীব নয়নানন্দদায়িনী। শরতের যাহা কিছু দেখ তাহাই যেন হাস্যময়, আনন্দময় ও প্রেমময় বলিয়া বোধ হয়। শরতের সকল দিবসই নবোৎসাহে অনুপ্রাণিত এবং নব নব সৌন্দর্য্যে প্রতিভাসিত।

এই মনোহর শরতের শুক্লপক্ষে বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজে মহামায়ার মহাশক্তির সাকারোপাসনা হইয়া থাকে এই উপাসনার নাম দুর্গাপূজা শরৎ ঋতুতে ইহার উদ্বোধন হয় বলিয়া ইহা শারদীয় পূজা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। অতি সুন্দর ঋতুতে অতি সুন্দর সময়ে এই মহাসুন্দর পূজার অনুষ্ঠান হয়। সেই অনাদি অনবদ্য সুন্দর" এই সুন্দর শরতে মহাসুন্দরী বেশে বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করেন। ভক্তাধিক ভক্ত প্রাণ মন খুলিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে পত্র পুষ্প ফল মূল যাহা কিছু সাধ্য তাহা শাস্ত্রবিধিমত অর্পণ করেন। জগন্মাতা জগদম্বার কিছু অভাব না থাকিলেও কেবল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ জন্য—কেবল পুত্রবৎসলতার পরিচয় দিবার জন্য—ভক্তবৎসলা মাতা ভক্ত প্রদত্ত সভক্তি নিবেদন অতীব আনন্দ সহকারে গ্রহণ করত আনন্দময়ীরূপে দর্শন দেন।

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

শরতের এই মহাপূজা কেবল সৌন্দর্য্য ও ভক্তির পরিচয় নহে ইহা সামাজিক রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এই মহাপূজার অনুষ্ঠান হয় না যে দেশে হয় স দেশ অতি পবিত্র অতি ধার্ম্মিক অতি উ সাহী এবং অতীব আধ্যাত্মিক কিন্তু কেবল মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে পূজা বা উদ্দেশ্য নাই এই মহাপূজার অর্থ কয়জন বুঝিয়াছে বা বুঝিতে পারে? কেবল বুঝিলেই যথেষ্ট নহে, কার্য্যকরী শক্তির অভাবে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

একবার ঐ দুর্গামূর্ত্তিরদিকে দৃষ্টিপাত কর, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া ঐ ত্রিতাপহারিণী মহিয়সী মূর্ত্তির দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখ। Divinity and Humanity is perfected in the group ঐ মূর্ত্তি সমষ্টিতে দেবত্ব ও অমরত্ব—মনুষ্যত্ব ও ব্রহ্মত্ব—একাধারে সম্মিলিত হইয়াছে। ইহকাল ও পরকাল এই উভয় কাল ও উভয় লোককে

একত্রে মিলাইয়া দিয়া সন্নিস্থলে ভক্তমনবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী জগন্মাতা জগদম্বা স্বয়ং দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। এই মূর্ত্তি কি সুন্দর! কি মনোহর! যাহারা সংসারে সুখী হইতে অভিলাষ করে, যাহারা ইহজীবনে মানব জন্মের চরিতার্থতা সম্পাদন করিবা পরজন্মে অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করিতে বাসনা করে, যাহারা মায়াময় কঠোর সংসারকে আনন্দময় দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে এই দুর্গামূর্ত্তির সমষ্টি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক ও সদুপদেশক। মাতা দুর্গা মহাশক্তির মূর্ত্তি—ইহা শক্তিরূপিণী। সংসারে বাস করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে শক্তির আবশ্যক হয় শক্তি বিনা অগ্নি জ্বলে না বায়ু বহে না জল চলে না পৃথিবী তিষ্ঠিতে পারে না। এই সংসারে কোন কর্ম্মে শক্তির প্রয়োজন নাই? শক্তিহীন মানব আনন্দ উৎসাহ ভয় শ্রী উন্নতি জ্ঞান ধন মান সকল বিষয়েই অসার। এই সংসারে বাস করিতে গেলে সভ্য মানবসমাজে 'মানুষ' বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে শক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। দেশরক্ষায় সমাজরক্ষায় জাতিরক্ষায়, নিজের ও পরের উন্নতিসাধনে এবং জগতের কল্যাণ সকলে শক্তিরই সর্ব্বত্র প্রধানতা এই জন্য মাতা স্বয়ং শক্তিরূপিণী। আইস আমরা এই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া মহাবলী হই, মহাবলে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয় আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হই। কিন্তু কেবল অন্ধশক্তিই কি সংসারের সুখের কারণ? জ্ঞানবিহীন শক্তি কেবল অসৎ কার্য্যের উদ্দীপক ও সহায়ক মাত্র শক্তির সঙ্গে জ্ঞানের—বিদ্যার—মানসিক উন্নতির পরাকাষ্ঠার প্রয়োজন, এই জন্য শক্তিরূপিণী মহামাতার পার্শ্বে জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী বিদ্যমান। কিন্তু কেবল শক্তি ও জ্ঞানে সংসার চলে না উদরের সংস্থান চাই নতুবা জগৎ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়। উদরের পরিতৃপ্তির জন্য ধনের (অর্থের) প্রয়োজন, এই জন্য দুর্গার আর এক পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী বর্ত্তমান। সংসারে বীরত্ব,স্বাধীনমতিত্ব এবং সৌন্দর্য্যে অনেকে বশীভূত হয়, শক্তি, জ্ঞান ও ধনেরসহিত এগুলির প্রয়োজন,এই জন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন (কার্ত্তিক)উপবিষ্ট

হইয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন। এ সকল গুণ থাকিলেও উৎসাহ ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ভিন্ন জগতে কেহ কি কখনও "মানুষ" বলিয়া পরিগণিত হইতে সমর্থ হইয়াছে? যেখানে উৎসাহ, সেইখানেই পরিশ্রমপরায়ণতা, সেই খানেই জয় এবং সিদ্ধি। ঐ দেখ সিদ্ধিদাতা গণেশ ইহার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত। কার্ত্তিকের বাহনের নাম ময়ূর; ময়ূর দেখিতে অতীব সুশ্রী, কিন্তু ইহার স্বর অতীব কর্কশ। এই সংসারে অনেকে সুন্দর বটেন, কিন্তু কথায় বড়ই কর্কশ; সুতরাং প্রিয়ভাষী হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সদা "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।" ইহাই শাস্ত্রোক্তি। গণপতির বাহনের নাম মূষিক, গণপতি উৎসাহী, পরিশ্রমপরায়ণ এবং সিদ্ধিশ্রীসম্পন্ন বটেন, কিন্তু ইঁহার বাহন (মূষিক) অত্যন্ত খল।

"উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার॥
কাট কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়।
সুচারু সোণার দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়॥
বিনা দোষে নষ্ট করে দ্রব্য শত শত।
খল নর হয় ঠিক ইঁদুরের মত॥"

দেখিও তাই,জয় লাভে উন্মত্ত হইয়া, অকারণে যেন কাহারও অনিষ্ট করিতে না হয়। যেখানে সিদ্ধি সেইখানে অহঙ্কার, যেখানে অহঙ্কার, সেইখানে তমঃ গুণ, যেখানে তমঃ সেই খানে পরের অনিষ্টেচ্ছা এবং খলতা স্বাভাবিক।

তাহার পরে দেখ, জগন্মাতা দুর্গা শক্তিরূপিণী হইয়া সাধুর অনিষ্ট করেন না, তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য শক্তিরূপ ধারণ করেন। শক্তির সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক, অসদ্ব্যবহারে শক্তির কুফল জন্মে। দেশবৈরী, আর্য্যবৈরী, ধর্ম্মবৈরী মহিষাসুরের মর্দ্দন জন্য তিনি সিংহপৃষ্ঠে শক্তিরূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা হইয়াছেন। এই মূর্ত্তি দশ-

ভূজার মূর্ত্তি—কল্পনার অতীত, অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির আরাধনায় দুর্ব্বল দেহে বলের সঞ্চার হয়, নিরাশায় আশার আনন্দময় আলোক উপস্থিত হয়, ভীতের অভয় জন্মে, এবং পাপের রাজ্য পলায়ন করিয়া ধর্ম্মের রাজ্যকে স্থান দেয়। বুঝিলাম, এই সংসারে আদর্শ মানবের এই কয়েকটি মুখ্য দ্রব্যের প্রয়োজন—শক্তি, জ্ঞান, ধন, সরলস্বভাব, মিষ্টমুখ, উৎসাহ, পরিশ্রমপরায়ণতা এবং জয়। দুর্গামূর্ত্তিসমষ্টি এই গুণগুলির জীবন্ত মূর্ত্তি। সংসারে যে সৌভাগ্যবান মহাপুরুষের এই গুণগুলি আছে, সংসার তাহার পক্ষে সুখকর স্বর্গধাম না হইবে কেন ?

নবমী তিথিতে মায়ের শেষ পূজা হয়, দশমী তিথির জন্য অতি সামান্য মাত্র বাকী থাকে। এই মহাপবিত্র দশমী তিথি বঙ্গের ঘরে ঘরে "বিজয়া দশমী" নামে প্রখ্যাতা এবং ভারতের অন্যান্য অংশে দশহরা নামে প্রসিদ্ধ। এই দিনে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের বহুকালের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ হইয়াছিল, এই দিনে তিনি "দানবাক্রান্ত সন্তানদিগকে" বিদেশী রাক্ষসহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই দিনে পতিতপাবন রঘুকুলমণি রামচন্দ্র দেবদ্বিজের উদ্ধার, ধর্ম্মের রক্ষা, গঙ্গা গাভী ও গায়ত্রীর মাহাত্ম্য বর্দ্ধন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নারায়ণীরূপিণী সীতা সতীর উদ্ধার, রাবণ বধ, এবং অধর্ম্মের পরাজয় দ্বারা জগৎকে শান্তিময় করিয়াছিলেন। এই পবিত্র দিনে তিনি হনুমানাদি ভক্ত, মিত্র, সেবক প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া মহানন্দে মহোৎসব করিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবের নাম "বিজয়া দশমী"। এই দিন কি পবিত্র! কি মহান্! কি সুখকর!! এই দিনের মহামহোৎসব দর্শন করিয়া কবিবর ভর্ত্তৃহরির ন্যায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

> 'প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।
> প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ॥
> বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
> প্রারব্ধমুত্তমগুণাঃ ন পরিত্যজন্তি॥"

এই পবিত্র মহামহোৎসব দর্শন করিয়া ঋগ্বেদের ব্রহ্মর্ষিদিগের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি॥" ( ঋগ্বেদ )

অর্থাৎ "তোমরা সকলে একসঙ্গে মিলিত হও, একসঙ্গে কথা বল, একসঙ্গে সকলের মন সকলে জানো। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ এক মত হও। তোমাদের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।" ইহাই কি প্রাচীন কালের কংগ্রেস-লেক্‌চার নহে? বিজয়া দশমী আমাদের একতা শিক্ষার মহোৎসব। বিজয়া দশমীর বীরেরা শিখাইতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" অর্থাৎ তোমরা উত্থান কর এবং জাগ্রত হও।

তাহার পরে আধ্যাত্মিক কথা। বঙ্গের দুর্গাপূজা এক্ষণে শরৎঋতুর একটা বড় তামাসা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! প্রকৃত পূজা কয় জন করে বা করিতে জানে? প্রকৃত পূজা কয় জন বুঝে বা বুঝাইতে পারে? পাঁঠা কাটা, মদ খাওয়া, নূতন কাপড় খরিদ করা বিদেশ হইতে বাটীতে আগমন করা আর নৃত্য গীতের বন্দোবস্ত করা, এখন এইগুলিই পূজার অঙ্গ। প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা অতি অল্প। পাঁঠা কাটা আর নৃত্য করা, শারদীয় পূজার এখন প্রধান বন্দোবস্ত! তাহাতেই ভক্তাধিক ভক্ত কবি রামপ্রসাদ শক্তির মহোপাসক হইয়াও অতি দুঃখে গাহিয়াছেন—

মন! তোমার ভ্রম গেল না।
তুমি কালী কে তা চিন্‌লে না॥

মা আমার জগৎময়ী, জগতে তার নাই তুলনা।
তুমি মাটির মূর্ত্তি গড়ে কি চাও কর্ত্তে মায়ের উপাসনা ॥
জীব মাত্র মায়েরি ছেলে কেহ নয় তাঁর পর ভাবনা।
তুমি খুসী কর্ত্তে চাও কি মাকে কেটে একটা ছাগলছানা ॥
প্রসাদ বলে রে মন ভক্তি মাত্র উপাসনা।
করে লোকদেখান দুর্গাপূজা মা ত তোমার ঘুস খাবে না ॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# ইস্রাইলের ঈশা।

মায়ামুগ্ধ মানব মণ্ডলীর কল্যাণ কামনায় যুগে যুগে যে সকল পূজনীয় মহাপুরুষগণ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের অযাচিত করুণা বলে এই বিরাট বিশ্বমণ্ডল সুসভ্য, সুশিক্ষিত এবং আধ্যাত্মিক তেজে বলীয়ান হইয়া উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহারা অপরের অভাব এবং দুঃখ দূরীকরণ জন্য নিজের সুখ, সম্মান এবং স্বচ্ছন্দতার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া, অমিত প্রেম এবং অপ্রতিহত অনন্যনিষ্ঠতা সহকারে প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অনন্ত আত্মোৎসর্গের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, ঈশ্বরানুগৃহীত ইস্রালীয় জাতির অমর ঈশা তাঁহাদের অন্যতম।

আমি বহুদিবসাবধি মহাত্মা যীশু খৃষ্টের পবিত্র জীবনী আলোচনা করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছি। সেই লোক পাবন চরিত্র যতই আলোচনা করি, যতই সেই অপূর্ব্ব দেব চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই তাঁহার প্রতি মন ও প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া যায়। সেই নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতৈষিতা, সেই প্রাণ স্পর্শী ধর্ম্মোপদেশ, সেই অনন্ত

বিশ্বাস পূর্ণ জীবন, আমার প্রাণের ভিতর কি এক অনির্ব্বচনীয় ঝটিকা উপস্থিত করে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এতদ্দেশীয় জন সাধারণ সেই চরিতামৃতের রসাস্বাদনে বঞ্চিত। মহাসাধু শ্রীমৎপল্ ( (St. Paul ) ফিলিপিয়নদিগকে কহিয়াছিলেন "যদাৎ সত্যম্, আদরনীয়ম্, ন্যায়ম্, সাধু, প্রিয়ম্, সুখ্যাতম্, অন্তেন যেন কেনচিৎ প্রকারেণ বা গুণ যুক্তং, প্রশংসনীয়ং বা ভবতি তত্রৈব মনাংসি নিবধ্নম্।" New Testament, Phillipians. IV. 8

ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মহানুভব পুরুষ পুঙ্গব য়িহুদী দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে মস্‌হা-আ (Messiah), গ্রীক টেস্টামেন্টে আইসোয়শ্ (Isous), মুসলমান সাহিত্যে ঈশা, ইংরাজি বাইবেলে ক্রাইষ্ট্ (Christ) এবং বঙ্গভাষায় যীশুখৃষ্ট নামে মানব সমাজে সুপরিচিত। প্রস্ফুটিত প্রসূণপুঞ্জ পরিপূর্ণ মনোহর উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুমকুলকে দর্শন করিবার পূর্ব্বেই যেমন তাহাদের হৃদয়ানন্দদায়ী সুগন্ধি দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বের ঘোষণা হইয়া থাকে, এই মায়ামুগ্ধ মানবমণ্ডলী মধ্যে মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকর্ত্তাবৃন্দের দ্বারা তাঁহাদের শুভাগমনের কথা ঘোষিত হইয়া থাকে। মহামতি যিশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে য়িহুদী ঋষি আইজায়া এলাইজা প্রভৃতি প্রাজ্ঞ পুরুষেরা ইস্রাঈল অবতার ঈশার জন্মগ্রহণ, মর্ত্ত্যধামে আবির্ভাব, জগতের কল্যাণ কামনায় আত্মোৎসর্গ, অলৌকিক ক্রিয়ার সম্পাদন প্রভৃতি কথা তাঁহাদের অবিনশ্বর গ্রন্থরাজি মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পালেষ্টাইন. নামক প্রসিদ্ধ প্রদেশের ক্ষুদ্র বৈথলহাম পল্লীতে মহামতি যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া পরিণামে যে অভিনব ধর্ম্ম মতের প্রচার করেন তাহাই একণে খৃষ্টান ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত এবং ঐ নবপ্রবর্ত্তিত মতের অনুসারীগণ খৃষ্টান (Christians) নামে প্রসিদ্ধ। ঈশ্বরানুগৃহীত ঈশার দেবোপম শারীরিক সৌন্দর্য্য, অনন্ত সাধারণ আধ্যাত্মিক তেজ, অতুলনীয়

পাণ্ডিত্য দিগ্বিজয়ী বাগ্মিতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, নির্ম্মল স্বভাব, দয়া দাক্ষিণ্যাদি মহৎ গুণাবলী, মধুময়ী প্রেমবাণী, নিতান্ত সারগর্ভ উপদেশমালা, ত্রিদিবসঞ্জাতা শক্তির সহায়তায় অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন পটুতা, প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে, বাস্তবিক, এই দেবপ্রতিম যিশুখৃষ্টকে আর মানব বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাসনা কর না। দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে, কাতরের প্রতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, সত্য ও জ্ঞানের মহিমায় জগতকে আলোকিত করিতে, পাপ ও পাপের পরাধীনতা হইতে মানব হৃদয়কে বিমুক্ত করিতে এবং সরল ভাষায় ও সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মনৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়া অশিক্ষিত নরনারীকে উন্নত করিতে, বোধহয়, মহামতি যিশু ভূতলে অতুল। চরিত্রে নির্ম্মলতা, স্বভাবে নিষ্কলঙ্কতা ব্যবহারে ভদ্রতা, আচারে শুদ্ধতা, কথায় মিষ্টতা, মনের ও কণ্ঠের একতা, কার্য্যে সরলতা, বল দেখি, যিশুর মত আর কাহারও ছিল কি? তিনি রূপের সাগর গুণের আকর, তিনি করুণার নিধি, বিদ্যার বারিধি। যদি কুসংস্কার পরিহার পূর্ব্বক ভক্তাধিক ভক্তের দিব্য নয়নে যিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর তাহা হইলে ইঁহাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে তোমার হৃদয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে। এই দেবতার সমস্ত জীবন পরের উপকারের জন্য—জগতের কল্যাণ সাধন জন্য—পৃথিবীকে স্বর্গভূমি করিবার জন্য, যাপিত হইয়াছিল। সূত্রধর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সামান্য অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া, রাজা বা সম্রাট, বীর বা পণ্ডিত, ধনবান্ বা প্রভুত্বশালী লোকের অণুমাত্র সহায়তা ভিন্ন, তিনি জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। বৈথলহাম পল্লীতে য়িহুদী বংশে দায়ূদ (David) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কেবল য়িহুদী জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, এই জন্য সমস্ত পৃথিবীকে তিনি

নিজের জন্মভূমি বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং জাতি, বর্ণ, দেশ, পাত্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই সহোদরস্বরূপে জ্ঞান করিয়া সকলেরই হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেন। এবম্প্রকার একজন অসাধারণ পুরুষ-পুঙ্গবের আবির্ভাব হইবে জানিতে পারিয়া য়িহূদী দেশীয় সাধিষ্ঠগণ যিশুর জন্মগ্রহণোপলক্ষে গাহিয়াছিলেন—

কেন রে মন ভ্রমর উড়ে বেড়াও ফুলে ফুলে।
ফুটেছে সোণার কমল, বৈথল হামে দায়ুদ কুলে॥

দরিদ্র যিশুর নাম এখন এই বিরাট বিশ্বমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুপরিচিত। পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যিশুর নাম গার্হস্থ্য শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমগ্র ইউরোপ, সমগ্র আমেরিকা, সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া এবং আসিয়া ও আফ্রিকার বহুল অংশ এখন যিশুশিষ্যগণের শাসিত এবং অধিকৃত রাজ্য মধ্যে গণ্য। পৃথিবীর মহাবলী ও সভ্যতম জাতিগণ এখন যিশুখৃষ্টের ভক্ত, সেবক ও উপাসক। জগতে এমন প্রধান স্থান নাই, যেখানে ঈশার নাম অপরিচিত। একজন প্রখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন :—"The Kings and the Queens, Emperors and the Empresses, lay their diadems at the holy feet of Jesus The philosophers and the saints stand with awful reverence before the image of the divine Christ Jesus of Nazareth. Churches and chapels, academies and colleges, and Kingdoms and empires have been founded after his name" সূত্রধর বংশসম্ভূত যিশুখৃষ্ট রাজা ছিলেন না, কিন্তু রাজাপেক্ষাও তাঁহার প্রভাব ও প্রভুত্ব ছিল, তিনি মানবের মনোরাজ্যে রাজত্ব করিতেন, সেই জন্ম জগতে অসংখ্যাসংখ্য নরপতির নাম ও রাজ্য ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এই দরিদ্র য়িহূদীসন্তানের নাম ও কীর্ত্তি এখনও উজ্জ্বল এবং অবিনশ্বর ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। Jesus was not a prince of blood royal; his sway extended over the wide dominions

of human thoughts. মহামতি যিশুখৃষ্টে দেবত্ব (Divinity) এবং মনুষ্যত্ব (Humanity) একাধারে সম্মিলিত ছিল। তিনি বাস্তবিক পৃথিবীর গৌরব এবং পৃথিবীর অলঙ্কার। যিশু বাস্তবিকই নরাকারে দেবতা। দেবত্ব না থাকিলে কেবল কি মনুষ্যত্ব লইয়া কেহ এত মহান্ হইতে পারে? তাঁহার পবিত্রতা পরিপূর্ণ সুবিমল জীবন এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া (Miracles) তাঁহার দেবত্বের অত্যুৎকৃষ্ট এবং অখণ্ডনীয় প্রমাণ। যিনি বলিয়াছিলেন "শত্রুগণ মিত্রবর্গ হইতেও অধিকতর প্রেমের পাত্র," যিনি বলিয়াছিলেন "তোমার প্রতিবাসীকে তুমি তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভাবিয়া প্রেম কর" আমি তাঁহাকে সভক্তি প্রণাম করি। যে মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে "প্রেমই ঈশ্বর'' এই মহাবাণী নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই মহানুভব যিশু জগতের সকলেরই প্রণম্য। এবম্প্রকার দেবোপম মহাপুরুষের শ্রীচরণারবিন্দের মধুপানে মানব-মন-ভৃঙ্গ চিরদিনই মুগ্ধ থাকে, ইহাতে সন্দেহ কি?

ইশ্রায়েলীয়ের ঈশা সমস্ত জীবন অবিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া, জিতেন্দ্রিয়তার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, অকাট্য সত্য প্রচার এবং সত্যের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণকেও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। দেশের হিতার্থে, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থে, কলুষ ও অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশার্থে, ভগবৎমহিমা প্রচারার্থে মহামতি যিশুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত। তাঁহার বৈরাগ্য, নিবৃত্তিমার্গের ব্যবহার, ধর্ম্মস্পৃহা এবং মধুর সরলতা প্রত্যেক মানবের পক্ষে অনুকরণীয়। ভূতলে খ্রীষ্টের আবির্ভাব যেমন অপূর্ব্ব হইতে অপূর্ব্বতর, তাঁহার অন্তর্দ্ধান (পরলোক গমন) তেমনি অসাধারণ হইতে অসাধারণ তর। আমি এই মহাপুরুষকে আবার সভক্তি প্রণাম করি। ইনিই নাকি বলিয়াছিলেন "যদি স্বর্গের রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ন্যায় ও

সত্যের রাজ্য যেন অণুমাত্রও ভগ্ন না হয় "—Fiat justitia ruet caelum. Let Justice and truth reign though Heaven should fall.

যিশুর পঞ্চ ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যিশু আজিও জীবিত, তিনি আজিও অমর। মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধান "মৃত্যু" বলিয়া গণ্য নহে; লীলার শেষ হইলেই ইঁহারা অদৃশ্য হইয়া লুপ্ত হয়েন। বাস্তবিক যিশু-চরিত্র অতীব বিমল, অতীব সুখপাঠ্য এবং অতীব মধুর। আমরা বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়দিগের পক্ষপাতী না হইতে পারি, নানা কারণে তাঁহাদের সহিত আমাদের একমত না হইতে পারে, বহুল হেতু বশতঃ আমরা খ্রীষ্টসমাজকে উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলেও মহামতি যিশু চিরকালই আমাদের হৃদয়ের প্রেম ও ভক্তির পাত্র বলিয়া পরিগণ্য থাকিবেন ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যিশুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত অনেকে অনেক সময়ে এক মত না হইতে পারেন, অনেকে হয় ত তাঁহার কতকগুলি অভিমতকে ভ্রমাত্মক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, (আমিও যে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ এক মত তাহা নয়), কিন্তু একথা অবিসম্বাদীরূপে বলা যাইতে পারে যে, জগতের অপরাপর মহাপুরুষগণ যে মহদুদ্দেশ্য সংসাধনার্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিশুখ্রীষ্টেরও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ঠিক তাহাই ছিল, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক থাকিলে, লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তবৃন্দ পরিণামে অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করিয়া মুক্তিধনের অধিকারী হইয়া থাকেন। বহির্দ্দেশকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিতে হইবে, কারণ "তৃণসমূহ জলের উপরে ভাসিয়া থাকে, কিন্তু রত্নরাজি সমুদ্রের অগাধ জলের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে।"

Errors like straw on the surface flow;
Dive deep; you find the gems below.

মহামতি বিশুর অনেক উক্তি এবং অনেক অভিমত তাঁহার জন্মগ্রহণের অনেক পূর্ব্বে আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে পূর্ব্বকালে লিপিবদ্ধ ছিল। ইস্রাইলের বিশু যে প্রকাণ্ড ধর্ম্মাট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ তিনটি বিরাট স্তম্ভের উপরে অবস্থিত। তাহাদের একটির নাম পাপের অনুভব (Consciousness of sins), দ্বিতীয়টির নাম অবতার (Incarnation) এবং তৃতীয়টির নাম প্রায়শ্চিত্ত (Atonement)। যজ্ঞের দ্বারা পাপের পরিত্রাণ বা প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি বেদশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে "যজ্ঞ অমৃত দ্রবীভূত হয়, যজ্ঞ দ্বারা শত্রু নষ্ট হয় যজ্ঞ কর্ত্তৃক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং সংসারেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে।" ঋগ্বেদে লিখিত আছে প্রজাপতি আত্মযজ্ঞ সাধন করিয়া ধরাধামকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, বেদের ভুবন বিখ্যাত টীকাকার সায়ণাচার্য্য করিয়াছেন "প্রজাপতিই আমাদের মুক্তিদাতা।" ঋগ্বেদের ঐতিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

বাগিন্দ্রতমানৌঃ বাচাস্মৈ তথা কৃত তথা স্বর্গং লোকমন্তি সম্ভবতি।

অর্থাৎ "বাক্যরূপ তরণীদ্বারাই ভবসাগর পার হওয়া যায়" যিশু বলিয়াছেন "আমিই বাক্য" অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে পরিস্ফুট করণ জন্য অবতীর্ণ হয়েন। হিন্দুগণের "শব্দব্রহ্ম" এবং 'টিকতেনাশব্দ' প্রভৃতি বাক্য অবলম্বন করিয়াই "ঈশা ব্রহ্মবাক্য এইরূপ কথা বাইবেলে লিখিত আছে। ঋগ্বেদ বলেন—'স প্রতিমানমসৃজত।"

অর্থাৎ "তিনি (ঈশ্বর) মূর্ত্তিমান (শরীরী বা সাকার) হইলেন," ইহাই খ্রীষ্টধর্ম্মের অবতার বাদ। শতপথ উপনিষদকার বলিয়াছেন—

"ততহ প্রজাপতেরর্দ্ধমেব মর্ত্ত্যাসীৎ, অৰ্দ্ধমমৃতম।"

অর্থাৎ প্রজাপতির অর্দ্ধাংশ মর্ত্ত্য অপর অর্দ্ধাংশ অমর অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বিশিষ্ট। এই কথা উপলক্ষ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা বলিয়া

বাক্যের "Ecce Homo! (Behold the Man!) In whom divinity and humanity are perfected in one."

যাহা হউক, মহামতি খিস্ত্রীষ্ট যে জগদ্বাসীর পরমোপকারী মিত্র ছিলেন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি যে মর্ত্ত্যধামের লোক ছিলেন না ইহা নিশ্চিত সত্য, এরূপ মহাপুরুষেরা পরিণামে মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়রূপ ধারণ করেন, তাহাতে অসম্ভাবনা কি আছে ?

"স মৃত্যুমেবাপ পুনর্মৃত্যুঞ্জয়তি, নিনং মৃত্যুমাপ্নোতি।"

পরব্রহ্মের মহাশক্তির সহিত সম্মিশ্রিত না হইলে এরূপ মহাপুরুষত্ব লাভ করা অসম্ভব হইতে অসম্ভবতর, এইজন্যই সাধু পল (Saint Paul) লিখিয়াছেন "Christ is the wisdom of God ; Christ is the Power of God" ফলতঃ খৃষ্টানের মহামতি ঈশা যে ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বাক্য ; আমি সেই নরাকারের দেবতাকে ভক্তিভাবে আবার প্রণাম করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করি। *

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# লঙ্কাদ্বীপে।

"Behold the God-less Land Shines Afar"—Ferguson.

"ইতো দ্বীপে সমুদ্রস্য সম্পূর্ণে শত যোজনে।
তস্মিন্ লঙ্কাপুরী রম্যা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।" রামায়ণ।

বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, "বড় বড় বানরের বড় বড়

---

* এই প্রবন্ধ ইংলণ্ডের "মিশনরী হেরাল্ড" (আগষ্ট, ১৯০৩) এবং "মিশনরী রিভিউ" (ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪) নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে—প্রকাশক।

পেট—লঙ্কা ডিঙ্গুতে মাথা করে হেঁট"। কবিকুলধুরন্ধর মহাত্মা কৃত্তিবাস ওঝা বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অব্যয় ব্রহ্মপদ স্মরণ করিতে করিতে জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছেন; এই মৃত্যুময় মর্ত্তধামে তাঁহার রক্তমাংসের নশ্বর শরীর আর নাই, সেই জন্ত তাঁহাকে কিছু না বলিয়া তাঁহার অচ্ছেদ্য অদাহ্য অশোষ্য এবং অবিনশ্বর আত্মার উদ্দেশে বলিতে পারি, "হে কবিকুল গৌরব! ত্রেতাযুগে বড় বড় পেটযুক্ত বিপুলবপু বা-নরেরা যাহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য বলিয়া ভাবিত, কালপ্রভাবে কলিযুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেটযুক্ত ক্ষীণবপু নরেরা তাহা সুসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দেখুন, আমি অতি সামান্ত মনুষ্য হইয়াও আমার জীবনে তিনবার সেই দুর্গম পৌলস্তপুরে পরিব্রজণ করিয়া আসিয়াছি। আপনার সেই স্বর্ণ কিরিটিনী লঙ্কাপুরীর পর্ব্বত, অরণ্য, নগর, নদ, নদী, গ্রাম, সাগর সরোবর প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ভ্রমণ ও দর্শন করিয়া আসিয়াছি। আপনার সেই সাত সমুদ্র এবং তের নদী পারের নিশাচর নিবাসিত লোল জিহ্বা লঙ্কায় এক্ষণে বিক্রমী বৃটীসের বিজয় ডঙ্কা বাজিতেছে, সুতরাং লঙ্কায় আর শঙ্কা নাই"। পাঠক মহাশয়! আমি প্রথম ও দ্বিতীয় বারে লঙ্কায় সামান্ত কাল মাত্র অবস্থান করিয়াছিলাম সুতরাং আমার ভ্রমণ, দর্শন এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না, কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ না হওয়ায় আবার তৃতীয়বার লঙ্কাপুরী অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। লোকে কথায় বলে "বার বার তিনবার" সুতরাং তৃতীয় বারের ভ্রমণে মনের সাধ ভাল করিয়া মিটাইব বলিয়া স্থির করিলাম। এই তৃতীয় বারের উদ্যোগের সময় আমি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত টাঞ্জোর ( Tanjore ) বা তাঞ্জারোবার নগরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গালো মধ্যে অবস্থান করিতে ছিলাম; মান্দ্রাজ হইতে টাঞ্জোর অধিক দূরবর্ত্তী নহে, ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিয়া

ছয়ঘণ্টা কাল মধ্যে মান্দ্রাজ নগর হইতে টাঞ্জোর সহরে আগমন করা যায়। সিংহলযাত্রার বন্দোবস্ত সমাপন করিয়া টাঞ্জোর রেলওয়ে ষ্টেশনে, টোটিকোরীণ (Tuticorin) নামক স্থানের টিকিট ক্রয় করিলাম, এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য। জলপথে সিংহল যাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে যেরূপ ব্যয়, যে রূপ অসুবিধা এবং যেরূপ নানা প্রকারের আশঙ্কা আছে তাহার তুলনায় টোটিকোরিনের লৌহবর্ত্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বাষ্পীয়শকট যোগে টাঞ্জোর হইতে টোটিকোরিন সাত ঘণ্টার পথ; এই পথে আসিবার সময়ে কেবল মনিয়াচি (Maniachi) নামক জংশন ষ্টেশনে যাত্রীদিগকে গাড়ী বদ্‌লাইতে হয়। মনিয়াচি হইতে একটি লাইন ত্রিনবল্লী বা ত্রিনিভেলী (Tinevelly) পর্য্যন্ত প্রশস্ত হইয়াছে এবং আর একটি লাইন টোটিকোরিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সমুদ্র উপকূলে পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ত্রিনেভেলী দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বশেষ রেলওয়ে ষ্টেশন, ইহার পরে আর রেলওয়ে বর্ত্ম নাই। এই রেলওয়ে ষ্টেশনের কিয়দ্দূরেই বৃটীশ রাজত্বের শেষসীমা এবং ইহারই অনতিদূরে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন্ মহারাজাদিগের রাজত্ব আরম্ভ। এই লাইনের সহিত লঙ্কাযাত্রীর কোনও সম্পর্ক নাই। টাঞ্জোর হইতে টোটিকোরিণ আসিতে হইলে পথিমধ্যে অনেক স্থানে অবতরণ পূর্ব্বক নানা প্রকার আশ্চর্য্য এবং সুন্দর পদার্থ সমূহ দর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে এই পথে বহুবার গতায়াত করিয়া ঐ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম বলিয়া এবারে আর অবতরণের আবশ্যকতা দেখিলাম না। নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং বিশালপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের বাষ্পীয় শকট টোটিকোরিণ ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইল। ভারতমহাসাগরের যে অংশের নাম মান্নার উপসাগর (Gulf of Mannar), তাহারই তট দেশে টোটিকোরিণ ষ্টেশন অব স্থিত,

রেলওয়ে প্লাটফরমে দণ্ডায়মান হইয়া সুবিশাল ভারত মহাসাগরের নীলোর্ম্মিমালা অবলোকন করা যায় এবং তরঙ্গাবলীর ঘাত প্রতিঘাতের ভৈরব গর্জ্জন পথিকের শ্রুতি গোচর হয়। আমার তৃতীয়বারে সিংহল যাত্রা করিবার সময় বোম্বাই অঞ্চলে প্লেগের মহাধুম ছিল; দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্রীয় দিগের মহামারির চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান না থাকিলেও, রেলওয়ে ষ্টেশনে সাক্ষাৎ কৃতান্তকৃতি স্বরূপ দুইজন মেটে ফিরিঙ্গি ( East Indians ) প্লেগডাক্তার উপস্থিত ছিল। বাষ্পীয় শকট উপস্থিত হইবামাত্র, বড় বড় বিলাতী জাহাজের বড় বড় কড়ার মত মোটা মোটা রশি ধরিয়া পুলিসের কনেষ্টবলগণ বলিয়া উঠিল "পো ইন্নে পো ইন্নে; ইরিকে ইরিকে।" টোটিকোরিণে তামিল ভাষা প্রচলিত, বাঙ্গালায় অর্থ করিলে এইরূপ হয়——

"পলাইও না, পলাইও না; দাঁড়াও, দাঁড়াও"। পথিক দিগকে প্লাটফরমে দাঁড়াইতে হইল; ডাক্তারেরা আসিয়া তাড়াতাড়ি আমাদের নাড়ী, নাড়ী, দাড়ী ( দন্ত ) এবং আরও কত "আড়ীর" পরীক্ষা করিয়া কাহাকেও কোরেণ্টিন্ ( Quarantine ) নামক বংশ নির্ম্মিত কারাগার মধ্যে আবদ্ধ করিল, কাহাকেও বা চতুর চূড়ামণি চাপরাসীর হস্তে সমর্পণ করিল, কাহারও সঙ্গে গোপনে গোপনে কি পরামর্শ করিতে লাগিল এবং কাহাকেও বা কনেষ্টবলগণ, "যা ব্যাটা মর্কটবদন! আজ্ খুব এড়িয়ে গেলি" বলিয়া গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল। পরিত্রাণপ্রাপ্ত পথিকেরা সারমেয় তাড়িত মেষ শাবকের ন্যায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে সমুদ্র তটে আসিয়া নিশ্বাস ছাড়িল, এবং সেই দুঃখের নিশ্বাসবায়ু পূতঃসলিল সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া অনন্তের দিকে ছুটিল——যেন সেই অনাদি অনন্ত অব্যয় ব্রহ্মপদে পথিকের দুঃখ কাহিনী ব্যক্ত করিতে চলিল। পরিত্রাণপ্রাপ্ত পথিক দিগের সঙ্গে বাহিরে আসিলে যায়, নানা দিক হইতে দলে দলে কতকগুলি কৃষ্ণকায় বালক আসিয়া "নান্ কুলী ইরকুম, হংগে বা আহবা, হংগে বা" বলিয়া

ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। ভাবিল তাহার 'আইয়া' শব্দের অর্থ 'মহাশয়'; বুঝিলাম, তাহারা বলিতেছে, "আমি কুলি, এদিকে আসুন মহাশয়! এদিকে আসুন"। কুলির আবশ্যক হউক আর না হউক দক্ষিণ ভারত রেলওয়ে লাইনে ( South Indian Railway ) অবতরণ করিলেই একটা কুলিকে সঙ্গে লইতেই হইবে; যদি কুলির উপযুক্ত মোট না থাকে, তবে তাহাকে 'পাণ্ডা' বা 'পথপ্রদর্শক' স্বরূপ লইয়া যাইতে হইবে; যদি তাহাতেও কেহ সম্মত না হয়েন তাহা হইলে মাদ্রাজী মুটে দিগের অসদাচারে তাঁহাকে অবশেষে বাধ্য হইয়া কিছু দক্ষিণা স্বরূপ ব্যয় করিতেই হইবে। মুটেকে রিক্ত হস্তে রাখিয়া প্লাটফরম হইতে চলিয়া যায় এমন সাহসী পুরুষতো দেখি নাই; দক্ষিণ ভারত রেলওয়ে ষ্টেশনে "মুটে" নামক অদ্ভুত জীব অতীব প্রবল প্রতাবশালী——এই কৃষ্ণ কায় মহাপুরুষ রেলওয়ে ষ্টেশনে The most important factor, ইনি সেখানে The only object of interest এবং ইনিই প্লাটফরম নামক সুন্দর সরোবরের শারদীয় কমল। এই অদ্ভুত Factotum অর্থাৎ "হয় কর্ত্তা মণ্ডলা" দক্ষিণ ভারতের রেলওয়ে লাইনের The observed of all observers!! হোরেশিও তাহাঁর দর্শনে যাহা দেখেন নাই, প্রিন্নিন্ তাঁহার আট্‌লাণ্টিস্ মধ্যে যাহা পান নাই, দান্তে ( Dante ) তাহাঁর কল্পিত নরকে ( Infernal region ) যাহা দেখিবার আশা করেন নাই, এখানকার মুটে মহারাজের চরিত্রে তাহা দেখিতে পাইবেন। রেলওয়ের পুলিস প্রভুগণ মুটে দিগের পরমবন্ধু; রেলওয়ের ইষ্টইণ্ডিয়ান বা ইউরেশীয়ান্ সাহেবগণ মুটে প্রভুর পরম হিতৈষী সখা এবং রেলওয়ে কর্মচারী গণের নিকট কৃষ্ণকায় কুলীকুল যেন সাক্ষাৎ সহধর্ম্মিনীসহোদর!! মুটের কটাক্ষে বৈশ্বানর ভীত হয়, এবং তাহার আধিপত্যে ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠে; দক্ষিণ ভারতে মুটের সাত খুন মাফ!! পাঠক মহাশয়, ইহার কারণ কিছু বলিতে বা বুঝিতে

পারেন কি ? মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ রেলওয়ে ষ্টেশনে ফিরিঙ্গি ও যেটে ফিরিঙ্গি সাহেব দিগের এবং ষ্টেশনের প্রভু ও কর্ম্মচারী দিগের "রক্ষিতা যুবতী" দিগের সহোদর, আত্মীয় জ্ঞাতি অথবা কুটুম্বেরাই কুলীরূপে কলিযুগে বিরাজমান।। ইহারাই কুলীন কুলী। আর যে সকল ব্যক্তিরা রেলওয়ের "সৌকীন সাধু" দিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে সংগোপনে নিশিযোগে আনয়ন করে, তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলীরূপে বিরাজমান।। সুতরাং কুলীকুলের বাজারে দর না দিয়া চলিয়া আসা কাহার সাধ্য ? যাহা হউক, একটি বালক কলীকে সঙ্গে লইয়া আমি কতিপয় মিনিট কাল মধ্যে সমুদ্র তটের পথ অতিক্রম করতঃ টোটিকোরিণ সহরে প্রবেশ করিলাম। টোটিকোরিণ দক্ষিণ ভারত বর্ষের সর্ব্বশেষ বৃটীশ ডিষ্ট্রিক্টের সর্ব্বশেষ মফস্বল এবং সর্ব্বশেষ নগর, ইহা ত্রিনেভেলী জেলার একটি বড় সবডিভিজন। টোটিকোরিণের তামিল নাম তুঁৎকুডি ইংরেজেরা ইহাকে সংক্ষেপে কখনও কখনও কেবল কোরীণ ( Coun ) বলিয়া থাকে। ইউরোপীয় নাবিকেরা ( Sailors ) ইহাকে Toti ( টোটি ) বলে এবং সরকারী কাগজ পত্রে Toticorin লেখা হইয়া থাকে। পয়তাল্লিশ বর্ষ পূর্ব্বে ইহা ওলন্দাজ দিগের শাসনাধীন ছিল, তাহার পরে ইংরেজেরা ওলন্দাজদিগের রাজার নিকট হইতে ২৯ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা মূল্যে ইহা খরিদ করিয়া লয়েন, এখন ইহা ইংরেজের রাজ্যভুক্ত। টোটিকোরিণ, দক্ষিণ ভারতের দুইটি জগদ্বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর ( Seaport ) মধ্যে অন্যতম, নাগপত্তন ( Negapatam ) ভিন্ন ভারতবর্ষে টোটিকোরিণের ন্যায় বন্দর বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। নেগাপটম হইতে মালাক্কা, সিংগাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, শ্যাম, যাবা, বালি পিনাং বোর্নিও, ব্রহ্মদেশ, সংঘাই, মানচুরিয়া প্রভৃতি বহুস্থানে নিত্য নিত্য জাহাজের আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে এবং লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের দ্রব্যাদির বানিজ্য হইয়া থাকে।

টোটিকোরীণ হইতে সিংহল, স্থয়েজ, আরব্য, পারস্ত, তুরস্ক, সিরিয়া, মেশোপোটেমিয়া, পালেস্তাইন, ইংলণ্ড, ইটালী, আমেরিকা প্রভৃতি বহুস্থানে জাহাজের আমদানী রপ্তানী হয় এবং পক্ষীপুচ্ছ, তুলা, রেসম, প্রবাল, সমুদ্রজমৎস্ত, সোরা, ফট্‌কিরি, হরিতকী, লবঙ্গ, সর্ষপ, লৌহনির্ম্মিত খেলানা, বনজ ঔষধিবৃক্ষ, সোহাগা, গুড় প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্যের বানিজ্য হইয়া থাকে। টোটিকোরিনের লোকসংখ্যা প্রায় ৫৬ সহস্র, ইহার মধ্যে রোমান কাথলিক খৃষ্টান ১২ সহস্র, প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ১০ সহস্র, হিন্দু ২৩ সহস্র, মুসলমান ৮ সহস্র এবং পার্শী, আর্ম্মাণী, তুর্ক, য়িহুদী, আরবীয়, মুর, ওলন্দাজ প্রভৃতির সংখ্যা ৩ সহস্র। কোরীণ খুব ধূমধামের সহর নহে কিন্তু বানিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়া এখানে পৃথিবীর-নানাদেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আইসে এবং প্রায় সকল দেশেরই ভাষা শুনিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগতঃ বণিক ও ব্যবসায়ী দিগের কোলাহলে সমগ্র সহরটি "গুলজার" থাকে। জাহাজের শব্দ, রেলের শব্দ, নৌকার কোলাহল, ইঞ্জিনের শব্দ, সমুদ্রের গর্জ্জন, কুলীদিগের চীৎকার, অসংখ্য বলদ শকট চালার শব্দ, ব্যবসায়ী দিগের কোলাহল প্রভৃতিতে সহরে "নির্জ্জনতা" অথবা "স্থিরতা" বলিয়া কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না।

টোটিকোরিণে জলকষ্ট আছে কিন্তু কূপ হইতে যেরূপ সুস্বাদু সুপাচ্য এবং সুন্দর জল পাওয়া যায়, তুলনায় ভারতের অন্যান্য অংশে সেরূপ জল খুব কমই দেখা যায়, এখানকার জলে, পাথর পর্য্যন্ত হজম করিয়া দিতে পারে। প্রাচীন কালে এখানে পানীয় জলের খুব অপ্রচুরতা ছিল বলিয়া এই স্থানের "তূঁৎকুড়ী" নাম হইয়াছিল। এখানকার ভাষার নাম তামিল ভাষা, ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নানাস্থানে প্রচলিত। পাঠকের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কতকগুলি বাঙ্গলা শব্দের তামিল অনুবাদ দিতেছি। তদ্যথা—উপ্পু, লবণ, নী তুমি,

নীকো আপনি, তানীর জল, আক্কে সেখানে, বীডে গৃহে, এন্তে তৈল, বিল্লকু অগ্নি, পেন্না নাম, নান্‌আদি, পুলী:উঁতুল, কাই কল, কায় হস্ত, পুত্তকম্ পুস্তক, নাল্লে সুন্দর, ইত্যাদি।

টোটিকোরিণে শুক্তি ধরিবার বহুল কারখানা দেখা যায়, ইংরাজীতে তাহাকে Pearl Fisheries কহে, বারিধির বালুকাকে গলাইলে এক প্রকার বহু মূল্যবান প্রস্তর প্রস্তুত হয়, তাহা বিলাতের বাজারে Corin Stone নামে সোনার দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানকার রোমান কার্থলিক খৃষ্টানেরা প্রায়ই হিন্দুর মত, ইহাদের অনেকের গৈরিক বসন, নিরামিষ আহার, দেবদেবী পূজা, মালা ধারণ, ধূপ ধুনার ব্যবহার প্রভৃতি দেখিলে হিন্দু বলিয়া ভ্রম হয়। সহরের সর্ব্বত্রই ইংরাজী ভাষার ছড়া ছড়ী। বুড়ী স্ত্রীলোকেরা তাম্বুল বিক্রয়ের সময় One Two Theee Four বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। নিরপেক্ষ ভাবে বলা যাইতে পারে শিক্ষিত হিন্দু ভিন্ন এবং অতি সামান্ত সংখ্যক খৃষ্টির পুরুষ ভিন্ন, এখানে ভাল ইংরাজী প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। দেশীয় খ্রীষ্টান দিগের ইংরাজী প্রায়ই Butler's English অর্থাৎ বাউরচির ইংরাজী বলিলেই হয়। "আমি তোমার বাসা চিনি তবে আসি", এই কথাটির "I sugar your nest then I Fighty" অনুবাদ করিলে যেমন সুন্দর ইংরাজী হয় টোটিকোরিনের খৃষ্টানের ইংরাজি প্রায় তদ্রূপ, "আমার পদতলে বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে, তাহার চক্ষের জল দেখিয়া আমার বক্ষ ফাটিয়া যায়, আমারও কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, অহো। তাহার বংশের সকলেই ভাল, আইস, চেষ্টা করিয়া দেখি।" ইত্যাদি। এই কয়েক পংক্তির যদি এইরূপ অনুবাদ করা যায় "My legs under Heaven Chatterjee Sitting cry doing, His eye water seeing my breast ফাটিয়া go, my and cry doing wish is aho! his bamboo is all good, come, try and see" তাহা

হইলে যেরূপ ইংরাজি হইয়া থাকে, কোন্নীণ নগরের খৃষ্ট-খোঁয়াড়ের "বিনম্র মেষ শাবক" দিগের ইংরাজিও সেইরূপ সুন্দর!! আর তাহাদের উচ্চারণ শক্তি এবং স্মরণ শক্তির পরিচয় না দিলেই ভাল হয়, কারণ যদি তাহাদের কাহারও হিন্দু প্রভু বলিয়া দেয় যে, "বড় সাহেবকে কহিও, 'হুজুর! আমার পিতার Fever ও Liver বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেই জন্ত আমি বাবার Substitute আসিয়াছি," তাহা হইলে সে বলিবে "Large Master! Large Master! I am my father's Prostitute, I come father's prostitute,; Father River Giver বাড়িয়া upping"; যাহা হউক, কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এই স্বাস্থ্যপ্রদ সহরের সুন্দর জলবায়ু উপভোগ করিয়া আমি লঙ্কাদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্ত সমুদ্র তটস্থ বহুসংখ্যক ষ্টিমনাভিগেশন কোম্পানীর প্রশস্ত বর্ম্মে ( Steam Navigation Road ) উপস্থিত হইলাম। অনেক কোম্পানীর ,অনেক আফিস, কাহার নাম করিব? আমি বৃটীশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নাভিগেশন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে একখানি কলম্বোর টিকিট ক্রয় করিলাম। জাহাজের ভাড়া এইরূপ—— প্রথম শ্রেণী ১০৲ দ্বিতীয় শ্রেণী ৮৲, মধ্যম শ্রেণী ৬৲ এবং তৃতীয় শ্রেণী ৩৸৶০।

জেটিতে ( Jetty ) চড়িয়া দেখিলাম, সমুদ্রের তীরে জেটির ঘাটে একখানি ছোট ষ্টীমার ( Steam lauuch ) ভাসিতেছে এবং বারিধির বিপুল তরঙ্গে প্রবলরূপে আন্দোলিত হইতেছে।" বিশাল বারিধির অভ্রস্পর্শী বেলাকূল অতিক্রম করিয়া এই ক্ষুদ্র ষ্টিমতরনী কিরূপে যাইতে পারে এই কথা লইয়া অনেকের মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে; আমিও যখন সর্ব্বপ্রথমে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলাম তখন আমারও মনে এইরূপ সংশয় ছিল, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, তট হইতে প্রায় একাদশ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল অত্যন্ত বিড়ীষ্ট ( Shallow ), এই জন্ত ছোট জাহাজে চড়িয়া এই এগার মাইল যাইতে হয়, তাহার পরে খুব বড় বিলাতি জাহাজ পাওয়া যায়, সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া

লকাযাত্রা করিতে হয়। দিবাবেলা ছইটার সময় ছোট জাহাজে চড়িয়া আমি সাগরে ভাসিতে লাগিলাম এবং ভাসিতে ভাসিতে বেলা প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চঘটিকার সময় প্রবল তরঙ্গায়িত সমুদ্র বক্ষে আসিয়া পৌছিলাম, যে জাহাজে আমাদিগকে আরোহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার নাম Catoria (কাটোরিয়া)। বাষ্পীয় পোতে আরোহণপূর্ব্বক টিকিট অনুসারে আসন অধিকার করিয়া দেখিলাম, মহারাষ্ট্রী, পার্শী, য়িহুদি ইংরাজ, তুর্ক, সিংহলী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী অনেক জাতিই রহিয়াছে, কিন্তু একটিও বাঙ্গালী নাই। জাহাজের একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়া উঠিল "None of that ubiquitous race here" অর্থাৎ সেই সর্ব্বত্র গামী (বাঙ্গালী) জাতির এখানে কেহই নাই। নিকটস্থ এক গোয়া হাসিয়া বলিল "No land is free from them, water they——"আর বলিল না। আমি প্রায় নয় মাস কাল বাঙ্গালীর মুখ দেখি নাই, অথবা বাঙ্গালীর মুখের কথা শুনি নাই সেই জন্ত একজন বাঙ্গালী দেখিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইল। জাহাজে বাঙ্গালী নাই শুনিয়া আমি একটা কেবিনে (Cabin) প্রবেশ করিলাম, তথায় এক বৃদ্ধ ইংরাজ এবং তাঁহার যুবতী কন্তা বসিয়াছিলেন। পিতা ও কন্তার সহিত আলাপ হইল, সাহেব বলিলেন, "আমি অনেকদিন বাঙ্গলা দেশে ছিলাম এখন সিংহল দ্বীপে চা বাগানের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকি। বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতে পারিতাম এবং মুদ্রিত পুস্তকাদিও পড়িতে পারিতাম। বাঙ্গলা কবিতা আমার বড় ভাল লাগিত এবং প্রায়ই দুই চারিটা কবিতা মুখস্ত করিয়া রাখিতাম।" আমি বলিলাম, "সাহেব! এক আধটা কবিতা শুনিতে পারি কি? শ্রীমুখের কবিতা বোধ হয় বড়ই শ্রুতিসুখকর হইবে।" ঝাটিতি একটা বিপুলবপু তরাঙ্ক (Trunk) খুলিয়া অনেক দিনের পুরাতন একটা অর্দ্ধছিন্ন এবং মলিন ডায়রি তুলিয়া সাহেব বাহাদুর দেখিলেন যে, তাহাতে ইংরাজি অক্ষরে (Roman character)

দুই তিনটা বাঙ্গালা কবিতা লেখা আছে। "এই শুনুন" বলিয়া ইউরোপীয় জিহ্বার সহায়তায়, শ্রীমান সাহেব বাহাদুর নিম্ন লিখিত আদব কায়দা অনুসারে, বহু যত্নে, একটা কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব্ব কবিতাটি এই—

> হিলি মিলি কান্ কটারি, কেলোর মাইয়ার জি।
> টপ্‌টা বাটে বেগুণ পোরা, পান্‌টা বাটে গি॥
> কুলু কুলু গন্‌গা বলে, উলু উলু বয়্।
> পীরু চাচা বলে হামার্ লান্‌গল টুলে ডয়্॥
> হিলিমিলি কান কটারি,.রায়ের বেটি পুরো।
> খেটে শুটে বেটে আর সিঁড্‌কাটি শুয়ো॥
> আস্তে খেয়ে, রোস্‌কে মেয়ে, চেয়ে চেয়ে বলে।
> হিটি মিটি খুটি নাটি, চটু চাপটির কলে॥
> শুংগো সারা, শেকোর পারা, হারাবটি হরু।
> চুপ! চুপ। চুপ। চেপোর চাচা, টানুটানী নীনী চরু।

বলিও পাঠক মহাশয়! কিছু বুঝলেন কি? বলি ও গো পাঠক মহাশয়। মানেটা কিছু বুঝিতে পারেন কি? কবিতা শুনিয়া আমার ত বোধ হইল ইহা যেন সশেমিরের বাবা!! সাহেব বলিলেন, "বলুন দেখি, মহাশয়। ইহার অর্থ কি?" আমি বলিলাম, "আপনি বলুন দেখি শুনি।" সাহেব কহিলেন, "আপনিই বলুন না।" আমি বলিলাম "আপনার মুখে শুনা যাক্, আপনিই বলুন না।" সাহেব ও আমার তৎকালের কথোপকথন শুনিলে বোধ হইত যেন সেই জাহাজের কেবিনে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানদিগের হুকা কুরসির বৈঠক বসিয়াছে, মুসলমানেরা যেমন কুরসি হাতে করিয়া পরস্পরকে বলে আপ্ পিজিয়ে, আপ্ পিজিয়ে, সাহেব ও তেমনি আমাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি বলুন, আপনি বলুন;" আমিও তেমনি সাহেবকে বলিতে লাগিলাম "আপনি বলুন, আপনি বলুন।" কিন্তু কবিতার অর্থ

বিষয়ে সাহেবের যেমন পাণ্ডিত্য আমারও পাণ্ডিত্য সেইরূপ। চোরে চোরে মস্‌তুতো ভাই! অথবা "পণ্ডিতে পণ্ডিতে ধূল পরিমাণ!!" পাঠক মহাশয়। স্বীকার করি এ কথা সত্য যে, এই কবিতার অর্থ, "মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে," কিন্তু আপনার মত পণ্ডিতেও কি বুঝিতে পারে বৎসর দ্বাদশে? সাহেব বাহাদুরকে আবার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীমান এবারে তাঁহার কন্তার কেশ গুচ্ছের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার কিছু প্রয়োজনীয় কাজ আছে, এই সময়ে মাফ কত্তে হবে।" সুতরাং মাফই করিতে হইল, কিন্তু আমি যখন কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংক্ষেপে বলুন দেখি, ইহার কিরূপ অর্থ হইতে পারে?" আমি বলিলাম, "কবিতা শুনিয়া ইহাকে একটা Puzzle বলিয়া বোধ হইতেছে।" সাহেব বলিলেন"Chinese or Gordian?"আমি বলিলাম, "Both"—সাহেব মৃদুহাস্ত হাসিলেন, আমি কেবিনের বাহির হইলাম। অনেক ক্ষণ হইল জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, পূর্ণিমার রাত্রি, শরৎকাল, সেই অনন্ত অরুদ্ধ আকাশে শরতের পূর্ণ শশি শুভ্র ও সুশীতল কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক তারতমগাসাগরের বীচী মালার উপরে নিপতিত হইয়া "উজ্জলে মধুরে" মিশাইতেছিল। উপরে অনন্ত আকাশের চন্দ্র চন্দ্র ও শ্বেত নক্ষত্র জলিতেছিল, এবং সমুদ্রের জলে অসংখ্য সুধাকর ভাসিতেছিল, যেদিকেই দেখ কেবল রজত বরণ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতে ছিল না; ক্ষণেকের জন্য বহির্জগত ভুলিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ গত না হইতে হইতেই সেই বিশাল বৃটীশ তরণীর ভিতর হইতে অর্দ্ধমৃদু অর্দ্ধউচ্চ স্বরে এবং মধুর কণ্ঠ নিসৃত এক মজার সুরে কে যেন গাইয়া উঠিল——

"শাঁক বাজারে পাণি আসে একি চমৎকার।
পাণির চোটে, বদনা কাটে, কি করিব আর॥
হানিফ্‌চাচার মোরগ্ ছিল। সেও তো বাণে ভেসে গেল।

চাচি কেঁদে আকুল হোলো। হতুয়া সানকি রাখা তার।
নাঁক বাজায়ে পানি আনে একি চমৎকার॥"

আমি নিম্নোখিত ব্যক্তির ন্যায় হ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, কে রে বাবা!! এতদিনে, এ অতল বারিধিবক্ষে তুমি কোন বাঙ্গালী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ বাবা!! কেহ উত্তর দিল না।

মনে মনে ভাবিলাম, অনেক দেশে বাঙ্গালী ভ্রমণ করে এবং অনেকে দুই একটা বাঙ্গালা গান শিখিয়া লয়। এই মান্দ্রাজী মণ্ডলীর মধ্যে বোধ হয় কেহ বাঙ্গালা গান অভ্যাস করিয়া থাকিবে, জাহাজের কোনও স্থানেই বাঙ্গালি নাই তবে বাঙ্গালী কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালী কি জলজন্তু যে জলের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিয়া বৃটীশ তরনীকে পবিত্র করিয়াছে। এই সকল কথা ভাবিতেছি এমন সময়ে সেই কণ্ঠ হইতে আবার শুনিলাম——

ছোট মামু গো। ভেবে মমু গো এবার চুনিয়া পোড়ালে আল্লা॥
যেক্ত পানি কোটা নাই মেহ ডাহে সদাই আসমান আগুন লাগ ল॥
ছোট মামু গো! এবার চুনিয়া পোড়ালে আল্লা।
ভে ব্রিহু গা ছোট মামু গো খোদায় গজবে সব কোরে ফেলা ভেল্লা।
যা ছিল সানকি থালি বদনা আদি, বেচে কিনে কোল্লাম মহাজনে রাজি।
আমার ভাগ্যে এবার ক ন গা কাজ দরগায় হবগীয় দিব সিন্নি কেলা।
মামুগো।, এবার চুনিয়া পোড়ালে আ...।

একি! একি! এযে বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর! একি! একি! এযে বাঙ্গালী মুখে বাঙ্গালা ভাষা!! দৌড়িয়া গিয়া চারি দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম দেখা গেল নীচের একটা ঘরের পার্শ্বে এক বারান্দায় উপবেশন পূর্ব্বক হুকা টানিতে টানিতে এক অদ্ধবৃদ্ধ মুসলমান ঐ গান দুইটি গাইতেছিল। প্রথম গীতটি ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন উপলক্ষে, দ্বিতীয় গীতটি অনাবৃষ্টি উপলক্ষে। বাঙ্গালীর জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি

কে হে বাপু! তোমার বাড়ী কোথায়?" বাঙ্গালা ভাষা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থাণ পূর্ব্বক সে বলিল, "আগ্গে আইও্ন্ আইও্ন্ আইল্ হান্ কেনা বৃত্তন্, মোর্ হঁওর বারি চাহার্ জেলা; মোর বারি চাটগায়ের জেলা, মোর্ নাম গোলাম রসুল। তামাগ্ খাইবাঁন"। আমি বুঝিলাম, লোকটির নিবাস চট্টগ্রামে, শ্বশুরঘর—ঢাকা জিলায়। বুঝিলাম, এই ব্যক্তি জাহাজের খালাসী, কলিকাতার এক জাহাজ হইতে বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছে। তামিল সিংহলী হিন্দি এবং তেলুগু ভাষায় খুব শীঘ্র শীঘ্র কথোপকথন করিতে পারে। আমি তখন সেই অর্দ্ধ বৃদ্ধ খালাসীজীকে বলিলাম, "মিঞাসাহেব। তোমার কিছু বিশেষ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা হয়, অতএব তোমার নাবিক জীবনের কিছু ইতিবৃত্ত বর্ণনা কর।" কথা শুনিয়া নাবিকবর মোরাদাবাদের মিস্ত্রি বিশেষের কর কমল কর্তৃক তৈয়ারি এক প্রকাণ্ড পিতলের ফুরশীর সর্পাকৃতি মুখমণ্ডল হইতে বিনির্গত গুড গুড ভড ভড শব্দকে ক্ষণ কালের জন্য থামাইয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৃদ্ধের একচেটিয়া উচ্চারণে শ্রীমুখ হইতে যে সকল শব্দাবলী বিনির্গত করিয়াছিলেন, তাহাই সাধুভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতেছে। মিঞাসাহেব বলিল, "ঢাকা জেলার শরক চাচার নাম শুনিয়া থাকিবেন, আমি তাহারই ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি ১৭ বৎসর বয়ক্রম হইতে জাহাজের কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। জাহাজের কর্ম্ম করিতে করিতে ইটালী, লণ্ডণ, ফ্রান্স, জর্ম্মনি, আমেরিকা, এডেন, তুরস্ক, পারস্যের বুশায়ার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। আফ্রিকার অনেক স্থলেও গমনাগমন হইয়াছে। খোদার মেহেরবান্গীতে কোথাও কষ্ট হয় নাই, অনেক ভাষা শিখিয়াছি। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে আমরাই এই কাজ করি।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সুরসিক খালাসী সজ্জনের সৎসংসর্গ লাভ করিয়া কিছুক্ষণ আমোদ উপভোগ করিব মনে করিলাম—কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার সহিত কথোপকথনে "ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতি জনরেকা, ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা" এই প্রাচীন শ্লোকের

সার্থকতা সম্পাদন করিব মনে করিলাম—কিন্তু মনের সাধ মনেই রহিল, সে অপূর্ব্ব সাধ মিটিল না। দেখিতে দেখিতে আকাশে মেঘ উঠিল, বিদ্যুৎ চমকিল প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল এবং মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সমুদ্রের তরঙ্গ রাশি তাল বৃক্ষের ন্যায় উচ্চতা ধারণ করিয়া উঠিতে লাগিল আবার নামিতে লাগিল, আবার উঠিতে লাগিল আবার নামিতে লাগিল। জলে ঝড়ে তরঙ্গের আঘাতে আমাদের জাহাজ খানি প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল, আমি বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন ৫টা বাজিয়াছে। আকাশে আর মেঘ নাই, ভোর হইয়াছে, জল ঝড় থামিয়া গিয়াছে, সমুদ্রও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। জাহাজের এক কোণে মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া করিয়া তদুপরে এক তরুণ বয়স্ক হিন্দুস্থানী ব্রহ্মচারী উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার উন্নত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, পদ্ম-পলাশ লোচন প্রভৃতি ও সুন্দর আকারাদেহ এবং কমল নিন্দিত সুকোমল করদ্বয় অবলোকন করিলে তাহাকে নরাকারে দেবতা বলিয়া বোধ হয়। এমন সুন্দর রূপ আর দেখি নাই। এই বালব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গোস্বামী দেবের সহোদর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিশ্বরূপের মঙ্গল কামনায় তাঁহার পিতা যে শ্লোকের দ্বারা ভগবানের প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইয়াছে—

> আ বয়া নূতনমেব স প্রিয়া,
> বলা কিশি প্রার্থ রতিশ দেব যৎ
> তদা বিধাতঃ করুণা বিধীয়তাং
> সদাত্র ধর্ম্মে নিরতো ভবেৎ যথা॥

জটাজুট ধারী সেই বালক-ব্রহ্মচারী, বীণা হস্তে গান ধরিলেন—

> জাগিয়ে কৃপা নিধান। পন্‌ছি গণ বোলে।
> পূরবে অরুণ উদয়; কমল দল ডোলে॥
> ভোর ভয়ল, মনুয়া জাগল, কোয়েলা দল বোলে।

ভকত চিত, প্রফুল্লিত, পাপিয়া গণ বোলে ॥
জাগিয়ে করুণা নিধান পনছি গণ বোলে ॥ ১
চন্দ্র কিরণ শীতল ভরী, চকই পিয়া মিলন গয়ী,
ত্রিবিধ মন্দ চলত পবন, পল্লব দ্রুম ডোলে ॥
প্রাত ভানু প্রকট ভয়ো, রজনীকো তিমির গয়ো
ভৃঙ্গ করত গুঞ্জ গান, কমল দল খোলে ।
তুলসী দাস অতি আনন্দ নিরখিয়ে মুখার বিন্দ
দীননকো দেত দান ভূষণ বহুমোলে ॥
জাগিয়ে করুণা নিধান পনছি গণ বোলে । ১

সেই দেবোপম সুকণ্ঠ সাধুর অতীব মনোমোহন সুস্বর অর্দ্ধ প্রভাতী এবং অর্দ্ধ ভৈরবী রাগিনীতে বিমিশ্রিত হইয়া শোভাময় শরতের প্রভাত সমীরণের সহিত মিশিয়া মিশিয়া সুবিশাল সুন্দর সাগরের নীলোর্ম্মিমালার সঙ্গে তালে তালে নাচিতে লাগিল। সা রি গা মা সিক্ত সেই সুস্বর দিকদিগন্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয় আকাশ ও পাতালকে মাতাইয়া জাহাজের আরোহী বৃন্দকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল। সঙ্গীতের কি অসাধারণ ক্ষমতা। সঙ্গীতে যাহার চিত্ত দ্রব না হয়, সেই পাষাণ হৃদয় পুরুষকলঙ্ককে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক এইরূপ অনেক সময় অতিবাহিত হইলে, দিবা বেলা দশ ঘটিকার সময় এক স্থানে গিয়া আমাদের কাটোরিয়া নাম্নী বাষ্পীয় তরনী স্থিরভাব ধারণ করিল। এইস্থান হইতে কলাম্বো (Colombo) বন্দর প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। জলের গভীরতার অল্পতা হেতু তথায় জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া নৌকা যোগে কলম্বো বন্দরে উপস্থিত হইতে হব। ষ্টীমার হইতে নৌকায় আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম সেই হোঁগলকুৎকুতেকুলগৌরব—সেই নাবিক কুলধুরন্ধর—সেই ইসলাম আবাসের যথাকুরবি—সেই পূর্ববঙ্গবাসী খালাসীজী অতি নিকটে এক পার্শ্বে হুকা হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সমীপে

আসিয়া খালাসী বলিল "কয়লা মাথাহ। তাড়াতাড়ি করবাননা, সে র আচে দেরি আচে' এই কথা বলিয়া হুক্কা রাখিয়া দিল। ইত্যবসরে আমি সেই শ্রীমাবির শ্রীমূর্ত্তি খানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম, সেই শ্রীমূর্ত্তির মাথায় খেজুব পাতার মত কি পাতায় নির্ম্মিত গোলাকার টুপি, তাহার চারি ধারে কাল ফিতা বাঁধা এবং সেই ফিতার উপরে Katoria শব্দটি স্বর্ণ অক্ষরে বিরাজমান। একটা লাল ফিতা টুপির পশ্চাদ্ভাগ হইতে প্রায় কোমর পর্য্যন্ত লম্বমান। গাযে সবুজ বর্ণের লম্বা কোট্ এবং গলায় রুপার চেইন, বক্ষ স্থলের যে অংশ চেইন (Chain) স্পর্শ করিয়াছে সেই খানে টাকের মত ছোটা কারের একটা মাদুলি এব কালকাপড় দিয়া আবৃত একটা চতুষ্কোণ "তাবিজ (Ialisman)। কোটের চারি দিকে কোমরের ঠিক উপরে একটা প্রশস্ত লাল ফিতা জড়ান আছে, গাত্র ঢিলা পায়জামা তাহা পদতল হইতে অৰ্দ্ধ হস্ত উপরে লম্বমান। ইহার পরে জাহাজী গোবার Sailors) ব্যবহার্য্য বুট পরা আছে। অগ্নিবক্ত চোখে চশমা এবং সম্প্রতি হবা ত্যাগ করায় মুখে Sweet Heart নামক আ র্যবিকা Cigarette শোভমান! বোধ হইল খালাসীজীর সুরাপানাভ্যাস নামক একটি বিশেষ গুণও ছিল। চক্ষুলাল, বদন মণ্ডল সূর্য দগ্ধ (Sun burnt) কৃষ্ণ ব প বপূর্ণ হইলেও এদিবা সুন্দরীর প্রভাবে তৎকালে উজ্জ্বল মধুরে মিশিতেছিল। খালাসীজী বলিয়া উঠিল "কবদা জি। আমার দুর্ভ্রা গাণ শুহনা আপনি বড়ই তাবক কোরছি-লেন কিন্তু আপনাকে তেহন ভাল করিয়া গাণ শুনাইবার ফুরসৎ ছিল না, কেন না খানা পাকাইবার কামছিল। এহন এডা গান শুনাই, শুনবার আগগা হয়। কিন্তু বরাবরি মাফ করণ লাগবে, শুযে শুয়ে নিংস্ব কইবা এবার মু গাণ কবরু। তদনন্তর প্রকৃত প্রস্তাবে পুরে ঘুরে নৃত্য করিতে করিতে সেকালের মুক্তাবক্ষ অথবা নিমশ দাসা করি

ওয়ালীর "কবি-সুরে", সেই রসিক হৃদয়, কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত এই গানটা গাহিতে লাগিল—

"দু কথা শুনিয়ে দিব লো! ও তোর নিঠুর কালা বাঁকা শ্যামে।
সে দিন কি লো নাই কো মনে, ননী চুরি বৃন্দাবনে,
চল বাই বেলা গেল হেরবো শ্যামে রাধার বামে।
দু কথা শুনেয়ে দিব লো! ও তোর নিঠুর কালা বাঁকা শ্যামে॥
কালো কি নয় লো ভালো, কালোতে জগত আলো,
চল সখি বেলা হোলো, হেরবো শ্যামে রাধার বামে॥

পাঠক মহাশয়! সেই অর্দ্ধবৃদ্ধ সুরসিক শ্রীখালাসীজীর সে সময়কার নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি দর্শন করিবার জন্ত যদি আপনি তাহাতে উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে বলিতেন, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য র‍্যাফেলের (Raphael) তুলিকায় অঙ্কিত করিবার যোগ্য!! খালাসীর পার্শ্বে একটা মাদ্রাজী ছোঁড়া ছিল, সে ষ্টিমার-সংলগ্ন বোটে কাজ করিত, তাহাকে Boat boy বলে, সেই ছোঁড়া একটা ভাঙ্গা ডেক্‌চির টুক্‌রা লইয়া তাহার উপরে ছোট একটা যষ্টির আঘাত করিতে করিতে কাঁসির ন্যায় ক্যাংগ ক্যাংগ ক্যাংগ করিয়া যে অপূর্ব্ব আওয়াজ বাহির করিতে লাগিল তাহা শুনিবার যোগ্য বটে। আর সেই স্থূলদেহ শ্রীমান খালাসীজী তাহার কটিদেশের পশ্চাৎ ভাগস্থিত অতি স্থূল মাংস স্তূপের উপরে অঙ্গুলির আঘাত দ্বারা যেরূপে কবি-ওয়ালার মত ঢাক বাজাইতেছিল তাহাও দেখিবার এবং শুনিবার যোগ্য বটে। তেমন অপূর্ব্ব দর্শন, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ভিন্ন কমই দেখা যায়!! আর তৎকালে শ্রীশ্রীমাঝি মহাশয়ের শ্রীমুখবিবর হইতে পলাণ্ডু নামক পদার্থের যেরূপ সুগন্ধি বিনির্গত হইতেছিল এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠদেশের অভ্যন্তর হইতে মধ্যে মধ্যে যেরূপ মহাসুগন্ধিময় পচা লোণা ইলিষ মৎস্যের ঢেকারাবলী (Belchings) সুনিস্সৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে সেই সাগরসলিলোখিত প্রাতঃ-সমীরণের সহিত মিশিতে ছিল, তাহার আর বর্ণনা না করাই ভাল,

কারণ সে অপরূপ বর্ণনা তোমার আমার কলমে শোভা পাইবে না। যাহা হউক, মহাপ্রভুদের নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বন্ধ হইবার পর আমি বলিলাম "ভাল! ভাল! মিঞা সাহেব! তুমি যোগ্য পুরুষ বট হে! হজরৎ! তুমি লায়েক আদ্‌মী বট!" খালাসী অত্যন্ত খুসী হইল, আমিও নৌকায় আরোহণের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম, কিন্তু তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল। খালাসী বলিল আগগে মশয়! যদি এহাবারেই যাইবান্ তো "দোয়া" (আশীর্ব্বাদ) দিয়া যান্, যেন্ এখিবারেই জিন্‌দিগী (জীবন) কাটাবার; সাধু কইচে হেস্তে খেল্যো নওরে যাছ কোন দিন বাবা সিংগ্যে ফুঁক্যো।" এই কথা বলিয়া খালাসীজী আবার বলিল, "আচ্ছা মশয়! আপনে তো মেলা মুল্লুক ঘুরে আইলান্, মেলা বিদ্যা শিখ্যে আইলান্, কন দেহি এই কথাডার মানে কি?——

"এক থাল সুবারি গুণ্‌তে নারে বেপারি"

আমি বলিলাম "মিঞা সাহেব! আমার অত বড় বিদ্যা নাই যে তোমার এই গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করি।" খালাসী বলিল,"কন্‌কি মশয়! আপুন্ হেন পুন্‌ডিৎ আদ্‌মী যদি না পার্‌বা তবে পার্‌বা কোন্ বেড়ো (ভেড়ে)?" এই কথা বলিয়া সে আবার বলিল, আচ্ছা কন্ দেহি এডা কি চিজ্?

"এহান থেক্যে কেল্লাম দরা দরা গ্যেল পচ্চিম পারা।"

আমি বলিলাম "মিঞাজি! আমার বিদ্যে সাদ্যি বড় বেশী নাই।" খালাসীজী বলিল "আগ্‌গে তাই দ্যাখ্‌চি; সাদু (সাধু) বাবার (ভাবায়) আপুনুর দহল খুব ধোঁয়া দেক্‌চি। আচ্ছা, এইবার কন্ দেহি——

দন্ পিঁপি দন্ পিঁপি দলের বিতর বাসা।

আড্ডী নাই উড্ডী নাই, মানুষ খাবার আশা॥"

আমি বলিলাম, না বাবা পারেব না! তখন সে বলিল, পারান্ না মশয়! ওডার নাম "হুঁক"; যারে ইংরাজরা লিচু কয়। আমি

বুঝিলাম এ ব্যক্তি Litches মানে করিতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম "লিচু কাহার নাম ?" খালাসী বলিল "কি আশ্চর্য্য। আব্ আর লিচু ফল কি কখনও খান নাই ?" আমি বলিলাম আব্ কোন জিনিষ ? সে বলিল, "যারে আপনেরা আম কন্।" জিজ্ঞাসা করিলাম "আমরা যাহাকে আম বলি তোমরা তাহাকে আব্ বল কেন ?" সে বলিল, "আমরা প্রায়ই ম রে ব কইয়া উচ্চারণ করি।" আমি বলিলাম "তবে মামাকে কি বলিয়া ডাক ?" এবারে শ্রীমান্ খালাসীজী খুব হাসি হাসিল এবং হাসিয়া আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল "আগ্গে আপুন্গোর সাত্তে কি মুই সব পেব্যে উঠ্বার পারি ?" আমি জয় লাভ করিলাম দেখিয়া খালাসী কিন্তু মনে মনে অপ্রীত হইল, তখন আবার হুকার দিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মশয় ইবারে ইংরাজীতে কিছু কবার চাই, কন্ দেহি এডা কি,—

An old woman that trades in silk,
And eats no food but drinks only milk
She is barren, but has a son,
And her son comes every week from London
She is over ninety but never looks old,
She is neither ice nor snow but is always cold

অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া আমি বলিলাম "হে নাবিককুল ধুরন্ধর। হে নীলোর্ম্মিমালাধিপতি। হে সুদক্ষ কর্ণধার। হে ডিঙ্গি—ডোঙ্গা—বোট্—নৌক—ষ্টিমার—ছত্রপতি অধিশ্বর। তোমার জয় হউক। আমিই হার মানিতেছি, তোমার জয় হউক। ঐ প্রশ্নের উত্তর—

"The wise may answer in a day or two,
The fools cannot answer in years thirtytwo"

শ্রীমান খালাসীজী বলিল "কবরাজী। সেলাম আলেকম", আমি

ঘষিলাম "আলেকম্ সেলাম মিঞাজী !!" সেলাম ও আলেকমের ছড়াছড়ি হইবার পরে আমি পরিত্রাণ-প্রাপ্ত হইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করিলাম। খালাসী আবার সেলাম করিল কিন্তু আমি তাহার কাছে হারি মানিয়াছি এই কথা লইয়া সে বড়ই আস্ফালন করিতে লাগিল। একজন ভদ্রলোক এই তামাসা দেখিতেছিলেন, তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পরাজয় কলঙ্কের বোঝা লইয়া আপনারা লঙ্কায় প্রবেশ করা ভাল দেখাইতেছে না।" আমি তখন শ্রীমান খালাসীকে, নৌকা হইতে হাত তুলিয়া বলিলাম "এইবারে তোমাকে একটা প্রশ্ন করিয়া যাইতেছি; কেয়ামত-কাল পর্য্যন্ত সময় দেওয়া গেল, তুমি ইহার উত্তর লইয়া চিন্তা করিও। আবার দেখা হয়, উত্তর শুনিব। বল দেখি, এই জিনিষটা কি?

তিনবীর, বার শির, বেয়াল্লিশ লোচন
চার জাতি সেনা খোরে, ছেয়ানব্বই ভবন॥
কহ কহ মাধবী লতা হিঁয়াল্লির ছন্দ।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে, পণ্ডিতে লাগে বন্দ।

তখন নাবিকবর বলিয়া উঠিল "কয়দাজী যাতী জান্" যাতী জান্; আসল কাঁদাডা কি জানেন? আমাগোর রইচে দান চাল্ দিয়ে নেকা পরা, আর আপুন্‌গোর রইচে চাঁদনীর ট্যাহা দিয়ে নেকা পরা; চাহের কাচে কি ট্যাম্ টেমি?" তদনন্তর আমি নৌকা যোগে কলম্বোর ঘাটে পৌছিলাম। টোটিকোরীণ হইতে কলম্বো পৌছিতে ঠিক একুইশ ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

আমাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে কলম্বো ঘাটে আমার মাদ্রাজী বন্ধু শ্রীযুক্ত দোরাস্বামন পীলে মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

কলম্বোনগরের প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট (Prince's Street) নামক সুপ্রশস্ত পথের উপরে ইঁহার বাসাবাটী; ইনি সিংহলের একজন সম্মানিত

সওদাগর। নানা কারণে মিত্রবর দোরাস্বামীর বাসাবাটীতে না গিয়া আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত অনরেবল মিষ্টর প্রাগ্‌জ্যোতিষ রমানাথম. (The Hon'ble Mr P. Ramanatham, L. L B.) মহাশয়ের বাটীতে গেল্যাম। মিষ্টর রমানাথম্, * সিংহলের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের কৌন্সিলের মেম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্, এল্, বি, এবং কলম্বো হাইকোর্টের আড্‌ভোকেট্ জেনেরল। সিংহলে ইহাঁর তুল্য সম্মানিত পুরুষ অতিকম দেখা যায়। সিংহলের আইনানুসারে তত্রত্য কোনও বিচারপতি, আড্‌ভোকেট্ জেনেরলের অনুমতি ব্যতীত কোনও আসামীকে সেসন্ সোপর্দ্দ করিতে পারেন না, সুতরাং মিঃ পি রমানাথমের ক্ষমতাও অসাধারণ। কলম্বো নগরের যে মনোমোহন অংশে বন্ধুবরের সুন্দর অট্টালিকা অবস্থিত তাহার নাম "দারুচিনি উদ্যান" ইংরাজীতে ইহার নাম Cinnamon Gardens।

লঙ্কাদ্বীপে আসিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শুনিয়াছিলাম "লঙ্কায় যে যায় সেই রাবণ হয়" কিন্তু এখানে আসিয়া কেহ রাবণ হইয়াছে অথবা রাবণের রাজপ্রাসাদ কিম্বা অশোকবন দর্শন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, সিংহলের লোকেরা রাবণের পঞ্চবটী গমন, সীতা হরণ, শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদনে দুঃখ প্রকাশ, রামরাবণে যুদ্ধ প্রভৃতি শুনিলে উচ্চ হাস্য করে। অনেকদিন হইল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঞ্চি (Congeveram) নগরীতে গিয়া তথাকার লোকদিগকে বিদ্যাসুন্দর শুনাইয়াছিলাম, সেখানকার লোকেও সেইরূপে হাসিয়াছিল। * ভারতবর্ষের লোকেরা বলেন, প্রকৃত সুবর্ণময়ী লঙ্কা এক্ষণে সমুদ্র গর্ভে নিমগ্না এবং রামের বরে বিভীষণ তথায় অমর হইয়া অনন্তকাল রাজ্য করেন। কোনও দেশ বা দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে সুবর্ণময় হওয়া প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ, কারণ মৃত্তিকা তরু, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল, মূল, গিরি, বন এ সকল সুবর্ণময়

* ইহাঁর সহোদর মিঃ অরুণাচলম্ এক্ষণে সিংহল দ্বীপের রেজিষ্টার জেনেরল নিযুক্ত আছেন।

কইতে পারে না; বোধহয় এক সময়ে লঙ্কা অত্যন্ত সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং ছিল—বোধহয় এক সময়ে ইহা প্রচুর পরিমাণে ধনধান্যে পরিপূর্ণা ছিল—তাহাতেই কবির লেখনীতে "সুবর্ণময়ী লঙ্কা" পড়িতে পাই; বিভীষণ কোথায় জানিনা কিন্তু লঙ্কায় এক্ষণে ইংরাজ রাজত্ব করেন ইহা জানি; ঈশ্বর করুন ইংরাজ রাজত্ব তথায় অমর হউক। ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে অনেকের মনে ইহা বিশ্বাস যে, লঙ্কায় রাবণের চিতা বারমাস অহোরাত্রি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; রাবণের চিতার অস্তিত্ব নাই কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে লঙ্কায় ঘরে আগুন লাগিলে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আগুণ নিবেনা একথা সত্য। লঙ্কার ভাষাও রাক্ষসের ভাষা নহে; ইংরাজি বেশভূষা ইংরাজি আচার ব্যবহার এবং ইংরাজি ভাষারও এখানে খুব প্রবলতা দেখিলাম; এই প্রস্তাবে সিংহলী (Singhalese) ভাষা ও সিংহলী সাহিত্যের একটু নমুনা দিতেছি।

বাঙ্গালা—তুমি কি চাও, সিংহলী—বটোনে মনয়াদী। বাং—আমার অবকাশ নাই; সিং—মটে নিবাড়ুয়া নেতে। বাং—কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; সিং—করুণা করলা টাকা কীটেন্দে। বাং—আকাশে মেঘ উঠিল; সিং—টুপগ্গো আবী ইপতী। কতকগুলি শব্দের* সিংহলী প্রতিশব্দ দিতেছি; জাম দাং, অনন্তমূল ইরমত; ইশক্‌গুল কশাকশ; হরিতকী আড়ালু, কন্টকারী কটুরেন বটল; হাঁ অউ; না নেহে; মনুষ্য মিনিকে; ইত্যাদি। সিংহলী অক্ষরগুলি দেখিতে কতক তেলুগু কতক উড়িয়া অক্ষরের ন্যায়। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত অঙ্কগুলি নিয়ে সন্নিবিষ্ট করিলাম; আটটি ভাষার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

| বাঙ্গালা | হিন্দি | পারস্ত | ইংরাজি | লাটিন | গ্রীক | তামিল | সিংহলী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এক | এক | একে | One | Unus | Henos | উনদ | একাই |
| দুই | দো | দো | Two | Duo | Duo | ইরণ্ডু | দেকাই |
| তিন | তিন | সে | Three | Tres | Treis | মুনু | তুনাই |

| চাঁর | চাব্ | চাহাব্ | Four | Quatuor | Tressres | বাদ্ | হাতারাই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পাঁচ | পাঁচ | পনজ্ | Five | Quinque | Pente | আহ্ | পাহাই |
| ছয় | ছ | সব | Six | Sex | Hex | আর | হেয়াই |
| সাত | সাৎ | হপৎ | Seven | Sehten | Hepta | এড | হাতাই |
| আট | আট | হশৎ | Eight | Octo | Okto | এইটচ | আটাই |
| নয় | ন | নো | Nine | Noven | Enea | উনপতু | নাসাই |
| দশ | দশ | দঃ | Ten | Decen | Deka | পত্তু | দহাই |

প্রাচীন সিংহালী ভাষায় কেবল মাত্র ৪২টি অক্ষর ছিল, ঐ ভাষার এক্ষণে প্রচলন নাই, পুরাতন, স্তম্ভ প্রস্তর ইত্যাদি অনুসন্ধান করিলে ঐ ভাষা পড়িতে পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে সিংহলী পণ্ডিতেরা "হিদ্ধান্তসংগর্ভ" নামে ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া বর্ণমালার অনেক পরিবর্তন করেন। এক্ষণে সর্ব্বসমেত ৫২টি অক্ষর আছে, ইহার মধ্যে ৩৪টি ব্যঞ্জন এবং ১৮টি স্বর। বিশেষ্য দুই প্রকার, চৈতন্যবাচক নিংশবণের শব্দ সমূহের শেষে দীর্ঘ ঈ থাকে, বিশেষণের বচনে পরিবর্তন হয় না। রেফ প্রায়ই অব্যবহার্য্য, সংস্কৃত ধর্ম্ম, মার্গ, সূত্র, স্বর্গ, পবিত্র প্রভৃতি শব্দ সিংহলী ভাষায়, ধম, মাগগ, সুৎ সগগ পবিৎ রূপে লিখিত ও উচ্চারিত হয়। বর্তমান সিংহলী ভাষা, পালি ও সংস্কৃত মিশ্রিত। দ্বিতীয় পুরুষে যেমন বাঙ্গালায় তুই তুমি, আপনি, মহাশয়, মহানুভব এবং ইংরাজিতে You You sir, Your Honor, Your Worship, Your Majesty, Your Highness প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় অথবা উর্দ্দুতে যেমন তু, তোম, আপ্, খাঁ সাহেব, জনাব, হুজুর প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পদ ও সম্ভ্রমানুসারে সিংহলী ভাষাতেও সেইরূপ বহুশব্দের ব্যবহার হয়। যথা—

তমা, উম্বা, নম্বা, মোবা, উম্বাচা, উম্বাহে, তামুসে, তামুন্নেহে, তামুন্নাহংসা, নম্বাহংসা, মোবাহংসা প্রভৃতি। বাঙ্গালীদের বাবু হিন্দুস্থানীদের জি, ইংরাজের মিষ্টর শব্দের সিংহলী প্রতিশব্দ মাহাত্তা, বোধ হয় এই শব্দ সংস্কৃত মহাত্মা শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্বকালে সিংহলের

পণ্ডিতেরা ভূর্জ্জপত্র বা তালপত্র ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ২ ইঞ্চি প্রস্থ কাটিয়া তাহাতে গ্রন্থ লিখিত, বাঙ্গালাদেশের প্রাচীনকালে তালপাতার পুঁথির তাহা প্রায় অনুরূপ। উড়িয়াদের মত লোহার খন্তা দ্বারা লিখন কার্য্য সমাধা হইত লেখা শেষ হইলে কয়লা চূর্ণ মাখাইয়া দিলে অক্ষর সমূহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিত অথচ পাতার স্বাভাবিক বর্ণ নষ্ট হইত না। সিংহলী পুস্তক সমূহের প্রথমেই বুদ্ধদেবের স্তব থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের নাম "বাহংসী," ইহা পদ্যে বিরচিত। খৃষ্টীয় ১৮৫৬ অব্দে রাজসিংহের শাসন সময়ে বহুল সিংহলী পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি প্রধান প্রধান * ধর্ম্ম পুস্তকের নাম সন্নিবিষ্ট হইল। ১ ত্রিপিটক ২ পনসীয় পনাশ জাতক পোত্তা, এই গ্রন্থ বুদ্ধের ৫৫০ বার অবতার হইবার কথা লেখা আছে। ৩ মহাজাতক খৃষ্টীয় ১৩০০ অব্দে বিরচিত। গ্রন্থকর্ত্তার নাম পরাক্রম বাহু। ৪ সসাদত ৫ মুবাদেবো ৬ কবীবর ৭ গট্টলা। এই পুস্তকগুলি সিংহলী ভাষায় বিরচিত।

সিংহলে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে। "দীপবংশ" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইহাতে সিংহলের মহাপ্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত এবং তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচারের বিবরণ আছে। "মহাবংশ" খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বিরচিত, ইহা মহাপ্রসিদ্ধ ও মহাপ্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অধ্যাপক টেনেন্ট সাহেব বলেন "It stands at the head of the historical literature of the East" রাজবলীয় এবং রাজরত্নাকর গ্রন্থদ্বয়, অনেক ঐতিহাসিক বিবরণে পরিপূর্ণ। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকও সিংহলী ভাষায় অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহলে সর্ব্ব প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অনেক প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অট্ট কথা, অতুবধাস, দম্বিবা, উমাদব, মিলিন্দাপন্ন সংকমমালঙ্কার, অমাবতার, মলানবংশ প্রভৃতি সিংহলী গ্রন্থ বৌদ্ধমন্দিরে পঠিত হয়। ৪৩২ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ ঘোষ প্রণীত বিশুদ্ধিমার্গ (The path of purity) অতীব

প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ, ইহাতে বহুল নীতি কথা আছে। প্রাচীন সিংহলী কবিতা পুস্তকসমূহ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। পণ্ডিত পরাক্রম বাহু সিংহলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। "কবিশেখর" নামক গ্রন্থ সিংহলী ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য। মহৎমায়া এবং বালাবত্বালা সিংহলের উৎকৃষ্ট স্ত্রী কবি। "Sweetness of veısification and beauty of imagery are considered some of the excellencies of Singhalese poetry." কচ্চায়ন এবং সিদ্ধান্তসংগর্ভ খুব ভাল ব্যাকরণ, বৃত্তমালাখ্যা খুব ভাল অলঙ্কার গ্রন্থ; এবং যোগশতাখ্য, মাধুসী ও যোগরত্নাকরাক্ষ অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। সমগ্র সিংহল দ্বীপে এক্ষণে একলক্ষ ৭৮ হাজার ছাত্র ইংরাজি পড়ে, তথাকার এক গবর্ণর বলিয়াছিলেন "A smattering of English raises men above the employments to which they were born, without fitting them for any other; fills every Government office with noisy applicants for place, and strips the fields of that labour which is the real source of wealth in a countıy, fourfifths of which are still uncultıvated" এই দুর্দ্দশা এক্ষণে সকলত্রই দেখা যায়। এবিষয়ে ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন Be assurd that the wielding of a spade or the driving of a plough in one's own interest is not a whitless honourable than scratching Foolscap with goose quills".

লঙ্কায় চিরকালই বসন্ত ঋতু বিরাজিত। আম, তাল ও নারিকেল বারমাসই এখানে পাওয়া যায়। ম্যাংগোষ্টীন নামে একপ্রকার ফল অতীব সুন্দর, সুস্বাদু এবং মূল্যবান। মৎস্য খুব সস্তা, মাংসও সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে মিলে। সিংহলের যেখানেই যাও নৈসর্গিক শোভায় মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। পর্ব্বত, অরণ্য, তপোবন, উপত্যকা, ফল ফুলের গাছ, নদ, নদী, সাগর, সরোবর, উদ্যান, ঝরণা প্রভৃতিতে

সমগ্র দ্বীপটি অপূর্ব্ব শোভাময়। লঙ্কার আকার ঠিক আম্রের ন্যায় ইহার দৈর্ঘ্য ১৩৫ ক্রোশ, প্রস্থ ১৩০ মাইল, পরিধি প্রায় ৩৮০ ক্রোশ। দারুচিনি ও সুপারি বৃক্ষ সর্ব্বত্রই প্রচুর। দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে যে সকল পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায় তথায় রাবণের দুর্গ ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। সিংহলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের নাম পিদারুৎ লাগলা ইহার সর্ব্বোচ্চতা ৮২৯৩ ফিট; সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদীর নাম মহাবলী গঙ্গা, ইহার দীর্ঘতা ৭৫ ক্রোশ। সমুদয় দ্বীপটি একপ্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত, ইংরাজিতে এই পাথরের নাম Gneiss অর্থাৎ নাইশ। নানা প্রকারের অতীব মূল্যবান রত্ন, মণি, মাণিক্য ও প্রস্তর খণ্ড অনেক স্থানে পাওয়া যায়। অয়স্কান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি যথেষ্ট মিলে। ইংরাজিতে তাহাকে Topaz কিম্বা Cat's Eye অথবা Sapphire কিম্বা Ruby বলে তাহা লঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সিংহল দ্বীপের লোক সংখ্যা ৪৫ লক্ষের অধিক নহে, ইহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু খৃষ্টানের সংখ্যাও খুব বাড়িতেছে, প্রায় শতকরা ৯ জন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। বেদানামক এক প্রকার অসভ্য জাতি অতি পুরাকাল হইতে সিংহলে বাস করে, ইহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা চারি সহস্রের অধিক নহে, ধর্ম্ম, আচার ও ধর্ম্ম বিশ্বাস অনেকটা প্রাচীন হিন্দুর মত। ইংরেজেরা বলেন, খ্রীষ্ট জন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধেরা অদৃষ্টবাদী এবং ভূত, প্রেত, জ্যোতিষ, মন্ত্র, যাদু প্রভৃতিতে খুব বিশ্বাস করে। লঙ্কায় ফিরিঙ্গিদিগকে ইষ্ট-রেশীয়ান বলা হয় না, ইহারা বর্গার (Burghers) নামে খ্যাত। দেশীয়দিগের সহিত ইহারা খুব সদ্ভাবে বাস করে, ইহাদের কন্যা পুত্রদের সহিত লঙ্কাবাসী বৌদ্ধদের বিবাহাদি হইয়া থাকে। সিংহলের ষষ্ঠাংশমাত্র আবাদী (cultivated) বাকি জঙ্গল ও পাহাড় কিম্বা পতিত জমিতে পূর্ণ। নারিকেল তৈল ও মদের ব্যবসায়ে অনেক টাকা উপার্জ্জিত হয়। সিংহলের শাসন কার্য্য একজন গবর্ণর এবং দুইটী কৌন্সিল দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।

লঙ্কার সর্ব্বপ্রধান সহরের নাম কলম্বো, ইহাই সিংহল দ্বীপের রাজধানী। এই নগরে টাওয়ার (Tower) লাইট হৌস Light house) কেল্লা (Fort) কুইনস হৌস, (Queen's house) সওদাগর দিগের দোকান কাছারী প্রভৃতি দেখিবার যোগ্য। তদ্ভিন্ন এখানকার সুন্দর বন্দর, উল্ফান্দল নামক ওলন্দাজদিগের গির্জা সুপ্রীম কোর্ট পেটা হ্রদ, গোলাম দ্বীপ (Slave Island) সেন্ট টমাশ কলেজ এবং কেথিড্রাল অনেকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। কলম্বোর লোক সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। সিংহলের রেলওয়ে লাইন অতীব সুন্দর, সমুদ্রের ধারে ধারে এই লাইন মঙ্কানা হইতে গল বন্দর পর্য্যন্ত প্রকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে Sea coast line বলে, ইহাতে প্রায় ৩২টি ষ্টেশন আছে। হুর-আনিয়া নামক স্থানে অনেক প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অশোক বন ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। রত্নপুর নামক জেলায় নানাপ্রকারের রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জেলার একটী স্থানের নাম "রক্ষঃবন" অর্থাৎ রাক্ষসোদ্যান। রত্নপুরের উত্তরপূর্ব্ব দিকে আদমগিরি (Adam's Peak) নামক পর্ব্বতে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়। হিন্দুরা ইহাকে "শ্রীপদ", মুসলমানেরা ইহাকে "আদমপদ চিহ্ন" এবং বৌদ্ধেরা "গৌতমপদ" বলিয়া অভিহিত করে। সুতরাং এই তিন প্রকারের বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দিগের নিকটে ইহা পবিত্র তীর্থ স্থল। পৃথিবীর আর কোনও স্থলে একই তীর্থকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এরূপ ভাবে সম্মান করে না। লঙ্কার আদমগিরি এবং গল (Galle) বন্দর বড় প্রসিদ্ধ স্থান। প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বর্ষ হইতে গল বন্দর পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত। চল্লিশ হাজার লোক এখানে বাস করে এবং পৃথিবীর নানাস্থান হইতে এখানে নানাপ্রকারের মাল আমদানী ও রপ্তানী হয়। ওলন্দাজদিগের নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। গল হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে কাশগলা নামক গ্রামে অসংখ্যাসংখ্য রোটি বৃক্ষ (Bread-

Fruit Trees ) দেখিতে পাওয়া যায়। কলম্বো হইতে রেলওয়ে যোগে ৩৫ ক্রোশ দূরে কাণ্ডিনগরী অতীব মনোহারিণী। ইহার পার্শ্বস্থ হ্রদের শোভা বর্ণনাতিরিক্ত। এখানকার গবর্ণমেন্ট হাউশ, লঙ্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। দলাদা মালিগবা নামক প্রাচীন বৌদ্ধ রাজাদিগের প্রাসাদ, কুইন্‌স্ হোটেল, বৌদ্ধ কলেজ, বৌদ্ধ দন্তমন্দির, উপত্যকা প্রভৃতি এখানকার দর্শনীয় পদার্থ; দুই ক্রোশ দূরে পেরাদানীয়া নামক স্থানের বোটানিকাল গার্ডেন দেখিবার যোগ্য। মাতুরেতার পর্ব্বত-উপত্যকা এবং রাম্বোদার জলপ্রপাত অতীব নয়নানন্দদায়ক। কাণ্ডি হইতে উত্তর পূর্ব্ব কোণে প্রায় অৰ্দ্ধশত ক্রোশ দূরে অনুরাধাপুর নামক স্থানে অনেক দেখিবার জিনিস আছে। লোয়া-মহা-পায়া নামে এক পুরাতন রাজ-প্রসাদ পিতলের নির্ম্মিত, ইহাতে এক সহস্রাধিক স্তম্ভ আছে; প্রায় দুই সহস্র বর্ষের প্রাচীন একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ৩০ ক্রোশ দীর্ঘ; মিহিন্তালী পর্ব্বতের মন্দির ও খুব আশ্চর্য্য জনক, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পদার্থের নাম "বুদ্ধ-বট", এই স্থানে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে, বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেব এক সময়ে এই বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। প্রতি মাসে দলে দলে অসংখ্য যাত্রী এই বৃক্ষের পূজা করিতে আইসে। ত্রিনকমলী নাম্নী নগরীতে সুন্দর কেল্লা এবং বন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে যুদ্ধের জাহাজ আসিয়া বিশ্রাম করে। মান্নার দ্বীপকে খৃষ্টানেরা খুব মান্য করে, কারণ জেভিয়র নামে এক পাদ্রী সর্ব্বপ্রথমে এই ক্ষুদ্র দ্বীপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। মান্নার হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ১৬ ক্রোশ মাত্র, ইংরাজিতে ইহার নাম Adam's Bridge.

বৃটীশ-শাসন স্থাপিত হইবার পরে লঙ্কাদ্বীপে টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, পোষ্টাফিস প্রভৃতির সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। সিংহলে ভ্রমণকারী (Travellers) দিগের একটা খুব সুবিধা আছে, এরূপ সুবিধা ভারত-বর্ষে নাই, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও দেশে নাই। লঙ্কায় যে

কোনও ডাকঘরের সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া, যে কোনও ডাকঘর হইতে টাকা লওয়া (withdraw) যাইতে পারে এবং যে কোনও ডাকঘরে আবার টাকা জমা দেওয়া যাইতে পারে। পথিকেরা বিশেষতঃ বিদেশী ভ্রমণকারীরা ভ্রমণ করিতে করিতে লঙ্কাবাসীদিগের একপ্রকার কৌতুকাবহ ও অত্যন্ত হাস্যকর নৃত্য দেখিয়া নিতান্ত আমোদিত হইয়া থাকেন, ঐ অদ্ভূত নৃত্যের নাম "সিংহলী সোনা"। ইহা চক্ষে না দেখিলে ইহার প্রকৃতি বুঝা যায় না, সুতরাং ইহার বর্ণনা করা বৃথা মাত্র। সিংহলের "লঙ্কা" নাম কেবল সংস্কৃত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। তামিলেরা ইহাকে তম্রপানী নাম দিয়াছিলেন বৌদ্ধ রাজারা তাম্রপর্ণী বলিয়া ডাকিতেন। আরব্য দেশের লোকেরা ইহাকে (সারণ) সিরেন্দীপ বলিত, কবিবর মিল্টন ইহাকে তপোবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "Utmost Indian Isle, Taprobane"

বঙ্গদেশের বিজয়সিংহ নামে রাজা লঙ্কা আক্রমণও জয় করিয়া ইহার সিংহলদ্বীপ এই নাম দিয়াছিলেন। রাজা বিজয় 'সিংহ বংশসম্ভূত (Lion Race) এই জন্ম এই দ্বীপের সিংহল নাম হইয়াছিল, সিংহলের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে। শ্রীমন্তসওদাগর প্রভৃতি লঙ্কায় বাণিজ্য করিতে আসিত তাহাও শুনা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর হইতে বিজয়সিংহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমসিংহ পর্য্যন্ত (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ) প্রায় ১৬৬ জন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮১৫ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২০ জন বৃটীশ গবর্ণর এখানে শাসন বিস্তার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষকে যদি ৬৫ অংশে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে সিংহল দ্বীপ তাহার এক অংশ হইতে পারে। ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে লঙ্কা ৩২ ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তিনী নহে। মান্নার ও রামেশ্বর এই উভয়ে সিংহল ও ভারতবর্ষকে সংযোজনা করিয়াছে। রামেশ্বর দ্বীপ পম্বেন নামক সাগরখাড়ির উপরে অবস্থিত, দক্ষিণাবর্ত্তের ভাষায় পম্বু

অর্থে সর্প বুঝায়, এই স্থানটি সর্পের ন্যায় বক্রাকৃতি বলিয়া পম্বান নাম হইয়াছে। এই স্থানেই রামের সেতুর আরম্ভ, তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে এখনও এক একটা স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। রামেশ্বরে গেলে বালুকা সেতু (The Ridge) এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। সেতুবন্ধ রামেশ্বর একটা বড় জমিদারী, ইহাকে রামনদ এষ্টেট অথবা রামনাথপুর এষ্টেট কহা হইয়া থাকে। ইহার রাজা "সেতুপতি অধিরাজ" নামে প্রসিদ্ধ। রামনাথ হইতে পলবন্দর পর্য্যন্ত সাগরের অনেক স্থানে প্রচুরপরিমাণে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্তা কিনিতে আসিয়া পণ্ডুকাভ্য রাজার পৌত্র মহারাজা তিষ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় ১৫০৫ অব্দে আগসিদা নামক জনৈক পর্টুগীজ বীর সিংহল আক্রমণ করেন, ওলন্দাজেরা রাজসিংহের শাসনকালে সিংহলে উপনীত হয় এবং ইংরাজেরা ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্কায় প্রথম আগমন করেন।

সিংহলে স্ত্রীলোকের সতীত্বের মূল্য দুই আনা মাত্র; এখানে সতী স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। পুরুষেরা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী এবং কুসংস্কারাপন্ন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জুতা পরিধানপ্রথা অতি অল্পদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ভাতই প্রধান খাদ্য, রসুই করিবার সময় স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই কথা কয় না। বিবাহ প্রথা অতি জঘন্য, বিবাহ একটা চুক্তি (Contract) মাত্র। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান এই সমুদয়ে পরস্পরে বিবাহ হয়। গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী অফিসে নাম লেখাইলেই বৌদ্ধের বিবাহ হইল! মৃতদেহ দাহ অথবা সমাধি হইতে পারে, কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে রাজা তৃতীয় জর্জ্জের শাসনকালে বিক্রমসিংহ নামক সর্ব্বশেষ বৌদ্ধ রাজার অধঃপতনে সমগ্র সিংহলে বৃটীশ ধ্বজা উড্ডীয়মান হয়। এখন সিংহলে প্রায় পঞ্চ সহস্র ইংরাজ আছেন। বর্গার নামক কিরিঙ্গিরা এক্ষণে সংখ্যায় প্রায় বিশ সহস্র। সার ইমার্শন টেনেন্ট নামক জনৈক

সুপ্রসিদ্ধ লেখক (vol I I p 156) ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"These (Burghers) have risen to eminence at the Bar and occupied the highest positions on the Bench. They are largely engagd in mercantile pursuits, and as writers and clerks they fill places of trust in every administrative establishment from the department of the Council Secretary to the humblest police court It is not possible to speak too highly of the services of this meritorious body of men, by whom the whole machinery of Gevernment is put into action under the orders of the Civil Officers They may fairly be described in the language of Sir Robert peel, as the brazen wheels of the executive which keep the golden hands in motion" ইউরোপীয় রক্তের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ আছে বলিয়া ফিরিঙ্গির এত প্রশংসা ও সম্মান !! ফিরিঙ্গির hundreth dilutionএ জন্ম হইলেও তথাপি সে ইউরোপীয়বংশজাত বলিয়া অভিমান করে। মুসলমান-শাসনকালে, হিন্দু ও মুসলমানে অপত্য জন্মিলে তাহাকে "বদ্‌জাৎ" "খচ্চর" প্রভৃতি বলিয়া তুচ্ছ করা হইত। খ্রীষ্টীয় ১৮৯১ অব্দে সিংহলদ্বীপে প্রায় ৩ লক্ষ খৃষ্টান, ১৮ লক্ষ বৌদ্ধ, ৭ লক্ষ হিন্দু, দুই লক্ষ মুসলমান এবং দুই লক্ষ ছয় হাজার অপরাপর জাতি বাস করিত। বৃত্তি (Occupations) অনুসারে নিম্নলিখিত লোক সংখ্যা খুব প্রয়োজনীয়—

| | | | |
|---|---|---|---|
| গবর্ণমেণ্টের চাকুরে | ১৪,৮৭২ | ব্যবসায়ী | ২০৭৭২ |
| খ্রীষ্টীয় পাদ্রী | ৪২২ | গো-শকটবান্ | ১০০০০ |
| বুদ্ধপুরোহিত | ৬২৮০ | কৃষক | ৫৬০১৯২ |
| হিন্দুপুরোহিত | ১৪৯৩ | মজুর | ১৮৯৫২৯ |
| মুসলমান মোল্লা | ৫২০ | ধীবর | ২১০২৩ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসক | ৪০০০ | মজুর | ১৮৯৫২৯ |
| ভূতের মন্ত্র বাণক | ১৭৩২ | শ্রীকর | ২১০২৩ |
| শিক্ষক প্রভৃতি | ৩৮৪৬ | তাড়ি প্রস্তুতকারী | ৪২৮০ |
| জ্যোতিষিক ওঝা | ২২৯ | সূত্রধর | ১৫৫৭৭ |
| গার্হস্থ চাকর | ৪৮,২৭৬ | মিস্ত্রী | ৬০১২ |
| নাপিত | ১৯৯৭ | রজক | ১৮২৯৮ |
| কেরাণী | ২৮৯৮ | বেতের কারিকর | ১৪৮৭১ |
| বাজারওয়ালা | ১৬৫৭৫ | স্বর্ণকার | ৭৩৭৪ |
| ব্যবসায়ী | ২০৭৭২ | কর্ম্মকার | ৫৪০৭ |
| গো শকটবান | ১০০০০ | সাহেবদের কুলী | ৮৭২৩৬ |
| কৃষক | ৫৩০১৯২ | | |

এই তালিকায় দেখিবেন সিংহলে ভূতের ওঝার সংখ্যা ১৭৩২ এবং যাহারা সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য গণনা করিয়া দেয় তাহাদের সংখ্যা ২২৯ জন। এই জন্য একজন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন—

'Demon worship is the religon of savages The extent to which it prevails among the Sinhalese shows their low state of civilization * * * Under all the icy coldne s of this barren system (Budhism) there burn b low the unextinguished fires of another and Darker superstition, whose flames overtop the icy summits of the Budhist philosophy, and excite a deeper and more reverential awe in the imagination of the Sinhalese'

সিংহলী বৌদ্ধেরা দেবতাদের বিশ্বাস করে, তাহাদের ভাষায় দেবতারা 'দেবো' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লঙ্কায় প্রায় সার্দ্ধ ছয় সহস্র বৌদ্ধপুরোহিত আছে ইঁহাদের পরিচ্ছদ চুরিত্রা বা এর বুক, ঐ রং এর জামা এবং দোপাট্টা (চাদর)। মস্তক

অনাবৃত, গোঁপ বা দাড়ি থাকে না। ইহাদের সকলেরই হাতে একটা কল্পিয়া পাথা (Fan) থাকে। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা অশিক্ষিত, কু সংস্কারাপন্ন, মাংসাশী, মদমত্ত, লোভী এবং যথেচ্ছাচারী। ইহাদের সংসর্গ সুখকর নহে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধের মন্দিরে গিয়া নিম্ন লিখিত তিনটি মন্ত্র দ্বারা বুদ্ধের পূজা বা ধ্যান করে—

১। অহং বুদ্ধম শরণং গচ্ছামি
২। অহং ধম্মম শরণং গচ্ছামি
৩। অহং সংঘম শরণং গচ্ছামি

অর্থাৎ "আমি বুদ্ধের, বৌদ্ধধর্মের এবং বৌদ্ধ পুরোহিতের আশ্রয় অবলম্বন করিলাম।" বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে কোন প্রকার ট্যাক্স দিতে হয় না, কিন্তু প্রজাদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেন্ট প্রতিবৎসর গড়ে (প্রত্যেকের) তিনটাকা হিসাবে কর গ্রহণ করেন। কাণ্ডি-নগরীর "বৌদ্ধ দন্ত মন্দির দেখিবার জন্য অসংখ্যাসংখ্য লোক যাতায়াত করে।

লঙ্কার দেশীয় (Native) লোকদিগের মধ্যে অনরেবল ডি শৈশার বংশ, মিষ্টার ডি বাজপক্ষ, মিষ্টার পি বমানাংম মিষ্টার অবণাচংম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইংরাজদিগের মধ্যে লিপ্‌টন্ কোম্পানী, সাহিত্য জীবি ফার্গুশন সাহেব এবং কাণ্ডি কুইনস হোটেল কোম্পানী খুব বিখ্যাত। কিন্তু লঙ্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী এবং সম্পত্তিশালীর নাম সি, এইচ্, ডি, শৈশা, ইনি বৌদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যুবা বয়স খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার বিস্তৃত জীবন চরিত ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠক তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। সমগ্র আসিয়া খণ্ডে দেশীয় খ্রীষ্টানের মধ্যে শৈশার তুল্য ধনী কেহই হয় নাই, দেশীয় খৃষ্টানেরা প্রায়ই দরিদ্র ও কাঙ্গাল কিন্তু শৈশা অত্যন্ত ধনী এবং অত্যন্ত সম্পত্তিশালী। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল খুব প্রসিদ্ধ, ইঁহার পিতা কলম্বো নগরে একজন

বিশিষ্ট সওদাগর। ধর্ম্মপাল কলিকাতা নগরীতে মহাবোধী সভা ও মহাবোধী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ●

লঙ্কাদ্বীপে তামার পয়সা চলে কিন্তু সে পয়সা ভারতবর্ষের পয়সার মত নহে। ইহার নাম "সেন্ট" (cent), আকৃতি অর্দ্ধপয়সার মত, এক টাকায় একশতটা পাওয়া যায়। ইহার একদিকে নারিকেল বৃক্ষের প্রতিকৃতি, অপর দিকে মহারাণীর মুখ। লঙ্কায় ভারতবর্ষের ইংরাজি পয়সা চলে না।, কিন্তু ইংরাজি টাকা আধুলি, সিকি ও দুয়ানি চলিয়া থাকে। সিংহলী বৌদ্ধেরা মাথার চুলে চিরুণী ব্যবহার করে। ইঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির নামের প্রথমে খ্রীষ্টীয় নাম ব্যবহৃত হয়, তদ্যথা —উইলিয়ম দিবাকর, ফ্রেডরিক উডর খেশব, হেনরি ডি রোজা সভাপতি, রিচার্ড চাল্‌স চন্দ্রধবাকর প্রভৃতি। বিদেশীর শাসনের এইরূপ ফলই হইয়া থাকে। বিদেশীর শাসনের অধীনে সিংহলের বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া, আহার, পরিচ্ছদ, সামাজিক-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে এক প্রকার অদ্ভুত 'খিচুড়ীর" মত হইয়া গিয়াছে।

যাহারা জাতিভেদ মানে না, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না, যথেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করে তাহাদের পক্ষে সিংহল ভ্রমণ অসুবিধাজনক নহে। সিংহলী বৌদ্ধেরা মেথর, মুচি হাড়ি, ডোম মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিরই হাতে খায়। গো, গোবৎস বলদ ষাঁড়, ছাগছাগী, মেষ, মহিষ, মোরগ, মুর্গী হংস, হরিণ, শূকর শূকরী প্রভৃতি যাহা কিছু পাও, লঙ্কার বাঙ্গস প্রকৃতিক বৌদ্ধেরা তাহাই গলাধঃকরণ করিবে। বর্ষাকালে বড় বড় ব্যাঙ (ভেক) ধরিয়া ঝাল, ঝোল, ভাজা, অম্বল, চড়চড়ি বাঁধিয়া ইহারা ভক্ষণ করে। স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে, লঙ্কার বৌদ্ধেরা উড্ডীয়মান পদার্থের মধ্যে ঘুড়ী (Paper kite) আর চতুষ্পদের মধ্যে খট্টাঙ্গ (খাট) খায়না, তদ্ভিন্ন ইহাদের অখাদ্য আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। গাঁজা, চরস, আফিম, মদ, গোগ্না, গুলি, চণ্ডু, মাজন, মদক, তামাক, চুরুট, সিগারেট্

সোনার জাক্কী, পিঁড়ি বকুয়া, প্রভৃতি নেশার দ্রব্য কিছুই ইহাদের নিকটে অব্যবহৃত নহে, নেশার মধ্যে সাপের বিষ (হলাহল) বোধ হয় বাকি থাকে।। অনেকে বলে লঙ্কার স্ত্রীলোকেরা রূপবতী ইহা মিথ্যা কথা। লঙ্কার মেয়েদের Graceful ap pearance নব বসন্তে যেমন পতিত খো ভাগাড়ও একটু ভাল দেখায় যৌবনে সিংহলের মেয়েগুলোও তেমনি একটু ভাল দেখায় মাত্র। যৌবনে কুকুরী আর শূকরীও ধন্যা হয় ( Blessd is the bitch in her youth ) এই হিসাবে যৌবনকালে লঙ্কার বাজসিনীকুল ধন্যা। কিন্তু মিথ্যা কথা আকাশের মেঘ প্রভাতের কোয়াসা আর নারীর যৌবন কতক্ষণ থাকে? লঙ্কার মেয়ে, স্বভাবে চরিত্রে এবং চেহেরায় এখনও রাক্ষসী।

লঙ্কার বৌদ্ধেরা খৃষ্টান মুসলমান পার্শী বৌদ্ধ ফিরিঙ্গি কাফ্রি মূর প্রভৃতি প্রায় সকল জাতিরই কন্যাকে বিবাহ করে এবং সকল জাতিকে কন্যা দেয়। হিন্দুরা অবশ্য এই যথেচ্ছাচারীদিগের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন না। বৌদ্ধ বিবাহ প্রকৃত বিবাহ নহে ইহা একটা Contract (চুক্তি) মাত্র। ইউরোপীয় জাতির সহিতও বৌদ্ধদিগের প্রায়ই বিবাহ হইয়া থাকে। লঙ্কার বৌদ্ধের বেশভূষা ইউরোপীয়ের মত যাহারা একটু প্রাচীন মতের পক্ষপাতী তাহারা পান্টালুনের উপরে ক্যাম্বানী পরে এই ক্যাম্বানীর আকার বস্তু গাবোছার মত। সিংহলীরা যেমন ঘোরতর মাংসাশী তেমনি ঘোরতর মদ্যপায়ী এবং তেমনি ঘোরতর ব্যভিচারী ও যথেচ্ছাচারী। এমন "গলিজ" (Dirty) জাতি বোধ হয় পৃথিবীতে নাই, ইহাদের পাকশালা দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবীর সমুদয় মলিনত্ব এই খানে আসিয়া হইয়া একত্রিত হইয়াছে। ইহাদের আচার বিচার ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতি ঘোরতর ম্লেচ্ছ জনোচিত এবং রাক্ষসিক। এমন unnecessarily degenerated এবং Denationalized ও Effiminate জাতি পৃথিবীতে কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান, রা ধর্ম্ম বিশ্বাস

ইহাদের আদৌ নাই, তাহা না থাকিবারই কথা, কারণ বুদ্ধের অথবা তাঁহার শিষ্যেরা যাহা প্রচার করিয়াছেন, কিম্বা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা "ধর্ম" (Religion) নামে গণ্য হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম একটা ফিলসফি (Philosophy) মাত্র, ইহা রিলিজন (Religion) নহে, এই জন্ত বৌদ্ধদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক পুরুষ, (Spiritual Man) নাই। বুদ্ধদেব যাহা শিখাইয়াছেন, লংহলের বৃদ্ধেরা তাহার এক তিল প্রমাণও মানে না এবং একতিলও কার্য্যে পরিণত করে না। অর্থোপার্জ্জন, সুন্দরী স্ত্রীলোকের সহবাস, মদিরাপান মাংস ভক্ষণ, বিলাস সম্ভোগ প্রভৃতিই ইহাদের জীবনের কার্য্য। দয়া, স্নেহ, পরোপকার, সহানুভূতি, আতিথেয়তা, সততা, সাধুতা এই সকল ইহাদের নিকটে অজ্ঞাত। পরকালে ইহাদের বিশ্বাস নাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ইহাদের বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রে ইহাদের বিশ্বাস নাই,—বিশ্বাস আছে ভূতে, প্রেতে, সয়তানে, মদের বোতলে, গো শূকরের মাংসে আর যে কোন উপায়ে অপরের ধন লুণ্ঠনে।। সমুদয় জাতিই নাস্তিক, সমুদয় জাতিই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য, যাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে না দেখিয়া তাহাদের সহিত সহবাস না করিয়া তাহাদের দেশে ভ্রমণ না করিয়া, কেবল বুদ্ধের নাম শুনিয়া অথবা এই বেজিতে কিম্বা বাঙ্গালায় বুদ্ধদেবের দুই চারিটা কথা পাঠ করিয়া বুদ্ধদেবের, বৌদ্ধধর্ম্মের অথবা বৌদ্ধ জাতির প্রশংসা করে তাহারা অতীব ভ্রান্ত এবং ধর্ম জগতের মহাবৈরী। জগতকে সভ্য, উন্নত, শিক্ষিত এবং ধর্ম্মজ্ঞানী করিবার সামর্থ বৌদ্ধধর্ম্মের ছিল না এবং এখনও নাই, যেধর্ম নাস্তিকতা, যথেচ্ছাচারীতা, ক্রিয়াহীনতা, অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা শিক্ষা দেয় তাহা প্রকৃত ধর্ম নহে, ধর্মের নামে দুষ্ট স্বার্থ সিদ্ধির একটা অন্যায় উপায় মাত্র।

লঙ্কার যে কোনও নগর, উপনগর বা গ্রামে যাও যে কোনও বাজার বা হাটে যাও সেখানেই গরু ও শূকরের মাংস বিক্রয় হইতেছে দেখিতে পাইবে। বড় বড় রাস্তা ও গলির ধারে গরু, বাছুর ও শূকরের মাথা

ঝোলান আছে দেখা যায়। এই দৃশ্যে গোখাদক বৌদ্ধ খৃষ্টান বা মুসলমানের আনন্দ হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর প্রাণে ইহাতে অতীব ব্যথা জন্মে। পঁচা গোমাংস বা শূকর মাংসের দুর্গন্ধে বাজারে ভূত প্রেতগণও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। বৌদ্ধের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান কখনই মিলিতে মিশিতে পারিবে না, সর্ব্বখাদক খৃষ্টান ইহাদের সঙ্গে মিলিতে পারে এবং স্বধর্ম্মে মিলাইয়া লইতে পারে। সিংহল দ্বীপ দেখিতে অত্যন্ত শোভাময় কিন্তু বৌদ্ধ জাতি দেহে ও মনে অতীব অপরিষ্কার। লঙ্কায় বাঙ্গালী হিন্দুর ভ্রমণ বড়ই কষ্ট কর বড়ই অসুবিধা জনক। লঙ্কায় ভ্রমণ করিলে বাইবেলের Psalms পুস্তকের একটি কবিতা মনে হয় —' A fool hath said in his heart that there is no God" অর্থাৎ নির্ব্বোধে বলে জগতের ঈশ্বর নাই।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

---

# গোঁসাইজীর ছুচ্।

' What's the true test of living ?
A life that's spent in giving

*—Alia Ki ,*

প্রভুপাদ গোবর্দ্ধন গোস্বামী মহাশয় বর্ণে ব্রাহ্মণ কর্ম্মে সাত্ত্বিক জন্মে বাঙ্গালী, এবং ধর্ম্মে বিশিষ্ট হিন্দু। তাঁহার সুন্দর ও সাত্ত্বিক দেহে নবীন বয়সে, যৌবনের মনোমোহিনী ছায়া পতিত হইয়া অপূর্ব্ব উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছে। সুঠাম মস্তকের সুচিক্কণ কৃষ্ণকেশগুচ্ছের মধ্যে টিকি লম্বমান, গলায় হরিনামের মালা, গাত্রে নামাবলী, ভালে তিলক এবং হস্তে অবয়াল (ছাতা)। তিনি শিষ্যবাটী হইতে স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালায়

বিদগ্ধ হইয়া প্রান্তরস্থিত তরুতলে উপাবেশন করিলেন। ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেহ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইলে, অদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ঢাক ও ঢোলের উচ্চ বাদ্যধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, বোধ হইল, সেই গ্রামের ঢাকীরা বাজাইতেছে—

তাবতা গুড়ুম   তাকৃতা গুডুম গুড়ুম গুড়ুম।
গোবব গুড়ুম, তাকৃতা গুডুম, কুড্‌তা কুড্‌তা গুড়ুম গুডুম॥
ইত্যাদি।

তরুতল পবিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় সেই বাদ্য ধ্বনিময় গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঢাকীরা কহিল, 'ঠাকুর গো। এই গ্রামে অনেক ধনবান লোক বাস করে সত্য কিন্তু গ্রামের সকল লোকই অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী ও কৃপণ। এ গ্রামে মহাশয়ের মত গোস্বামীর পক্ষে আশ্রয় লাভ করা সুকঠিন হইবে। ঠাকুর কহিলেন, আমি শিষ্যবাটী হইতে স্বগৃহে যাইতেছি পথিমধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হওয়ার কেবল অদ্যকার দিবসের জন্য একটু বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করি। রাত্রি প্রভাত হইলেই স্বগ্রামে গমন করিব, বিশেষত: এই প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রৌদ্রে পথ চলা অত্যন্ত কষ্টজনক।" ঢাকীরা বলিল তবে আপনি মাধবচন্দ্র বাবুর বাটীতে গমন করুন তিনি জাতিতে কুম্ভকার এবং এই গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনবান পুরুষ। কিন্তু ঠাকুর গো। সে বেটাও ভয়ানক পাপী, তাহার মত মিথ্যাবাদী পরশ্রীকাতর এবং ভয়ানক কৃপণ এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। যাহা হউক সেইখানেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন। বাদ্যকারীবৃন্দের কথা শুনিয়া, গোস্বামী মহাশয় মাধব কুম্ভকারের বাটীতে গমন করিলেন।

মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়া, মাধব কুম্ভকার বহির্বাটীতে উপবেশনপূর্ব্বক ধূমপানের সুখসম্ভোগ করিতেছে এমন সময়ে গোস্বামীকে তাঁহার বাটীর অভিমুখে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তির

সহিত মনে মনে ভাবিল "কি উৎপাত। এমন সময়ে, এই প্রচণ্ড মধ্যাহ্নকালে, কোথা হ'তে এই একটা লক্ষ্মীছাড়া অতিথি এসে উপস্থিত হ'লো? নিশ্চয়ই এই বেটা পাকের জন্ম চাউল, ডাউল, প্রভৃতি প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ॥" দেখিতে দেখিতে গোবর্দ্ধন গোঁসাই মাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু মাধব একটী কথাও কহিল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁহার উড়ানী প্রসারণ করিয়া এক কোণে উপবেশন করিলেন। এক ঘণ্টারও অধিক কাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি গোসাঁইজী সে স্থান পরিত্যাগ করিল না দেখিয়া মাধব কুম্ভকার মুখ বাকাইয়া কহিল, "ঠাকুর গো। আপনি যাবেন কোথা? আর কখন যাবেন মনে করিয়াছেন?" গোবর্দ্ধন বলিলেন, "বাপুহে। তিন ক্রোশ দূরে আমার গ্রাম, শিষ্যবাটী হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, পথিমধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তোমার বাটীতে এক দিনের জন্ম একটু বিশ্রাম লাভের হেতু আগমন করিয়াছি।" মাধব কহিল, "মহাশয়। আমার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা আর না করা, একই কথা; কারণ আমি অতি দরিদ্র, বিশেষতঃ গত সপ্তাহে আমার এক জ্ঞাতির মৃত্যু হওয়ায় আমরা সকলে অশৌচ দোষে অশুদ্ধ হইয়া আছি। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে কেমনং করিয়া অশৌচ দোষাত্মক গৃহ হইতে চাউল, ডাউল ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে? আমি তাহা পারিব না, কারণ এই মহাপাপের নিশ্চয় কুফল ফলিবে। আর আপনার ন্যায় গোস্বামী পুরুষের পক্ষেও এবাটী হইতে জল, অন্ন অথবা অন্য কিছু দ্রব্য গ্রহণ করা মহাপবাপ।" গোসাঁই কহিলেন, "বাপু হে। আমি তোমার নিকটে কিছুই চাই না, আমি কেবল অদ্যকার দিনটা এখানে যাপন করিবার জন্য আসিয়াছি মধুখের পুকুরের জল আছে এবং আমার সঙ্গে কতকগুলা ফল ও মিষ্ট দ্রব্য আছে, তাহাই খাইয়া দিন কাটাব।" কুম্ভকার জিজ্ঞাসা করিল "সন্ধ্যা হইলে কোথায় যাবেন?" গোসাঁই কহিল "রাত্রেও এখানে

বিশ্রাম করিব।" মাধব ভাবিল কি সর্ব্বনাশ। এ লোকটা রাত্রেও থাকিতে চায়। চাউল, ডাউল ইত্যাদি কিছু লউক বা না লউক, তামাকুর জন্ত অবশ্যই এ ব্যক্তি অনুরোধ করিবে। তাহা হইলে দেখিতেছি, অন্ততঃ দুই পয়সার তামুক না হইলে ইহার রাত্রি কাটিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহাশয়। আপনার মত অপরিচিত বিদেশীকে স্থান দিতে আমাদের বড় আশঙ্কা হয়, কারণ অল্পদিন হইল মহাশয়ের মত একটা বামুনকে বাত্রে স্থান দিয়াছিলাম, সেই দুষ্টলোক আমাদের প্রায় পনের টাকার জিনিষ চুরি করিয়া পলাইয়াছে। সেই অবধি আমরা আর বিদেশী লোককে বাত্রে স্থান দিই না।" ক্রমে দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই অন্ধকার রাত্রে মাধব কুম্ভকার প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়কে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। গোসাই ঠাকুর, গ্রামের বাহিরে, এক প্রশস্ত শ্মশানোপবিষ্টিত কালীর মন্দিরে শয়ন করিয়া মা জগদম্বার পদতলে রাত্রি যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, স্বগ্রামাভিমুখে গমন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন গোস্বামী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন, 'যদি আমি এতকাল বৃথায় ভগবানের পদারবিন্দ অর্চনা করিয়া না থাকি, যদি আমি এত কাল বৃথায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া না থাকি যদি আমি এত বর্ষ কাল বৃথায় গুরুসহবাস বা বৃথায় তাঁহার কৃপাভোগ করিয়া না থাকি, যদি এক দিনের জন্তও সম্পূর্ণরূপে মন প্রাণ খুলিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত ভক্তিভাবের সহিত ভগবানকে স্মরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অধর্ম্মাচারী, মিথ্যাবাদী, ঘোরতর সংসারাসক্ত এবং ভয়ানক কৃপণ পুরুষ মাধব কুমারকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিব। আমি এই মহাপাপীকে মহাসাধুরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে চাই, আমি এই প্রসিদ্ধ পাপী কৃপণকে দাতারূপে পরিবর্ত্তিত করিতে চাই।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে গোঁসাই ঠাকুর স্বগৃহে উপস্থিত

হইলেন। ঘরে গিয়া রাত্রের ঘটনা কাহাকেও কহিলেন না। নিরন্তর ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতলাগিলেন "হে প্রভো! তুমি আশীর্বাদ কর, হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি আমার মহৎ বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।" বাস্তবিক, ভক্তাধীন ভগবান ভক্ত গোস্বামীর কথা শুনিলেন, মহাপাপী ও মহাকৃপণ মাধব পরিণামে মহাসাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। গোস্বামীর অতুলনীয় আধ্যাত্মিক তেজ ও অসাধারণ বুদ্ধির কথা নিম্নে বিবৃত করিলাম, এই মহাপুরুষের ধর্মতেজে ও ধর্ম বুদ্ধিতে এই অদৃষ্টপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে একবর্ষ কাল অতীত হইয়া গেল। গোস্বামী ঠাকুর এই এক বৎসরকাল মধ্যে তাঁহা'র মাথার কেশ, হাতের নখ, বগলের চুল, দাড়ী বা গোপ ক্ষৌরকারের অস্ত্রে স্পৃষ্ট হইতে দিলেন না। একদিন হঠাৎ গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, ভস্মাচ্ছাদিত দেহে জটাজুট সমাবৃত্ত মস্তকে, কমণ্ডলু ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মাধব কুমারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মাধব তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। কুম্ভকার তামাকু টানিতে টানিতে একটা ব্রহ্মচারীকে ঘরে আসিতে দেখিয়া ভাবিল "কি সর্ব্বনাশ। এ বেটা এখনই গাজার জন্য অথবা সিদ্ধির জন্য পয়সা প্রার্থনা করিবে, তা ছাড়া চাউল, ডাউল ইত্যাদির ত কথাই নাই। কি বিষম বিপদ। কি বিষম উৎপাত!" ব্রহ্মচারী আসিয়া চুপিচুপি এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন মাধবের মুখ হইতে একটা কথাও নিঃসৃত হইল না। কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পরে বহির্বাটীতে আসিয়া ব্রহ্মচারীকে কহিল, "কি আশ্চর্য্য! তুমি এখনও বসিয়া আছ! এ গ্রামে অনেক স্থানে চুরি হইতেছে, পুলীশের লোকেরা বিদেশী অতিথিকে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র পলাইয়া যাও নতুবা পুলীশের সিপাহী আসিয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে।" গোঁসাই কহিলেন, "বাপুহে! আমি অন্ধকার

রাত্রে এখানে থাকিব না, তোমার ভয় বা চিন্তা নাই। আমি যে জন্ত তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং যেজন্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছি, তাহার তুমি কিছুই জান না। তোমার সহিত আমার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বিশেষ গুরুতর গোপনীয় কথা আছে। কথাটা তোমারই মঙ্গলজনক। ঐ কথাটা তোমাকে গোপনে শুনাইয়া আমি চলিয়া যাইব।" ব্রহ্মচারীর গোপনীয় কথায় তাহার কল্যাণ হইবে শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণে মাধব কহিল "ঠাকুর গো। তবে সেই কথাটা এখনই ব্যক্ত করুন না কেন?" ঠাকুর কহিল "না, ভাই, তাহা হইবে না। রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকার সময় যখন গ্রামের সমস্ত লোক নিদ্রিত থাকিবে এবং তোমাদের বাটীর কেহই চেতন থাকিবে না, সেই সময়ে তুমি একাকী আমার নিকটে আসিও তাহ হইলে আমি তোমাকে ঐ কল্যাণকর কথা শুনাইব।" মাধব কুমার দ্বাদশ ঘটিকার জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, ব্রহ্মচারী মহাশয় ভগবানের নাম যপ করিতে লাগিলেন। স্বার্থপুর এবং মহাকৃপণ মাধবের চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

দ্বাদশ ঘটিকার সময়ে মাধব একাকী সেই ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বাপু হে। আমরা ব্রহ্মচারী, যোগবলে আমরা সশরীরে স্বর্গে গমন এবং নরক প্রদক্ষিণ করিতে পারি। সম্প্রতি প্রয়োজন বশতঃ একটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ জন্ত নরকপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন জীর্ণা শীর্ণা অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া কহিল, 'বাবা। আপনি কি সশরীরে পৃথিবী হতে এসেছেন? বোধ হয়, শীঘ্রই মর্ত্ত্যধামে আবার ফিরিয়া যাইবেন। বাবা। অনুগ্রহ করিয়া আমার একটা সামান্ত অনুরোধ রক্ষা করুন।' আমি বলিলাম, "তোমার কি অনুরোধ?" স্ত্রীলোক কহিল, "বাবা। শোধনপুর নামক গ্রামে আমার একমাত্র পুত্র মাধব কুমার বাস করে। আমি দুই বৎসর

হইল মৃতা হইয়া, কর্ম্ম ফলে, নরকে আসিয়া পতিতা হইয়াছি। আমার বস্ত্রখানি এমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং মলিন হইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর ব্যবহার করা যায় না। আমার পুত্রের সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় বিংশ সহস্র মুদ্রা। আমার জন্ত একখানি ধুতি বা শাড়ি পাঠাইতে, কৃপা করিয়া তাহাকে অনুরোধ করিবেন।" এই কথা কহিয়া ব্রহ্মচারী সেই কুমারকে বলিলেন "বাপুহে! তোমার মাতাঠাকুরাণীর জন্ত একখানি বস্ত্র প্রেরণ করা নিতান্তই আবশ্যক। তুমি ধনবান, একখানি বস্ত্রের মূল্য তোমার পক্ষে অধিক নহে, বিশেষতঃ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তোমার জননী এবং বিপদগ্রস্তা। অন্ন বিনা স্ত্রীলোকেরা দুই দিবস কাটাইতে পারে, কিন্তু বস্ত্র বিনা দুই মিনিট কালও যাপন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর।" কুম্ভকার কহিল, 'মহাশয়! আপনি কৃপা করিয়া আমার মাতার অনুরোধ আমাকে শুনাইয়া বাধিত করিলেন, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যাহা হউক, মাতার জন্ত অবশ্যই একখানি কাপড় পাঠাইয়া দিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বাপুহে! কেমন করিয়া নরকপুরে কাপড় খানা পাঠাইবে, বল দেখি শুনি?" কুম্ভকার কহিল, "ঠাকুর গো! ডাকে পার্শেল করিয়া পাঠাইব।" ঠাকুর কহিলেন "বাপুহে! সেখানে ডাক যায় না, সেখানে পার্শেল চলে না।" মাধব বলিল "তবে লোক পাঠাইয়া দিব। গোঁসাই উত্তর দিলেন "সে স্থান বড় বিষম স্থান, সেখানে লোক যাইতে পারে না।" তখন কুম্ভকার কহিল "তবে কি উপায় অবলম্বন করা যায়?" ঠাকুর বলিলেন "তোমার মাতার নিকটে সুতো আছে তুমি একটা ছুঁচ পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে তিনি কাপড় খানি সেলাই করিয়া লইতে পারিবেন।" মাধব কহিল "ছুঁচ কি ডাকে যায়?" গোঁসাই উত্তর দিলেন "না"। কুম্ভকার বলিল "ছুঁচ লইয়া আমার এক কুটুম্বকে আমি পাঠাইয়া দিতে পারি।" গোস্বামী কহিলেন "মানুষ না মরিলে সেখানে যাইতে পারে

না।" কুম্ভকার বলিল "ঠাকুর গো। আমাদের গ্রামে প্লেগে অনেক লোক মরিতেছে, এই বার যে প্রথম মরিবে, তাহার হাতে ছুঁচ পাঠাইয়া দিব।" গোঁসাই কহিলেন "কেমনে পাঠাইবে? সে ত মৃত।" কুম্ভকার বলিল "তাহার কাপড়ে বাঁধিয়া দিব"। ঠাকুর কহিলেন, "দেখিতেছ না, তাহার কাপড় চাদর অধিক কি, অস্থি চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ হইবে, তবে সে কেমন করিয়া ছুঁচ লইয়া যাইতে পারে? বড় লাট বা ছোট লাট সাহেব কিম্বা মহারাজা বা নবাবেরাও ইচ্ছা করিলে সেখানে একটী ছুঁচও লইয়া যাইতে পাবে না। বাপু হে। খালি হাতে জন্মিয়াছ, খালি হাতে মরিতে হইবে।" কথা শুনিয়া মাধবের আক্কেল গুড়ুম হইল, কাতরভাবে বলিল, প্রভো। তবে কি মৃত্যুর পরে একটা ছুঁচও সঙ্গে যাবে না? প্রভো! আমার সম্পত্তির বাস্তবিক বিংশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয়, এই সমুদয় সম্পত্তি কেবল লোষ্ট্রের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে? এক পয়সায় পচিশটা ছুঁচ আছে। ইহার একটা ছুঁচও সঙ্গে যাবে না? গোস্বামী কহিলেন না বাপু। একটা ছুঁচও সঙ্গে যাবে না।" মাধব কুম্ভকারের অন্তরাত্মা চমকিত হইল, তাহার চক্ষু হইতে নিদ্রা দূরে পলাইয়া গেল। এত প্রাণস্পর্শী কথার পরে আর কি পোড়া চোখে নিদ্রা আসে? কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার বক্তাত্মক কবিতা মালায় একস্থলে লিখিয়াছেন—"পয়জার চট চট, কিল্ গুম গুম।

ডাক পাক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥

গোস্বামীর ছুঁচের কথা কুম্ভকারের হৃদয়কে ছুঁচের ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন অনুতাপের শত শত পয়জার (জুতা) এবং শত কিল্ তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে। কুম্ভকার পুনরপি কহিল 'প্রভো! তবে আমার গতি কি হবে?' এবারে তাহার চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, দিব্য চক্ষে যেন সম্মুখে নরকের ভীষণ হুতাশনকে ধূ ধূ করিয়া জলিতে দেখিতে পাইল, বোধ হইল যেন অনন্ত ও জীবন্ত নরক—সর্ব্বগ্রাসী নরক—মুখব্যাদান করিয়া

তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। মাধবের অন্তরাত্মা চমকিল, তাহার হৃদয়ে অধ্যাত্মভাব প্রবেশপথ পাইল।

শরতের শুভ্র আকাশ হইতে মনোহারিণী পূর্ণিমার পূতালোক সেই নবীন ব্রহ্মচারীর সুন্দর ও সাত্ত্বিক বদনোপরে পতিত হইয়াছে। সেই মুখে স্বর্গের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইতেছে, মাধব সেই মুখ দেখিয়া চীৎকারস্বরে কহিল "আমার ঘরে আজি দেবতার আগমন হইয়াছে, এই স্বর্গীয় মুখ মানুষের নহে ইহা সাক্ষাৎ দেবতার মূর্ত্তি।" আবার কহিল "প্রভো। আমার গতি কি হবে?"

বলা বাহুল্য, সেই অনুপম ব্রহ্মচারীর উপদেশে ও সংসর্গে পার্থিব অর্থে ধনবান মাধব স্বর্গীয় ধনে ধনবান হইয়া উঠিল। তাহার সুন্দর স্বভাব, নির্ম্মল চরিত্র প্রকৃত অধ্যাত্ম জ্ঞান এবং ভগবৎভক্তি সমস্ত প্রদেশকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তাহার বদান্যতা সমুদয় গৃহে গার্হস্থ্য শঙ্খবৎ সহস্র কণ্ঠে ঘোষিত হইতে লাগিল। মাধবের মত সে সময়ে পরোপকারী এবং দাতা পুরুষ আর কেহ ছিল না। পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ এবং জলচর জীবদিগকে পর্য্যন্ত মাধব আহার দিতেন।

ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুর পূর্ব্বে, পুত্রদিগকে ডাকিয়া মাধব কহিল আমার গৃহ যেন সকলের পক্ষে আনন্দাশ্রয় হয়, এ গৃহ হইতে কোনও ক্ষুধাতুর বা পিপাসিত ব্যক্তি যেন অন্ন ও জল বিনা নিরাশা বা নিরানন্দে ফিরি না যায়। পুত্র! আমার গৃহের দ্বারে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখ—দানাৎ পরং নাস্তি।

জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিশেষরূপে কহিয়া গেলেন, বৎস! দেখিও আমার বংশে যেন কেহ কৃপণ না হয়। ভাবী কালের নরনারীদিগের মধ্যে যদি কেহ ভগবানকে ভুলিয়া নশ্বর পার্থিব ধনের লোভে কৃপণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কহিও এবং শুনাইও—"মাট্টী হ্যায়, মাট্টী হ্যায়, সাব নেহি কুছ্।
ইয়াদ করো হরদম গোসাঁইজীকি ছুঁছ্।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

# কৈলাসপতি কপিশাঞ্জন।

"জয় মহেশ্বর, শিব জটাধর, ঈশান ঈশ্বর, অজেয় গিরিশ।
হিমাংশু ভালক, মদন-দাহক, মুক্তি-প্রদায়ক, অমর-উমেশ॥
বৃষভবাহন, হর পঞ্চানন, বিজয়ে পালন কর হে ভূতেশ॥"
স্তবন্তি ত্বাং সততং সর্ব্ব বেদা গায়ন্তি ত্বাং গৃহিণো ব্রহ্ম নিষ্ঠাঃ।
নমামঃ সর্ব্বে শরণার্থিনস্ত্বাং প্রসীদ ভূতাধি পতে মহেশ।

প্রাচীন হিন্দুর:পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অমূল্য রত্নরাজির অপূর্ব্ব ও অগাধ ভাণ্ডার স্বরূপ। এক সহস্রাধিক বৎসরের বিদেশীয় শাসনে হিন্দু জাতি হীনবীর্য্য ও হীনসামর্থ্য হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অসামান্য শাস্ত্র-ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্নরাজি এখনও অক্ষয় অব্যয় ও অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অনন্ত :রত্নভাণ্ডার পতিত হিন্দুর পুরাতন প্রখ্যাতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপে বর্ত্তমান। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রকে অসংখ্য আদর্শ মহাপুরুষের অনন্তসাধারণ আদর্শ-চরিত্রের সুবিশাল চিত্রপট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র পবিত্র নরনারীর আদর্শ-চরিত্রের চিন্ময় চিত্রণে পরিপূর্ণ। হিন্দুর সমাজ ও রাজনীতির অধুনাতন অবস্থা অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় অবরুদ্ধ বলিয়া অনুভূত হইলেও এই সকল আদর্শ-চরিত্র তামসময়ী রজনীর তমোমণি ( খদ্যোৎ ) দিগের ন্যায় আশার আনন্দময় আলোককে অক্ষিসম্মুখে আনয়ন করিয়া শুষ্ক শীর্ণ ও মুমূর্ষু হিন্দুকে সজীব সরস ও সচেতন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ বলিয়া বোধ হয়। এই সকল মহাবলী ও মহামতি "মহাপুরুষ" দিগের আদর্শ-চরিত্রকে বর্ত্তমান কালের অধঃপতিত হিন্দুর শিক্ষক ও সহায়ক স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত। ভারতের নরনারীর নয়ন সম্মুখে এই আদর্শ-চরিত্র, অমূল্য জ্ঞান ও অমূল্য শিক্ষার সুন্দর অনুকরণের উপকরণ স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; অজ্ঞ ও অলস ভারতবাসী এই সকল অমূল্য রত্নকে 'হেলায় হারাইয়া' দিনে দিনে হীন ও হেয় হইয়া

পড়িয়েছে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এবং শাশ্বত শাস্ত্রে এই সকল মহাপুরুষের আদর্শ চরিত্রের চিন্ময় চিত্রণ দ্বারা আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস, সাধুতা, দয়া, ধর্ম, পরোপকার আত্মোন্নতি, স্বদেশ প্রেমিকতা, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণতা বিদ্যা, বিনয় গতি মুক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য, সুখ সভ্যতা প্রভৃতির জন্ত আর্য্য মহর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ আদর্শ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্তকে শিক্ষক ও সহায় রূপে অনুকরণ করা আমাদের মৃত দেহে নবজীবন সঞ্চার করিবার অমোঘ, অব্যর্থ ও উন্নত উপায় স্বরূপ। জলে, স্থলে, অরণ্যে পর্ব্বতে, লোকালয়ে নির্জ্জন নিভৃতে, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, প্রাচীন হিন্দু সমাজে আদর্শ চরিত্রের বহুলতা দেখিয়া বিস্মিত হই। বোধ হয় এক সময়ে গ্রামে গ্রামে—গৃহে গৃহে আদর্শ চরিত্রের হিন্দু নরনারীর সংখ্যা সুপ্রচুর ছিল। পাপিষ্ঠ পিশাচ পরিপূর্ণ পঞ্চবটীর মহারণ্যের দিকে তাকাইলে আদর্শ মহাপুরুষ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাই, শ্যামসলিলা যমুনার তটদেশে মোহন মুরলীধারী মহাপুরুষ শ্রীমাধবের মনোরঞ্জন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই, রাজসিংহাসনে যোগীন্দ্র জনক, জন কোলাহলে "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের আহবে মহাবলী অর্জ্জুন নবদ্বীপের নরোৎসাহী নগরে ভক্তির অবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত, অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থতলে ধ্যানমগ্ন ধ্রুব, প্রাসাদ স্তম্ভের পার্শ্বে প্রার্থনাপরায়ণ পবিত্র প্রেমিক প্রহ্লাদ শ্মশান সৈকতে শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র, ঘোর কঠোর পরীক্ষা স্থলে অবিচল প্রতিজ্ঞ দাতা কর্ণ, মহীরুহ মূলে সতী সাধ্বী সাবিত্রী, অনন্ত অশোক অরণ্যে পতিপ্রাণা মা জানকী, কাননস্থ মায়াময় সিংহাসন সম্মুখে ব্রহ্মবাদিনী অজিরাচ্ছহিতা, গুহাগহ্বর-মধ্যে ঋষিকুলমণি বিপ্রশিক্ষক বিপ্রসার, দুর্গম পথে দয়াময় ঠাকুর লক্ষ্মণ, বিশাল বারিধিবক্ষে গো ব্রাহ্মণ ও রমণীরক্ষক ধনুকধারী বাল-ব্রহ্মচারী বৈতাল বিমানপথে দেবগণ সম্মুখে দেববানী, জাহ্নবীর রাজ্য প্রাঙ্গনে—সমরশোভাগারে—বৃত্রাসুর বধে জীবিত শরীরের প্রতি অস্থি দাতা

মহাত্মবদন মরীচি মুনি এবং সাগর-সৈকতে অথবা জলধির তরঙ্গবক্ষে তত্ত্বাধিকরক মহাবলী মহামতি মহাধার্ম্মিক রাক্ষস-বংশ গমনন্দ হনুমান, প্রভৃতি দেবতুল্য "মহাপুরুষ"দিগের আদর্শ-চরিত্রে হিন্দু শাস্ত্রশরীর কি অপূর্ব্ব সুন্দর শোভায় সুসজ্জমান ॥ পাঠক মহাশয়! এবার এক বার কাননের কঠোরতা, নগরের কোলাহল, রণক্ষেত্রের রক্তাক্ত দৃশ্য অথবা সংসারের স্বার্থপর বিরস দৃশ্য হইতে নয়নদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া রজত রংএ রঞ্জিত হিমাদ্রির ধবল শিখরের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি। দুগ্ধফেননিভ হিমাচলের কৈলাস-শিখরে এক আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষের মহামোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন কি? ভারতের সর্ব্ব উত্তর প্রান্তে ভারতের রক্ষকরূপে হিমাচলশিখরে জটাজূটসমাবৃত, দ্বীপিচর্ম্মপরিধীত, ভস্মাচ্ছাদিত দেহী, এক উদাসী মহাপুরুষের জগন্মনোমোহন মূর্ত্তি দেখিতেছেন কি?—এই কপিল-অঙ্গন মহামূর্ত্তির নাম কৈলাসপতি মহাদেব, বৃষভবাহন স্বয়ম্ভূ সাধারণতঃ "শিব" নামে সুপ্রসিদ্ধ। হিমাচলবক্ষ তুষারে আবৃত হইলেও পাদপ ও ব্রততীপুঞ্জে স্থানে স্থানে পরিপূর্ণ। এই মহাকাননের এক দিকে প্রচুর পবিত্র প্রসূনপুঞ্জ সুগন্ধ বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্ত মধুময় করে এবং অপর এক দিকে শবদেহসমাচ্ছাদিত শ্মশান ক্ষেত্রের বৈরাগ্যব্যঞ্জক ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া ভবজগতের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিতে থাকে। এখানে কাহার মৃত দেহ অথবা কাহারই বা শ্মশানকতাহা স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ভিন্ন কে ব ন।। দি ত পারে? এই মহাশ্মশানস্থলের মধ্যভাগে প্রস্তর-বিনির্ম্মিত, ধসুমধুরগন্ধসমাবৃত, পবিত্র আশ্রমাভ্যন্তরে নন্দী ভৃঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া বম্‌ বম্‌ বব ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, কপিলাঙ্গন মহাদেব কি সুন্দর ভাবে সমাবিষ্ট! এই মহামূর্ত্তি দেবতাদিগেরও দেবতা, সেই জন্য তাঁহা দেবাদিদেব মহাদেব নামে প্রখ্যাত। ঋষির মধ্যে যেমন ভৃগু, স্রোতস্বতীর মধ্যে যেমন জাহ্নবী, মহীরুহের মধ্যে যেমন অশ্বত্থ, মুনিদিগের মধ্যে যেমন কপিল, অথবা গজেন্দ্রদিগের মধ্যে

যেমন ঐরাবত, দেবতাদিগের মধ্যে তেমনি কৈলাসপতি কপিশ-অঙ্গজ মহাদেব। এই নাম কি মধুর। এই মূর্ত্তি কি সুন্দর। এই হিমাদ্রি-প্রদেশ কি পবিত্র। মাতৃরূপিণী এই হিমগিরির কোমল ক্রোড়ে উপবেশন করিলে মন প্রাণ শীতল হয়, এইজন্ত বুঝি ইহার প্রাণশীতল-"হিম" নাম হইয়াছে। এই ধবলগিরির কৈলাস প্রদেশে মহাদেব মূর্ত্তি এত সুন্দর এবং এত উচ্চ আদর্শের আদর্শ যে, মানবের কল্পনায় এত সুন্দরতা সহজে আসে না এবং এরূপ "মহাদর্শ" পুরুষের চরিত্র মানবের লেখনীর বর্ণনায় সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইতে পারে না।

হিমালয়বাসী কৈলাসপতি মহাদেব ভারতের কেবল রক্ষক নহেন, এই ধবধূ শঙ্কর ভারতবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ইঁহার শিক্ষকতা ভূতলে অতুল, এমন প্রাচীন ও প্রকৃষ্ট প্রাজ্ঞ ধরাতলে দ্বিতীয়বিহীন। এই দেবাদিদেব মহাদেবের জ্ঞানবত্তা মহাসাগর হইতেও মহাগভীর ইঁহার জ্ঞানের প্রশস্ততা ক্ষীরোদসাগরাপেক্ষাও প্রশস্ততর এবং ইঁহার বহুদর্শন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালব্যাপী, সমগ্র বিশ্বসংসারের সমগ্র বিদ্যা ও জ্ঞান কৈলাসপতি কপিশাঙ্গনের নখাগ্রে দর্পণের ন্যায় অবস্থিত। কত যুগের পর কত যুগ চলিয়া গেল কত মহাপ্রলয়ের পর মহাপ্রলয় অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ইঁহার বয়সের কেহ নির্ণয় করিতে উঠিতে পারিল না, শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাড়ের মালা গলায় দিয়া ভূত প্রেতকে সঙ্গী করিয়া, সকল বৃদ্ধি এবং সকল সিদ্ধির সারার্থাস্বাদনজনিত ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া হিমাচলের ভোলানাথ ববম ববম বম ববে সুষুপ্ত সংসারের চৈতন্য বিধান করেন, ইনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত সুতরাং নিগুণ, এবং ইঁহার ভালদেশে শত শত জ্যোতিরিঙ্গণের জ্যোতিঃসমতুল্য বিভাবসুর ধক্ ধক্ জ্বালা দিবানিশি ইঁহার মুখমণ্ডলকে আলোকিত করে,—এই মহাগ্নির তেজে এক সময়ে কামদেব ( মদন ) ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। ত্রিভুবন অদ্ভুত দেবতা পৃথিবীর ধর্মসাহিত্যে আর নাই, ইনি গুরুর গুরু,

পিতার পিতা এবং পতির পতি। এমন সর্ব্বগুণময় ভোলা মহেশ্বর পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥"

ইনি পবিত্রতর হইতেও পবিত্রতম; সকল পবিত্রতার সারাৎসার পতিতপাবনী জাহ্নবী ইঁহার শিরোদ্ভবা; শিব যাহার শিক্ষক ও সহায়, তাহার জীবন সকল সুখের আকর, সকল গুণের সাগর। শিব-চরিত্র অনন্ত আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। একাধারে সাংসারিক জীবনের চরমোৎকর্ষ এবং আধ্যাত্ম জীবনের পরাকাষ্ঠা শিব-চরিত্রে সুন্দররূপে সমাযুক্ত। এমন সুন্দর শরীর—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সবল দেহ—এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেবল আদর্শ-চরিত্রের মহাপুরুষেই সম্ভবে। স্বাস্থ্য রক্ষা দ্বারা শরীরের উন্নতি করা সকল সাধনের, সকল উন্নতির কারণের কারণ স্বরূপ, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন। দেবাদিদেব মহাদেব বিবাহিত হইয়াও সংসারে নির্লিপ্ত, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিয়াও ইনি জিতেন্দ্রিয় এবং সংসারী হইয়াও উদাসী। কে বলিবে না দেবাদিদেব মহাদেব উমাপ্রাণ হইয়াও সদা উদাসী? ইনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত; ইঁহার নয়নের জ্যোতিতে স্বয়ং কাম (মদন) ভস্মাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। ইঁহার কটাক্ষে কামের কাম—মদনের মদনত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। এমন কামবিজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারী মহাপুরুষকে আর কেহ কোথায় দেখিয়াছে কি? হলাহল পান করিয়া ইনি শমন-সদনে গমন করেন নাই, বরং মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নামে মহিমান্বিত হইয়াছেন; বিষ পান করিয়া ইনি "নীলকণ্ঠ" নামে জগদ্বাসীকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিয়াছেন। এত গুণ, এত সামর্থ্য না থাকিলে পৌলস্ত্য প্রাজ্ঞপ্রবর দশানন কি কখনও ইঁহার সেবকত্বস্বীকার করিত? বাসবকে যিনি বিজয় করিয়াছিলেন,

শমনকে যিনি প্রহরী রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, রাবণের সহিত সমর ঘোষণা করিতে যিনি সাহসী হইয়াছিলেন, সেই দশ আনন দশায়ুক্ত রাবণ দেবাদিদেব মহাদেবের মহাদাস ও মহাভক্ত।। শিবের জটায় গঙ্গা, কণ্ঠে বিষ এবং গলায় কালসর্প, শিবের বাহন বৃষভ, অনুসঙ্গী ভূত প্রেত, আজ্ঞাবহ শার্দূল এবং সহধর্মিণী ভবানী। এমন সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্বগুণাকর, সর্বজ্ঞানের বিজ্ঞানস্বরূপ মহাগুরু আর কোথাও দেখিয়াছ কি? এমন দেবদুর্লভ দেহ, এমন সুমহান মন এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং এমন আদর্শ জীবন ইউরোপ বা আমেরিকায় নাই। তৈল ও জল একত্রে অবস্থান করিলেও যেমন পরস্পর সম্মিশ্রিত হয় না, পদ্মপত্রে বারি অবস্থান করিলেও যেমন তাহা পত্রে সমাযুক্ত হয় না, কৈলাসপতি মহাদেব সংসারী হইয়াও—বিবাহিত হইয়াও সংসারে সদাই নিষ্কামী ও নির্লিপ্ত। ইনি সংসারী হইয়াও শ্মশানবাসী, ইহলোক ও পরলোককে জন্ম ও মৃত্যুকে, সাংসারিক মায়া ও সাংসারিক বৈরাগ্যকে, সুখের সংসারস্থল ও বৈরাগ্যের শ্মশানক্ষেত্রকে এই উভয়কে একাধারে তিনি তাঁহার নিজের জীবনে সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছেন। শ্মশানবাসী হইয়াও এই বিবাহিত মহাপুরুষ সহধর্মিণীর প্রতি অমনোযোগী নহেন জটাজূটসমাযুক্ত, শার্দূলচর্মপরিহিত এবং ভস্মমাখা দেহী হইয়াও শনি নারী জাতির মর্য্যাদা, সতীত্ব বা লজ্জাশীলতার সংরক্ষণে উদাসী নহেন। বৈরাগ্যময় শ্মশান-প্রান্তরে অবস্থান করিয়াও ইনি সংসারের কল্যাণে বীতস্পৃহ নহেন, নিজে ক্রিয়াতীত হইয়াও নিষ্ক্রিয় নহেন এবং সর্বত্যাগী হইয়াও পরোপকারে কদাচ পরাঙ্মুখ নহেন। এত গুণ, এত সামর্থ্য, এত প্রেম না থাকিলে, ত্রিতাপনাশিনী ধরিত্রীধাত্রী অন্নপূর্ণা কি কখনও ইঁহার পত্নীত্ব স্বীকার করিতেন? ইঁহার প্রেমে সর্পকুল বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, বিষের বিষত্ব উড়িয়া গিয়াছে শ্মশানক্ষেত্র সুখকর ত্রিদিব স্থানে পরিণত হইয়াছে, শার্দূল ও বৃষভ একত্রে সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ

হইয়াছে এবং ভূত প্রেত পিশাচ দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবন চরিতার্থ করিয়াছে। ধন্য সেই ভারতবর্ষ, যে দেশের কৈলাসপতি কপিশাঞ্জন শিক্ষক রক্ষক, সহায়ক ও আদর্শ চরিত্রের আদর্শ-দেবতা। এমন আদর্শ-শিক্ষক না হইলে কি ভারতবাসী "শিবরাত্রি" ব্রত পালন করিয়া উপবাসের কষ্ট স্বীকার করিয়া মহানন্দে মহোৎসাবে উদ্‌যাপন করিত?

কৈলাসপতি কপিশাঞ্জনের সহধর্ম্মিণী রমণীকুলে অদ্বিতীয়া এমন অতুলনীয়া রমণী আদর্শ-দেশ ভারতবর্ষেই সম্ভবে। সকল গুণের গুণমণি হইয়াও এই মহারমণী নির্গুণা এবং ইন্দ্রিয়াতীতা। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, রূপে গুণে, শৌর্য্যে সাহসে বিদ্যা বিনয়ে, ধর্ম্মে সুকর্ম্মে, চরিত্রে বীরত্বে, সতীত্বে সাধ্বীতে এই রমণী অদ্বিতীয়া। ইনি অন্নপূর্ণা মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী, বিদ্যারূপিণী, বরদা, সারদা, মোক্ষদা, ভবানী জগদ্ধাত্রী ঈশানী এবং দুর্গতিহারিণী দুর্গা। রাজীবলোচন রামচন্দ্রের ইনি উপাস্ত এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের ইনি মাতা। উপযুক্ত পতির উপযুক্তা পত্নী না হইবে কেন? সুপ্রসিদ্ধ দক্ষরাজা ইঁহার পিতা, রাজা দক্ষ এক সময়ে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালবাসীকে যজ্ঞক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও বিশেষ কার্য্য বশতঃ স্বীয় জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। শিবপ্রাণা সতী ভগবতী পিতৃগৃহে স্বকীয় স্বামীর এরূপ অপমান দর্শন করিয়া যজ্ঞস্থলেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন, সতী সাধ্বীর এই পতিভক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়, সতী রমণীদিগের দেহের প্রত্যেক অঙ্গই পবিত্র হইতেও পবিত্রতর সেইজন্য পতিতপাবনী মাতা ভগবতীর নিষ্কলঙ্ক দেহের যে যে অংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থান মহাপবিত্র পীঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সতী ভগবতীর জীবনে দেখিতে পাইতেছ কি? ইনি রমণীরূপে মানবী বটেন, কিন্তু দিব্য চক্ষু দিয়া দেখিলে ইঁহাকে জগতের মাতা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। দক্ষালয়ে মা অন্নপূর্ণা প্রাণ পরিত্যাগ

করিলে পর তাঁহার মৃত দেহ, দেবাদিদেব মহাদেব ভূতল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করেন, মরণের পরেও সতী স্ত্রীলোক সখ্যতা হইতে স্বতন্ত্র হয় না. শিব ইহাই দেখাইলেন। সতীদেহ স্কন্ধে শিবের মূর্ত্তি কি পবিত্র কি সুন্দর।। এমন পবিত্র ও সুন্দর মূর্ত্তি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। হর বম বম বম। বম ভোলা॥ ববম বম।

ভগবৎ পরায়ণ কাব্যকারেরা শিবমনোমোহিনী, দুর্গতিহারিণী, পতিতপাবনী মাতা জগদম্বার এইরূপে স্তুতি করিয়াছেন—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥
চতুর্ব্বর্গস্বরূপিণী ত্বং হি শক্তি মহামায়ে।
বর দে বরদে মাতঃ দানবাক্রান্ত সন্তানে॥

জয় হর বম বম ভোলা! জয় হবিচব ববম ববম্ বম ভোলা। আইস, আব একবার ঐ কৈলাসপতি কপিলাঞ্জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। ঐ ধ্যানমগ্ন মহাদেব জ্ঞানানন্দরূপে সমাবিষ্ট হইয়া আনন্দামৃত পান করিতেছেন, ঐ যোগীন্দ্রের শ্রীমুখকান্তিতে সমগ্র হিমালয় অপূর্ব্ব আলোকে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিয়াছে।

"ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।"

ঐ জবাকুসুমসঙ্কাশ কান্তাপের দ্যুতি শিব-শঙ্করের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন মহান্ হইতেও মহত্তর তাঁহার সমস্ত জীবন, সংসারের —জগতের কল্যাণের জন্য যাপিত হয়। এই ভোলা মহেশ্বর "আপন ভুলিয়া" আপন জীবন বিশ্বসংসারের মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি নিজের স্বার্থ, নিজেরং সুখ, নিজের স্বচ্ছন্দতার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাতও করেন নাই। কুবের যাঁহার পদাশ্রিত, শমন যাঁহার সেবকানুসেবক, মাতা জগদম্বা যাঁহার পত্নী, সিদ্ধিদাতা গণেশ যাঁহার সন্তান, সকাম ও নিষ্কাম সাধনার যিনি পরাৎপর গুরু, সমগ্র জ্ঞানের যিনি

বিজ্ঞান, সুখের যিনি আকর, গুণের যিনি সাগর, এবং ভোগের যিনি ভোগ, তিনি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া শার্দূলচর্মে এবং ছাই ভস্মে দেহ আচ্ছাদন করিয়াছেন, আহারের বা আরামের দিকে দৃষ্টি নাই, কেবল পরোপকার আর পরোপকার। কেবল জগতের হিতকামনায় আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মোৎসর্গ॥ এরূপ স্বার্থত্যাগের মহামহিমান্বিত দৃষ্টান্ত সম্মুখে বর্তমান থাকিতে আমেরিকা বা ইউরোপের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে যাওয়া লজ্জার কথা ভিন্ন আর কি বলিব? দেবাদিদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

"পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেব নাম্ভঃ স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।
নাদন্তি শস্যং খলু বারিবাহাঃ পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ॥"

মহাদেব পার্বতীয় প্রদেশের প্রত্যেক পাদপ ও ব্রততী, প্রত্যেক ফল ও ফুল, প্রত্যেক মূল গুল্ম অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া জগদ্বাসীর কল্যাণার্থ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন সংসারী মানবের শরীরকে নীরোগ ও পরমায়ুক বর্দ্ধিত করিবার জন্য তরু লতা হইতে নব নব ঔষধ আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিতেছেন। মহাদেবই ভৈষজ্য বিদ্যার স্রষ্টা। উদ্ভিদবিদ্যায় ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এমন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষক ও চিকিৎসক আর দ্বিতীয় নাই। আকর হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা দোষ গুণের বিচার করিতে দেবাদিদেব মহাদেব অদ্বিতীয়, শিব ভিন্ন চিকিৎসা নাই শিব ভিন্ন বিজ্ঞান নাই, শিব ভিন্ন রসায়ন নীরস ও বিরস। যন্ত্রকুশলতায় ধনুর্বিদ্যায় স্থাপত্যবিদ্যায় শিব-শঙ্কর তুলনারহিত। শ্মশানে মশানে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া শারীর বিজ্ঞানের নব নব প্রয়োজনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, দেহস্থ নাড়ী, শিরা, ধমনী প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা জীবের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করিয়াছেন, সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া প্রভৃতি মহাপ্রয়োজনীয় নাড়ীর পরীক্ষা দ্বারা যোগবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরমায়ুর বৃদ্ধি এবং ত্রিকালজ্ঞানের উপায় নির্ণয়

করিয়া দিয়াছেন। আর আধ্যাত্ম বিস্তার শিবের তুল্য প্রবীণ ও প্রাজ্ঞতর আর কেহ আছে কি,? ইহকাল ও পরকালের সমস্ত তত্ত্ব ইঁহার কণ্ঠে লিখিত। বল দেখি, শিব যাহাতে সম্পর্ক রাখেন না, এমন কোনও বিদ্যা বা জ্ঞান আছে কি? শিব শম্ভু কেবল আনন্দময় নহেন, ইনি পূর্ণ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ, ইনিই পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম। আর্য্য দেবর্ষিগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই শিব শব্দের অর্থে বলিয়াছেন "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽমরঃ শিবঃ"। মহর্ষিগণ এই জন্ত এই "অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ" ইন্দ্রিয়াতীত নির্গুণ মহাদেবের স্তুতি করিতে গিয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছেন—

"যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥"

শিবের এই মহান্ পরোপকারপ্রিয়তা আমাদের মহাশিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্ত। মহতেরা জগতের কল্যাণার্থই মানবজন্ম ধারণ করেন এবং সংসারের মঙ্গলার্থই তাঁহারা জীবন যাপন করেন। কবি বলেন—

কত জল নদীগণ দেখ গর্ভে ধরে।
কিন্তু তার কিছুমাত্র পান নাহি করে॥
কত শত ফল দেয় দেখ তরুগণ।
কিন্তু তার একটিও না করে ভক্ষণ॥
আকাশ হইতে মেঘ ঢালে কত জল।
নিজে কিন্তু নাহি পায় কিছু তার ফল॥
তাই বলি এ সংসারে মহৎ যেই জন।
পর-উপকারে তাঁর সার্থক জীবন॥

কৈলাসপতি কপিলাশ্রমের জলন্ত ও জীবন্ত আত্মোৎসর্গ মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার করে, মুমূর্ষুকে জাগ্রত করে এবং উদাস্তপরায়ণ পতিত মানবকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সতেজ করিতে সমর্থ হয়। এমন এক দিন ছিল, যে দিনে ভারতের ঘরে ঘরে আত্মোৎসর্গের শিব পোজা

পাইতেন, পরের জন্য প্রাণ দিতে শিখিয়াছিল বলিয়া সংসারের হিতকামনায় জীবন যাপন করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া, সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য স্বদেশের জন্য স্বজাতির জন্য সমগ্র বিশ্ব সারের জন্য হাসিতে হাসিতে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া প্রাচীনা ভারতভূমি স্বর্গভূমি বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহর্ষি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যতি, মুনি, উদাসী, ইঁহারা বনের ফল এবং ঝরণার জল মাত্র সম্বল লইয়া নগপদে নগশিরে সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন যাপন করিতেন। ভারত এখনও ভারত আছে হিমালয় এখনও হিমালয় আছে, ভারতে এখন সর্ব্বত্রই শ্মশান ও মশান, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব আর নাই, এখন আর শিব নাই, এখন আর শিবমনোমোহিনী মা জগদম্বা নাই। কৈলাসে আর কৈলাসপতি কপিশাঙ্গন নাই। আবার কি শিবচরিত্র, আবার কি ভবানীচরিত্র দেখিতে পাইব? আবার কি এমন আদর্শ চরিত্রের আদর্শ নরনারী ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হতভাগ্য হীনবীর্য্য হিন্দুজাতিকে পবিত্র ও মহিমান্বিত করিবেন? হায়! ভারতশ্মশানে সকলই আছে কিন্তু শ্মশানভক্ত শিব কোথায়? পালেস্তাইনের দিকে লক্ষ্য করিয়া মহামতি যিশুখৃষ্ট অতীব দুঃখ সহকারে বলিয়াছিলেন, The harvest is truly plenteous but the labourers are few pray ye therefore to the I ord of the barvest that He will send forth labourers into His harvest আমাদেরও অবস্থা ঠিক তাহাই আমাদের আবার কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োজন, আবার স্বার্থত্যাগী আত্মোৎসর্গী মহাপুরুষদিগের প্রয়োজন। কিন্তু আবার কি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইবে আবার কি নিরাশায় ভারতে আশার আনন্দময় আলোক দেখিতে পাইব?

মাতর্ভারতভূমি! যাতাস্তে দিবসাস্তথা তান্ নাপ্নুতম।
হা! হা! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌ মজ্জতি॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

# অযোধ্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র।

রাম নাম লইতে ভাই না করিও হেলা।
ভব সিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা॥
রাম নাম স্মরণে যমের দায় তরি।
ভব সিন্ধু তরিবারে রাম পদ তরী॥
রাম নাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
ভবনিধি পার কর রঘুকুলমণি।
তরিবারে দু'টী পদ করেছ তরণী॥ [কৃত্তিবাস]

ভক্তাধিক ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে পতিতপাবন রাম নাম কি মধুর। কি মধুর। ভগবৎতত্ত্ব ব্রহ্মদর্শী হিন্দুর আধ্যাত্মিক চক্ষে নব দূর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীরামমূর্ত্তি কি সুন্দর। কি সুন্দর। যে ভুবনবিখ্যাত অমর কাব্য গ্রন্থে কোকিলকণ্ঠ বাল্মীকি মহাকবি বাল্মীকি ধ্যানমগ্ন মহর্ষি বাল্মীকি অব্যয় অক্ষরানন্দ উপভোগ করিতে করিতে শাশ্বত শ্রীরামচরিত্র গান করিয়াছেন, সেই রসাল রামায়ণ কি পবিত্র। কি পবিত্র। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য এবং মর্ত্ত্য হইতে পাতাল—সমগ্র সুবিশাল বিশ্বসংসারে যাহা কিছু মহান যাহা কিছু মধুর যাহা কিছু পবিত্র সুন্দর তাহা যেন রাম নামরূপ রত্নভাণ্ডারের অন্তর্নিহিত বলিয়া বোধহয়। এমন মধুর নাম এমন সুন্দর মূর্ত্তি এমন জ্ঞানময় গ্রন্থ আর কখনও কোথাও শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ কি? ধন্য সেই দেশ, যে দেশে রঘুনন্দন রামের জন্ম, ধন্য সেই দেশ, যে দেশে রঘুনন্দন রাম উপাস্য দেবতা, ধন্য সেই জাতি, রাবণ বিজয়ী রাঘব যে জাতির গৌরব এবং আদর্শ পুরুষ, এমন মহিমান্বিত ও মহাপুরুষানুগৃহীত দেশকে মর্ত্ত্যধাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না, এই জন্য ভারতভূমি সুবর্ণ্ণ স্বর্গের সম্পূর্ণমূর্ত্তি স্বরূপ। সীতাপতি শ্রীরাম যাহাদের পিতা,

মা জানকী যাহাদের জননী, ঠাকুর লক্ষ্মণ যাহাদের রক্ষক, ভাগ্যবান ভরত-শত্রুঘ্ন যাহাদের সহস্র সংগুণের জলন্ত দৃষ্টান্ত, বাল্মীকি যাহাদের গায়ক এবং পবননন্দন মারুতী যাহাদের বীর, সে জাতির অনন্তকাল স্থায়িনী সেই জন্মভূমির নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে কখনও কি লুপ্ত হইতে পারে? ইহাত অসম্ভব কথা। কেবল অসম্ভব নহে, অসম্ভব হইতে অসম্ভবতর, অসম্ভবতর হইতে অসম্ভবতম। এই মধুর রাম নাম রূপের সাগর, গুণের আকর এবং প্রেমের শেখর। এই মধুর নাম সতীর প্রাণ, সাধুর ধ্যান, ভক্তের ভরসা, নিরাশার আশা, অগতির গতি এবং অজ্ঞানীর জ্যোতি। এই মধুর রাম নাম মুমুক্ষুর মন্ত্র, মুমূর্ষুর প্রাণ-তন্ত্র, আর মহাপাপীর মহামন্ত্র। এমন পতিত-পাবন অনাথশরণ জগজ্জীবন নাম আর আছে কি? ভগবান সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের নব দূর্বাদল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করি, যখনই একাধারে সেই শান্ত ও সাংগ্রামিক মূর্ত্তির আদর্শ পুরুষকে দেখিতে পাই, যখনই একাধারে মনুষ্যত্ব (Humanity) ও ঈশ্বরত্বের (Divinity) সমুজ্জ্বল সম্পূর্ণতার মূর্ত্তি নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই নয়নের প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে। আঁধারে আলোক দিতে, ভীতকে অভয় করিতে, উপায়হীনকে উৎসাহিত করিতে, দগ্ধপ্রাণ শীতল করিতে, পাপীকে পরিত্রাণ করিতে ভগ্নহৃদয়ে ভরসা দিতে অধঃপতিত জাতির উদ্ধার করিতে সুষুপ্ত ও অলসকে জাগ্রত করিতে এবং বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়কে কুসুমাদপি কোমল করিতে, রাম নামের তুল্য মহামন্ত্র আর দেখিনা। এই মধুর রাম নাম নিরাশার উজ্জল আলোক, নির্বীর্য্যের বীর্য্য, পদানতের পরিত্রাণ এবং অত্যাচারিত ও অসমর্থ জনের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। এমন নাম আর আছে কি?

"ভর্জনংভববীজানাং অর্জনং সুখ-সম্পদম্।
তর্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জনম্॥"

ভাই হিন্দু! ঐ কমললোচন রাম রঘুর মূরতির দিকে আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ,দেখি। একবার ঐ রামরূপসাগরে মগ্ন হইয়া ধ্যানাবস্থায় প্রাণকান্ত রামের পবিত্রতায় পূতমানস হও দেখি।

"শ্যামল শরীর তাঁর চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণ পূরিত॥
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন॥

বামে সীতা দক্ষিণে শ্রীরাম। বামে মা জানকী এবং পার্শ্বে জনক জামাতা রাম। এই যুগলমূর্ত্তি—এই সীতাপতি শ্রীরামমূর্ত্তি মনোহর হইতেও মনোহর।

"সীতা' পার্শ্বগতা' সরোরুহকরা বিদ্যুন্নিভ রাঘব"

সতীর পতিভক্তি পতির পত্নীপ্রাণতা ভ্রাতৃবৎসলতা, জন্মভূমি হিতৈষিতা প্রজাপ্রেম দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন স্বধর্ম্ম রক্ষা, প্রিয়ম্বদত্ব শৌর্য্য বীর্য্য উৎসাহ উদ্দীপনা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা গুরুভক্তি মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি সত্যপালন মিথ্যায় ঘৃণা পাপে বিদ্বেষ স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য সাধুতা বিনয় স্বজাতিপ্রেম, জ্ঞানী ও ভক্তে ভক্তি ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা অকৃত্রিম বন্ধুতা, অসাধারণ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্পূর্ণতা—এই সকল দেবদুর্লভ মহাগুণ এই অপূর্ব্ব আদর্শ মূর্ত্তিতে একাধারে সুন্দররূপে সম্মিলিত হইয়া কি সুন্দর শোভায় ভারতভূমিকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল! এমন নির্ম্মল শরীর নিষ্কলঙ্ক স্বভাব এবং নিষ্পাপ জীবন, জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সুবর্ণ সিংহাসনেরই উপযুক্ত। তাহাতেই—

"কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্॥"

এত মহান, এত মধুর, এত পবিত্র এবং এত সুন্দর না হইলে কি এই রাম নামের মহিমায় কমনীয় মন্মথদল-দুস্তর রত্নাকর সাহিত্য-সরোবরের শারদীয় সরোজ এবং আধ্যাত্মিক আশ্রমের মহামুনি হইয়া অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিতে পারিতেন? পাষাণপাষী অহল্যা যে নামে মুক্ত, চণ্ডাল গুহক যে নামে স্বর্গবাসী, সূর্য্যবংশ যে নামে পবিত্র এবং অন্ধ কৈবর্ত্তের কাঠের নৌকা যাঁহার পাবনীয় পদস্পর্শে হিরণ্ময়, সে নাম এবং তাঁহার নাম কি সামান্য হইতে পারে?

"পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধনপরদারেষু সক্তো বদিস্যাৎ
নিত্যং স্নেহাৎ ভয়াদ্বা রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্মরেত্তঃ।
ভূত্বা শুদ্ধান্তরাত্মা ভব শতজনিতানেক দোষৈ বিমুক্তঃ
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি বৈকুণ্ঠনাথম্।
হত্বা যুদ্ধে দশাস্যং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন চাপং
ভূমৌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্নিতরকরধৃতং ভ্রাময়ন্ বাণমেকম্॥
আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ সূর্য্যকোটি প্রকাশো।
বীরশ্রীবন্ধুরাঙ্গস্ত্রিদশপতিনুতঃ পাতু মাং বীররামঃ॥"

তাই হিন্দু! আইস, আমরা এই কোটি কোটি ভাই একত্রে মিলিয়া রামায়ণ গান করিতে করিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অব্যয় ব্রহ্মপদে ভক্তিভরে প্রণাম করি। যাঁহার নামের মহিমায় সংসার-সাগর গোবৎসপদ তুল্য সহজ ও সামান্য হইতে পারে, যাঁহার কৃপায় সর্ষপ সুমেরু এবং সুমেরু সর্ষপ হইতে পারে, যিনি ভারতের আদর্শ শিক্ষক, যিনি রামায়ণের মহামূর্ত্তি (Central figure) যিনি ভক্ত হিন্দুর উপাস্য, সেই রাম মানব নহেন।

"রামরামেতি রামেতি রাম রাম মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

রাম রামেতি যো নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥"

সাক্ষাৎ নারায়ণীস্বরূপিণী মা জানকীর যিনি পতি, ভক্তাধিক ভক্ত হনুমানের যিনি হৃদয়, গুহক "চণ্ডাল" হইয়াও যাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতাব্যঞ্জক আলিঙ্গনে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র, এবং অসাধারণ বীর্যশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত-প্রবর দশাননের যিনি শত্রু হইয়াও মৃত্যুকালে অকৃত্রিম সখা এবং সদগতির কারণ, তাঁহাকে কি মানব বলিতে ইচ্ছা হয়? মানব নহেন বলিয়া, অসংখ্য অমর হিন্দু বীরবৃন্দ ধর্মযুদ্ধে "হর বম বম ববম বম" অথবা "জয় রাম জয় জয় রাম" বলিয়া কণ্ঠিতকণ্ঠে তরবারী চালাইতে চালাইতে হাসিয়া হাসিয়া প্রাণ দিয়াছে। তিনি মানব নহেন বলিয়া বনের পক্ষীকেও মানবেরা "রাম", নাম শিখাইয়া দগ্ধপ্রাণ শীতল করে। মানব নহেন বলিয়া, মৃত্যুর পরেও "হরে রাম হরে রাম" "রাম নাম সচ হায় রাম নাম সচ হায়" এই আধ্যাত্মিক ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মৃতদেহ শ্মশানক্ষেত্রাভিমুখে বাহিত হয়। রাম নাম ছাড়িয়া হিন্দু কি বাঁচিতে পারে? সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। পদ্মপুরাণকার (উত্তর খণ্ড, ৬২) বলেন—

"রমন্তে যোগিনোনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

পরমাত্মারূপে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম। রাম মানব নহেন।

"রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

ভাই। এবারে সাক্ষাৎ নারায়ণী লক্ষ্মীস্বরূপিণী আদর্শ সতী সীতাদেবীর ঐশী মূর্তির দিকে একবার নয়ন নিক্ষেপ কর। "সুন্দরইন্দী বরনীলম্" আদর্শ দেব ক্ষত্রিয়বংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের ইনি সহধর্মিণী। আদর্শ পতির ইনি আদর্শ পত্নী। প্রাণাধিক প্রিয়তর ভর্তার ইনি দেহ, মন ও আত্মা সমাধিস্থ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সীতা ও শ্রীরাম

এই যুগলমূর্ত্তি একই উদ্দেশ্য, একই জীবনে অনুপ্রাণিত।

> "প্রাণৈস্তেপ্রাণান্ সন্ধধামি অস্থিভিরস্থীনি।
> মাংসৈ মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥"

স্বয়ং ভগবান যাঁহাকে প্রাণের প্রাণ স্বরূপিণী পত্নী রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াও, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যাঁহাকে রাজ্যলক্ষ্মী রূপে সঙ্গে রাখিয়া বনবাসের দুঃখ ভুলিতে পারিয়াছেন, ভক্তাধিক ভক্ত হনুমান যাঁহাকে "মা" বলিয়া প্রাণ শীতল করিয়াছেন যোগীশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জনক যাঁহার জনক হইয়া কৃতার্থমন্য, স্বয়ম্বর্ণী অশোককাননেও যিনি অনাদি অব্যয় রামের ধ্যানে পরমানন্দিতা, সুধন্তা গোদাবরীর নির্মল সলিলে কহ্লার-কমল অবলোকন করিয়া যে পতিপ্রাণা সাধ্বীসতী স্বীয় স্বামীর কমল লোচনভ্রমে উৎফুল্লা, সেই সতীশ্রেষ্ঠা মা জানকীর ঐ রূপে,র ঐ মুর্ত্তির, ঐশ চরিত্রের বিষয়ে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। এইরূপ মানবীর রূপ নহে।

> "পরমাসুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
> শিয়ালে হইল জন্ম নাম থাকে সীতা॥
> লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
> যাঁর রূপে ভুলিলেন শ্রীরঘুনন্দন॥
> যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
> ধনে পুত্রে লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ॥"

এমন আদর্শসতী, এমন আদর্শ সহধর্ম্মিণী, এমন আদর্শ মাতা, আর কখনও দেখিয়াছ কি? শ্রীরাম যেমন আদর্শ পুরুষ, সতী সীতা তেমন আদর্শ রমণী! এই মূর্ত্তি মানবী মূর্ত্তি নহে, মা জানকী সাক্ষাৎ নারায়ণী লক্ষ্মীরূপে জগতে অবতীর্ণা। ভাগ্যবতী ভারতরমণীর সম্মুখে ইনি আদর্শ শিক্ষয়িত্রী।

আর ঐ যে কবিতাকল্পদ্রুমের অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া কবিকোকিল বাল্মীকি মধুর রামচরিত্র কূজনে ঈশ্বর-বিরহী

শাস্ত্রীয় ঝঙ্কার হৃদয়কে কোমল করিয়া তুলিতেছেন, মর্ত্ত্যধামে ত্রিদিবের অমৃতধারা ছড়াইয়া দিতেছেন, ঐ মধুর গীতিমালা যে মহাকাব্যে সংগৃহীত হইয়াছে তাহারই নাম রামায়ণ। ভক্তের চিত্তচকোরের সম্মুখে এই রসাল রামায়ণ যেন স্বর্গের প্রেম-সুধাকর। ভাষার মাধুর্য্য, শব্দের লালিত্যে, প্রেম ও ভক্তির আবেশে, চরিত্রের মনোমোহন সমাবেশে, কবিতার উচ্ছাসে, নৈসর্গিক শোভার বর্ণনায়, ঘটনাবলীর সুচারু চিত্রাঙ্কনে, যাহা লইয়াই বিচার কর, শ্রীরামায়ণ জগতের অদ্বিতীয় মহাকাব্য নায়ক যাহার স্বয় ভগবান, সেই অতুলনীয় মহাকাব্য কি প্রত্যাদিষ্ট (Inspired) না হইয়া থাকিতে পারে? রামায়ণ কাব্য রামানুগৃহীত মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ভক্তির অনন্ত উৎস, এই মহাকাব্যের নায়ক সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ।

লোকাভিরামং রণরঙ্গধীরং রাজীবনেত্রং রঘুবংশ নাথং।

কারুণ্যরূপং করুণাকরং তং শ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপদ্যে॥

ব্রহ্মচারীর বেশে, দস্যুতা ব্যবসায়ী রত্নাকরকে শ্রীভগবান যে অপূর্ব্বশিক্ষা দিয়াছেলেন, তাহাতে তাহার চৈতন্যোদয় হয় এবং রাম নামের গুণে বাল্মিকীর অমরত্ব ও জীবন্মুক্ত লাভ হয়। যে মধুর নামের গুণে অজ্ঞান ও অধাম্মিক রত্নাকর, মহর্ষি ও মহাকবি বাল্মিকী রূপে পরিণত হন কবিবর আজীবন কাল সেই গুণসিন্ধু রামচরিত্র ও পবিত্র রাম নাম গান করিতে করিতে কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি বাল্মিকী নিজেই বলিয়াছেন 'যতদিন অনন্ত আকাশে দিবাকর ও নিশাকর বিদ্যমান থাকিবে ততদিন রামায়ণ কাব্য লুপ্ত হইবে না।" এই ভবিষ্যবাণী যে ব্রহ্মবাক্য তাহাতে আর সংশয় কি? অনন্ত আকাশ দ্রবীভূত হইয়া যাইতে পারে, মহাসাগর মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু রামায়ণ বা রামচরিত্রের লোপ হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। ভক্ত চাতকের চক্ষুর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের সুমধুর চরিত্র যেন নিদাঘের

নবজলধর, ভক্তাধিক ভক্তের হৃদয়-অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাজত্ব করিতে করিতে প্রেম নবধুর জলে শ্রীচরণ প্রধৌত করুন, ভক্তের ইহাই কামনা ইহাই প্রার্থনা। রামায়ণের মধুরতা মানবিক নহে ইহা অনন্ত সৌন্দর্যের অপূর্ব আকর। ভক্তের প্রেমপিপাসা ভক্তের ভগবতাসক্তি যতই বাড়ে ততই বাড়াইবার ইচ্ছা হয়, এই জন্য বুঝি বাল্মীকির শ্রীশ্রী লেখনী নিস্তব্ধ হইবার পরেও উত্তর রামায়ণ, আধ্যাত্ম রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ উত্তর রাম চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরামচরিত্র গীত হইয়াছে। ইংরাজি লাটিন, ফরাসি, পর্টুগিজ জর্মণ আরব্য পারস্য উর্দু হিন্দি বাঙ্গালা, তৈলঙ্গী, তামিল কানাড়ী মালয়লী মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজীতে গদ্যে পদ্যে নানাভাবে রামায়ণের অনুবাদ ও সংস্করণ আছে। বাঙ্গালায় বহু প্রকারের রামায়ণ রামায়ণানুবাদ এবং পাঁচালি নাটক প্রভৃতি রূপে রামচরিত্র সুন্দররূপে বিবৃত আছে। ইহা যত পুরাতন হয় ততই নূতন হয়। এই রসাল রামায়ণ এবং মধুর রামচরিত ভারতবর্ষের লোকের দেহ মন ও আত্মার উপরে ত্রেতা যুগ হইতে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ভারতের নর নারী রাম ও রামায়ণ দেখিয়া চরিত্র গঠন করিতে শিখিয়াছে। কোটি কোটি কণ্ঠে রাম নাম এখনও মধুর, কোটি কোটি মন্দিরে রামমূর্তি এখনও অতি সুন্দর। রাম ও রামায়ণ না থাকিলে ভারতের লোক পশু হইয়া যাইত। রামায়ণরূপ দিনমণি অস্তমিত হইলে "ভারতে আসিবে আবার অ াধার রজনী। হিন্দুধর্মশাস্ত্র হইতে যদি রামচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র অন্তর্হিত করা হয় তাহা হইলে হিন্দুর তুল্য হতভাগ্য জীব এবং হিন্দুধর্মের তুল্য অসার ধর্ম পৃথিবীতে আর হইতে পারে না। রামচরিত্র হিন্দুশাস্ত্রের মহাতেজ এবং রামায়ণ মহাকাব্য হিন্দুধর্মপ্রাসাদের রক্ষণী স্তম্ভস্বরূপ।

বাল্যাবস্থায় ভগবান রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসী বধ করিয়া জ্ঞানের রাজ্য স্থাপন করেন। তাড়কাকে বধ করিয়া তিনি বাল্মীকের ধর্মরক্ষা,

ভক্তের সাধন রক্ষা, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করেন। কিশোরে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া ক্ষত্রিয় উপাধির সার্থকতা রক্ষা এবং শারীরিক উন্নতির সম্পূর্ণতা ( Perfection ) প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূতলে অতুল দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আমরা ইহাতে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম যে, বাল্যকাল হইতেই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এবং শারীরিক উন্নতির সাধন করা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যৌবনে তিনি গুহকের সহ মিত্রতা, পিতৃসত্য পালন, পত্নীপ্রেম, সাগর বন্ধন, রাবণবধ, অহল্যাউদ্ধার, বনের বানরকে বশ, সনবকুশলতা বীরত্ব, শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, চরিত্রবল, জ্ঞান, ধ্যান, সভ্যতা, অধ্যবসায়, অমত পবিত্রম পরায়ণতা প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তদন্তর অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ভূতলে আদর্শ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন। রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র যেমন রূপের সাগর, তেমনি গুণের আকর। তিনি অনন্ত গুণের গুণমণি, আদর্শ পুরুষের শিরোমণি। তাঁহার যে কোনও বয়সের যে কোন লীলা লইয়া বিচার করি, তাঁহার নিষ্পাপ দেহ এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রতি পদে পদে অখণ্ড আনন্দের আকরকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া দেয়, রাম নামে পবিত্র প্রেমের উৎস উচ্ছসিত হইয়া উঠে। রামের তুল্য আদর্শ সখা, আদর্শ সহোদর, শিক্ষক, পিতা, পতি, পুত্র গুরু, বীর, রাজা, জ্ঞানী এবং আদর্শ আধ্যাত্মিক পুরুষ আর কোথায়? শারীরিক উন্নতির, মানসিক উন্নতির এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ইনি চরম আদর্শ। এই সুন্দর মহান আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে ইহকাল ও পরকালে বিমল সুখ ও শান্তি শান্তিলাভ করা যায়। সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র যাহার আদর্শ তাহার মানব জনম সার্থক।

সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিজ্ঞানী হইয়াও, মানবলীলার অনুরোধে, জগতের যাবতীয় জীবের কল্যাণার্থে, সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র যোগীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব ঊর্দ্ধবাহু হইয়া রামচন্দ্রকে

বলিয়াছিলেন—"হে জনা অপরিজ্ঞাত আত্মাবো দুঃখসিন্ধবে। পরিজ্ঞাত স্বনন্তায় সুখায়োপশমায়চ॥" (যোগবাশিষ্ঠ। ৫।২৩।)

এই জ্ঞানই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র "পূর্ণ জ্ঞানামৃত স্বরূপ"।' তিনি দেখাইয়াছেন কেবল শুষ্ক জ্ঞান মোক্ষের কারণ নহে, জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সম্মিলন মানবের মোক্ষ সাধনের মূলমন্ত্র। গুরু ও শিষ্য উভয়েই জ্ঞানের জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ নামক পরম পাবনীয় গ্রন্থে গুরু বশিষ্ঠ দেব যে সকল অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা চিরকাল মুমুক্ষু দিগের প্রধান সহায় বলিয়া পরিগণিত থাকিবে। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা আর দ্বিতীয় বশিষ্ট পাই নাই। ভারতে এক্ষণে আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, রাম এবং বশিষ্ট উভয়েই ভারতকে পবিত্র করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। সেই প্রাচীন ও পবিত্র অযোধ্যার ভগ্নাবশেষ সেই সরযূ সেই দশরথপুরী প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকারে বর্ত্তমান আছে কিন্তু রাম নাই। অযোধ্যানগরীতে ভগবান রামচন্দ্রের জন্মস্থান এক্ষণে মুসলমানের মসজিদের মোল্লা দিগের আজান ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। সরযূ ঘাটের যে স্থান হইতে এক সময়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহে অযোধ্যাবাসীগণ সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন তাহা এখনও "স্বর্গদ্বার" নামে প্রসিদ্ধ। এই মহাপবিত্র স্থলে অত্যাচারী যবনের বিপুলাকার মসজিদ ভগ্নাকারে এখনও বর্ত্তমান। যেমন রাজর্ষি জনকের জনকপুরে আর কিছুই নাই তদ্রূপ অযোধ্যায়ও আর কিছুই নাই। চর্ম্মচক্ষে দেখিবার কিছুই নাই বটে কিন্তু ভারত এখনও দিব্যচক্ষু হারাইয়া অন্ধ হয় নাই। আইস আমরা আধ্যাত্মিক নয়ন উন্মীলন করিয়া, প্রাণমন খুলিয়া, সেই পতিত পাবন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তি ভরে বন্দনা করি।

খাম্বাজ-চৌতাল।

বাঞ্ছা কল্পতরু নাম, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম,
পূজিলে পূর্ণ মনস্কাম, ভজরে সেই পরাৎপরে।
পতিত জন পাবন, অনাথ জন শরণ
জগত জন জীবন, ডাকরে সেই সারাৎসারে॥
অহল্যা পাষাণী ছিল, রামনামে তরে গেল,
চণ্ডাল সাধক হলো, ভকত হলো বানরে॥
রামের মাহাত্ম্য অসীম অনাদি, রূপের সাগর শুধে বারিধি
রামনাম মর্ত্তে না থাকিত যদি, কে আলো দিত অন্ধকারে।
কৈবর্ত্তের কাঠের তরণী, রামপদ স্পর্শে কাঞ্চন মণি,
রাক্ষস রাবণ তরিল ধরণী, ওপদ তরিল চোর রত্নাকরে॥
চিদাত্মার সত্যানন্দে যিনি রমেণ রাম,
ভবসিন্ধু তরিবারে তরী রাম নাম,
নামে পায় পাপী বৈকুণ্ঠ ধাম, যদি ভক্তিতে স্মরণ করে।
দেবতা অশক্ত রাম বর্ণনে, বাল্মীকি হারিল শ্রীরামায়ণে,
ঐ নাম মাহাত্ম্যে অযোধ্যাবাসী, স্বর্গে গেল সশরীরে॥
ধর্ম্মানন্দ কয় করি জোড়হাত, রামপদে সবে কর প্রণিপাত
ঘুচে যাবে পাপ তাপের উৎপাত, বলবে রাম রাম হবে হয়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# কপালে আগুন।

বাঙ্গালা দেশে একটা প্রাচীন ও প্রখ্যাত প্রবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এই—"যার সর্ব্বদেহে ব্যথা, তার ঔষধ দিব কোথা?" আমাদের দুর্ভাগ্য অবস্থা ঠিক তাহাই। যদি একটা দিকে অবনতি দেখা যাইত,

তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করা কঠিন বলিয়া বোধ হইত না, কিন্তু সমুদয় বিষয়ে অবনতি হইলে প্রতিকারের জন্ত কয়টা উপায় অবলম্বন করা যায়? যেখানে রোগ সেখানে তাহার ঔষধ, এ কথা সত্য; যেখানে অবনতি, সেখানে তাহার প্রতিকার, এ কথাও সত্য; কিন্তু সম্মুখে, এমন কি হাতের পার্শ্বে, সুন্দর উপায় বর্ত্তমান থাকিতেও, মানুষ যখন উপায়কে "উপায়" বলিয়াই গ্রাহ্য করে না, তখন আর প্রতিকারের ভরসা কোথায়? জলপ্লাবনে সমস্ত দেশ যদি ডুবিয়া যায়, ঝড়ে যদি অর্দ্ধেক রাজ্য অদৃশ্য হয়, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বা যুদ্ধে যদি কোটি কোটি প্রাণীর বিনাশ হয়, অথবা এক একটা গোরা যদি প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে লাথি বা ঘুষি দ্বারা মারিয়া ফেলে, তথাপি এ দেশের লোকে তাহার প্রতিকার জন্ত সামান্ত মাত্র চেষ্টা, সামান্ত মাত্র সাহস অবলম্বন অথবা সামান্ত মাত্র স্বার্থত্যাগ স্বীকার না করিয়া, কেবল গাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে, আকাশের দিকে চাহিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে থাকিবে "কপাল আর কপাল!" বাল্যকাল হইতে আমরা অদৃষ্ট, ভাগ্য, নসীব, তগদীর, কপাল প্রভৃতি কথাগুলি এরূপে শিক্ষা করিয়াছি এবং এই কপালে আমাদের বিশ্বাস এমন দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের সমস্ত জাতি—সমুদয় দেশীয় নরনারী—এই কপালের দোহাই দিয়া মানুষের মহত্ব ও মনুষ্যত্বকে অগাধ জলে বিসর্জ্জন করিতে ক্ষণকালের জন্তও কুণ্ঠিত হয় না। ডাকাইতেরা আসিয়া তোমার ঘর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল, তোমার মা, মাসী, ভগ্নী, ভাগ্নীর প্রতি অযথা অত্যাচার করিল, তুমি হয়তঃ চেষ্টা করিলে ডাকাইতগণ তাড়িত হইত, কিম্বা ধৃত হইয়া গুরুতররূপে দণ্ডিত হইত, কিন্তু তুমি তাহার কিছুই না করিয়া কেবল "হায় রে কপাল! হায় রে কপাল!" বলিয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে, দাঁতের দ্বারা নখ কাটিতে এবং হাতের দ্বারা বুক চাপড়াইতে লাগিলে। তোমাদের ঐ কপালে আগুন লাগুক; এই কপালের বিশ্বাসই তোমাদের কাপুরুষতার প্রধান কারণ। আমি নিজে

"কপাল" মানি না, তাহা নহে, আমি নিজে একজন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস হইতে আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধর্ম, শাস্ত্র, বিজ্ঞান বা যুক্তির কথা তুলিয়া অদৃষ্টের অর্থ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কপালে অযথা বিশ্বাস হেতু তোমাদের যে দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, অথবা অদৃষ্ট শব্দের অন্যায় ও অবৈজ্ঞানিক অথবা অশাস্ত্রীয় অর্থ হেতু তোমাদের জাতির ও সমাজের যে সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, তাহাই দেখান এই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের কৃপা ও শক্তি ভিন্ন আমরা কিছুই করিতে সমর্থ হই না, ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু তোমার ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের সহিত সেই অপূর্ব্ব দৈবশক্তি ও দৈবকৃপার সম্পর্ক খুব কম। মানুষ যখন নিজের চেষ্টায় নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, সাহস ও অধ্যবসায়ে, কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে অক্ষম হয়, তখন অদৃষ্ট মানে তখন নিরাশাগ্রস্ত হইয়া "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" বলিয়া ক্ষান্ত হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি শরীর মন মস্তিষ্ক ও আত্মিক শক্তি দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাপুরুষের ন্যায় "ইহা হইতে পারে না" "ইহা হইবে না" "ইহা অসম্ভব" "টকা কপালে নাই" এইরূপ প্রলাপোচিত বাক্যে সময় ও সুবিধাকে নষ্ট করে না। অদৃষ্টের নাম অ-দৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না, যাহা বুদ্ধি বা বিদ্যায় আসে না, যাহা সাহস বা অধ্যবসায়ে কুলায় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—অর্থাৎ বুদ্ধি, বিদ্যা বা সাহসে কুলায় —ততক্ষণ পর্য্যন্ত অদৃষ্ট নাই, শক্তির বাহির হইলেই সকলই অদৃষ্ট, কিন্তু তোমরা প্রথম হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছ যে "এ সকল আর কিছুই নহে কেবল কপাল আর কপাল।" তোমরা অনুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, অনুমাত্র সাহস অবলম্বন না করিয়া, মন বা মস্তিষ্ককে অনুমাত্র পরিচালন না করিয়া, প্রথম হইতেই অলসের ন্যায়—মহা কাপুরুষের ন্যায়—স্থির করিয়া রাখিয়াছ "কপাল আর কপাল"। এই অযথা বিশ্বাস এই মহা ভ্রমাত্মক সংস্কার, তোমাদের সমুদয় উৎসাহ, সমুদয় উদ্দীপনা,

সমুদয় সদগুণ এবং সমুদয় বিত্তা বুদ্ধিকে অকর্ম্মণ্য ও অসার করিয়া তুলিতেছ। পুনরায় বলি তোমাদের, "কপালে আগুন লাগুক, তোমাদের এই বিশ্বাস তোমরা ভারত মহাসাগরের অগাধ জলে ফেলিয়া দেও, তোমরা এই বিশ্বাসে পদাঘাত করিয়া বীরের স্তায়, প্রকৃত মানুষের স্তায় উত্থিত হও। ঐ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস তোমাদিগকে মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে তোমরা ঐ বিশ্বাসকে দূরে ফেলিয়া দিয়া সাহসের সহিত বল—

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥"

এ দেশের বালক বৃদ্ধ যুবক, যুবতী, ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণী সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্য মধ্যে কপাল কথাটা যেন গার্হস্থ শব্দ হইয়া উঠিয়াছে। সম্বৎসর মধ্যে একটী ভারতবর্ষীয় লোক যতবার হরিনাম উচ্চারণ করে একটা গৃহস্থের ছেলে বোধ হয় একদিনে ততবার 'কপাল' শব্দটা উচ্চারণ করিয়া থাকে। খাইতে, শুইতে বেড়াইতে বসিতে হাটিতে কেবল কপাল আর কপাল।। সমগ্র জাতির মধ্যে এই সংস্কার অতীব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। একটা হাটে বা ঘাটে একটা টোলে বা স্কুলে যেখানে যাই কপাল কথাটা পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায়। একটা হিন্দুস্থানী জুতার দোকানে দশ মিনিটকাল মাত্র দাড়াইয়া থাক বোধ হয় তিন বার শুনিবে যে, মেরী নশীব মে রামজী নে লিখ্‌না বাড়ে"। কাপড়ের দোকানে যাও, সেখানেও ঐ কথা—— আরে। ভগবান নে লিখা হ্যায় ইত্যাদি। আর বাঙ্গালী তাহার ত কথাই নাই, কথায় কথায় কপাল আর কপাল।। আমি পুনরায় বলি, তোমাদের ঐ কপালে আগুন লাগুক।

গত আষাঢ় মাসের "নব্যভারতে" বাবু প্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয় আমাদের কাপুরুষত্ব সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা

অত্যন্ত সুদার্ঘীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, মনে কর, একজন নিরপরাধিনী ব্রাহ্মণী যুবতী স্ত্রীলোককে পাড়ায় পাঁচ জন দুষ্ট মুসলমান মিলিয়া নির্য্যাতন পূর্ব্বক সতীত্ব নষ্ট করিল, স্ত্রীলোকটাকে অমনি তাহার শ্বশুর শাশুড়ী এবং পল্লীর সকল লোক একত্র হইয়া সমাজচ্যুত করতঃ বাজারে পাঠাইয়া দিল, সেখানে সে বেশ্যারূপে বাস করিতে লাগিল, নিরপরাধিনী যুবতীর শ্বশুর, শাশুড়ী, মাতা, পিতা, জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং গ্রামের লোকেরা কহিল "হায়। হায়। ইহার কপালে কি এই ছিল।'' অথচ একটা টাকা খরচ করিয়া, একটু চেষ্টা বা যত্ন করিয়া অধার্ম্মিক মুসলমানগুলোর দণ্ডবিধান জন্ত কেহই প্রয়াস স্বীকার করিল না, কেবল সেই নিরপরাধিনী বালিকার দিকে তাকাইয়া "কপাল কপাল রবে আকাশ পাতাল কাঁপাইতে লাগিল। একটা লোক পুকুরের অগাধ জলে পতিত হইয়া ডুবিয়া গেল, তাহাকে বাঁচাইবার জন্ত তোমাদের কিছুমাত্র চেষ্টা নাই, কেবল কপাল আর কপাল রবে তোমরা জগৎকে কাঁপাইয়া তুলিলে॥ পুলীবে ঘুষ খায় মাজিষ্ট্রেট অবিচার করে, জমিদার প্রজায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিব' লয়, স্কুলের পরীক্ষায় ছেলে ফেল হয় অল্প বয়সে বিবাহিতা কন্তা বিধবা হয়, অলসের ঘরে ভাত থাকে না, কুঁড়ের ঘরে কাপড়খানি পর্য্যন্ত নাই, মাতালের সর্ব্বনাশ হয়, অসদাচার জন্ত নিউমোনীয়া রোগ জন্মে এ সমুদয়ই কেবল কপাল আর কপাল॥ কপাল ভিন্ন ইহার অন্ত কোনও কারণ থাকিতে পারে কি? থাকিলেও তোমরা তাহা বুঝিবে কি? তোমাদের "কপাল বিশ্বাস" সমুদয় সংগুণের হন্তারক। আশি বৎসরের মহা বুড়ো লম্পট পুরুষ, সুন্দরী সতী স্ত্রীকে তুচ্ছ করিয়া, সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক সন্তানকে উপেক্ষা করিয়া গৃহে সুখ ও শান্তির মূলোৎপাটন করিয়া, কেবল কতকগুলা টাকার লোভে একটা নবম বর্ষীয়া কুলীন কন্তাকে বিবাহ করিল, লোকটার পূর্ব্বকার পুত্র, মাতা, পিতা, জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে বুক চাপড়াইয়া চুল ছিঁড়িতে

ছিঁড়িতে বলিল 'কপাল আর কপাল॥" অথচ সেই লম্পট বুড়োটার অপকর্ম্মের জন্য কেহ একটা কথা কহিতেও সাহসী হইল না। এখানেও কপালের কেমন প্রাবল্য দেখিলে কি? মানুষ মরে একবার, কাপুরুষ মরে তিন বার, আর কপালে বিশ্বাসকারী" মরে শতবার! পুনরায় বলি তোমাদের কপালে আগুন লাগুক। হে বিধি! তুমি ভারতবাসীর কপালে আগুন জ্বালাও, যতদিন ইহাদের কপাল না ঘুচিবে ততদিন আর নিস্তার নাই।

আসল কথাটা কি জান? ভারতবর্ষ মহাদেশের উত্তরে যদি হিমালয়, দক্ষিণে যদি মহাসাগর এবং এতদুভয়ের মধ্যে গঙ্গা ও পদ্মা নদী না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতবাসীর কপালে আর বিশ্বাস থাকিত না। ভারতের লোকেরা উত্তরের সীমায় গিয়া দেখে, সম্মুখে অভ্রভেদী অত্যুচ্চ হিমগিরি দণ্ডায়মান। দক্ষিণের সীমায় গিয়া দেখে মহা মহাসাগর মুখব্যাদন করিয়া প্রসারিত, সুতরাং পারের ভরসা না দেখিয়া নিরাশার্ণিও হয়। এদিকে জলপ্লাবিতা পদ্মার ভীষণ মূর্ত্তি ওদিকে তাড়েব তরঙ্গভরা ভাগীরথীর ভীষণতা দেখিয়া ভারতবাসী মনে করে "আর আশা নাই।" এই আশা নাই' ভাবনা হইতে নিরাশাব্যঞ্জক কপাল শব্দের উৎপত্তি এবং সেই কপালে বিশ্বাসের সৃষ্টি॥ ক্রমে সেই বিশ্বাস আমাদের বংশপরম্পরায় হাড়ে হাড়ে জমিয়া গিয়াছে। আমরা এইরূপে সকল কাজেই দুর্ভেদ্য হিমালয়কে ও মহাবিশাল মহাসাগরকে দেখিতে পাই দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হই না। যদি সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, পাপের প্রতি ঘৃণা, অত্যাচার ও অবিচারের প্রতি অভক্তি কাপুরুষতার প্রতি বিরক্তি এবং শরীর মন ও আত্মার প্রতি স্নেহ থাকিত তাহা হইলে আমরা আর "কপাল" "কপাল" রবে কাপুরুষত্ব দেখাইতাম না। জাতীয় জীবন সংগঠন সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করিতে হইলে 'কপাল কথাটা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। জাতি বলিয়া গণ্য হইতে হইলে, সাহস উৎসাহ

উদ্দীপনা, স্বদেশপ্রেম এবং সত্যপরায়ণতাকে অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে, বিগত-ভয় হইতে হইবে' এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎগীতায় অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "অর্জ্জুন। তুমি বিগতভীঃ (ভয়শূন্য) হও, তুমি প্রকৃত আর্য্য পুরুষের ন্যায় সাহসী হও।' যেখানে সত্য সেইখানেই সাহস, যেখানে সাহস, সেখানে উন্নতি, যেখানে উন্নতি, সেইখানেই জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতা।

কেহ কেহ বলেন, কখনও সয়তানের রাজ্য হয় এবং কখনও পরমেশ্বরের রাজ্য হয়। আমি একথায় আদৌ বিশ্বাস করি না। পরমেশ্বর যদি সত্য হয়েন, তাহা হইলে সত্যেরই রাজ্য চিরকাল থাকিবে, সত্যের রাজ্য আর মিথ্যার রাজ্য একাধারে থাকা অসম্ভব। পরমেশ্বরকেও মানিব, আবার সয়তানকেও মানিব একথা ভুল। যে সত্যের অনুসারী, সে মিথ্যার অনুসারী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সাহস ও সত্যের অনুবর্ত্তী, সে ব্যক্তি কখনই কপালের বিশ্বাসী হইতে পারে না, সুতরাং কপালের বিশ্বাস কেবল দুর্ব্বলতা এবং কেবল কাপুরুষতা। পুনরায় বলি, তোমাদের কপালে আগুন লাগুক।

থিওডোর পার্কার, মার্টিন লুথার, খ্রীষ্ট প্রভৃতি সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। পার্কারের সত্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়া দাসব্যবসায়-প্রথা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সত্যে বিশ্বাস থাকিলে, সাহস নামক গুণ স্বতঃই পুষ্ট হয়। সাহেবেরা নীলকররূপে এদেশে ভয়ানক অত্যাচার করিত, কবি দীনবন্ধু বড় দুঃখে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—

নীল বাঁদরে সোণার লঙ্কা কোরে ছারখার।
অসময়ে হরিশ মোলো, লংএর হলো কারাগার॥

সাহেবদিগের দৌরাত্ম্যে দরিদ্র প্রজার ধন নাশ, ধর্ম্মনাশ, মান নাশ, প্রাণ নাশ, জাতি নাশ, অন্ন বস্ত্র নাশ প্রভৃতি নিত্যনিত্যই ঘটিত,

স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা পাইত না। প্রজারা যতদিন "কপাল "কপাল করিয়া নিরস্ত ছিল ততদিন নীলকরের দমন হয় নাই, কিন্তু প্রজারা যখন বুঝিল, "কপালে বিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না," তখন তাহাদের দেহে ও মনে কার্য্যকরী শক্তির স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। ক্রমে, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ নোয়াখালী খুলনা প্রভৃতি জেলার অসংখ্যাস খ্য প্রজা একত্র হইয়া যখন ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল তখন সাহেবদিগের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। ক্রমে নীলকরের অত্যাচবে একেবারে দমিত হইয়া গেল। এ সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি তোমরা এখনও কপালের দোহাই দিতে চাও? পুনরায় বলি লাগুক তোমাদের কপালে আগুন॥

ধন্ত তোমাদের কপাল এবং ধন্ত তোমাদেব বিশ্বাস॥ ক্রমাগত কপাল' কপাল' রবে জগৎ কাপাইয়া তোমাদের কপালকে তোমরা আরও কাপুরুষত্বময় করিয়া তুলিতেছ। যাহারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়, জুতা ও গুঁতো খাইয়া কপালের দোহাই দেয়, যাহাদের মানাপমান জ্ঞান নাই, তাহারা পৃথিবীতে চিরকালই অধম, অপদার্থ, অসার, অকর্ম্মণ্য ও পতিত মনুষ্য বলিয়া গণ্য হয়। তাহাতেই বলিতেছি, তোমরা তোমাদেব বৃথা 'কপাল কথা ছাড়িয়া দিয়া, স্বদেশের, স্বসমাজেব এবং নিজের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও। সমগ্র বিশ্বের যাঁহারা বান্ধব, তাঁহারা শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ জন্ম চারিত্র বল, মানসিক বল, শারীরিক বল, উৎসাহ, উত্তম পরিশ্রম, যত্ন, উদ্দীপনা, সাহস, প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া থাকে। তোমরা যদি কেবল কপাল কপাল করিয়াই নিরস্ত থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের কপালে আগুন লাগুক। তোমরা অতি বৃদ্ধ (পুরাতন) আর্য্যজাতির বংশধর, তোমরা জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের সিদ্ধিতে নিপুণ, কিন্তু এক কপালের বিশ্বাসের দোষে তোমাদের সকল সৎ গুণ মাটি হইয়া গেল। এখনও সাবধান হও, এখনও ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দূরে নিক্ষেপ করিয়া

প্রকৃত মানুষের মত সাহসকে অবলম্বন কর। নতুবা—

অতি বড় বৃদ্ধ তুমি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কিন্তু—কোন গুণ নাই তব কপালে আগুণ॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# মহামতি মহম্মদ।

"মহাত্মানাঞ্চ চরিতং শ্রোতব্যং নিত্যমেবহি।"

এই সুবিশালা বসুমতী মধ্যে মানবজাতি নানাপ্রকার ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া থাকে। বহু প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস এবং পরস্পরের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষ দর্শন করিয়া, অনেক অজ্ঞানী মানব সহজেই সিদ্ধান্ত করে "ইচ্ছা করিলে, ঈশ্বর এই ধরাধাম মধ্যে একই প্রকার ধর্ম্ম প্রচলন করিতে পারিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি জন্য পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িকতা ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে।" মায়ামুগ্ধ অজ্ঞানী মানবের এই অসার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু জ্ঞানের যাহারা আজীবন বিরোধী এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সুশীতল স্বর্গীয় সমীরণ সেবনে যাহারা সমস্ত জীবনে বঞ্চিত তাহাদের সহিত ধর্ম্ম বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা বাতুলতা মাত্র। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মনুষ্য সহজেই বুঝিতে পারে, বিচিত্রতাই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, যেখানে বিচিত্রতার অভাব, সেখানে কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। বৈচিত্র্য-বিহীনতা সৃষ্টিনাশের প্রধান কারণ। অনন্তকোটী মনুষ্য জগন্মণ্ডলে বাস করিয়া থাকে, কাহারও মুখের সহিত কাহারও মুখের সাদৃশ্য আছে কি? হাতের পাঁচটা অঙ্গুলি পরস্পর ভিন্ন নহে কি? অনন্ত তরু

অনন্ত লতা, অনন্ত গুল্ম দেখিয়াছ, কিন্তু একটি গাছের ফল, অন্য গাছের ফলের সমান কি? আম, জাম, কাঁঠাল, ডিঙ্গিড়ি, খর্জ্জুর, আনারস প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন নহে কি? তুলা কেমন কোমল এবং লৌহ কেমন কঠিন। অগ্নি কেমন তাপপ্রদ এবং সলিল কেমন শীতল। দেখিতেছ না, প্রকৃতি (সৃষ্টি) কত বিচিত্রতাময়ী। মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে, দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে, জাতিগত রুচির ও সাধনার ভিন্ন ভিন্ন গতি অনুসারে, ধর্মপ্রবৃত্তিও কি কখনও সকল দেশীয়—সকল জাতীয়—মানবের এক প্রকার হওয়া সম্ভব? দয়াময়, পতিতপাবন ভক্তবৎসল ভগবান, ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মহাপুরুষদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্মোপদেশ দিবার ব্যবস্থা করেন, উপদেশের প্রথা বা নিয়ম স্বতন্ত্র হইলেও, নীতি স্বতন্ত্র নহে। দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, কোরাণে যাহা আছে, পুরাণে তাহাই আছে বেদে যাহা আছে; বাইবেলে তাহাই আছে, মহম্মদ যে পবিত্র পথের পথিক, মুসাও সেই পবিত্র পথের পথিক। যে মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব সেই নীতি অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টেরও শুভাগমন। সুতরাং এত বিদ্বেষ, এত হিংসা, এত ঘৃণা, এত কলহ, কূটতর্ক এবং কুসংস্কার কেন? হিন্দু বা মুসলমান, খ্রীষ্টান বা পার্শীক, যে কেহ স্ব স্ব পথে দৃঢ় থাকিয়া, বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের সহিত ভগবানের নামোচ্চারণ করেন এবং তাঁহার চরণাশ্রিত হয়েন, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী, ইহা ধ্রুব সত্য। ভক্ত হিন্দু স্বর্গে যাইবে আর ভক্ত মুসলমান স্বর্গে যাইতে পারিবে না, ইহা অতি ভয়ানক মিথ্যা কথা। খৃষ্টানের খৃষ্টই সত্য আর হিন্দুর কৃষ্ণ মিথ্যা, একথা বলা যেমন ঘোরতর নিবুদ্ধিতা ও নীচতার পরিচায়ক, তেমনি হিন্দুর অবতার সত্য আর মুসলমানের অবতার মিথ্যা, একথা বলাও অত্যন্ত অসত্য এবং অতীব অকোবিদয়ের অকাট্য প্রমাণ। সকল ধর্মের,

সকল শাস্ত্রের, একই নীতি—"দেহ, মন, আত্মা পবিত্র হউক, ভগবানে ভরসা থাকুক, সকল প্রকার পাপ হইতে স্বতন্ত্র হও এবং ব্রহ্মে তন্ময় হইয়া যাও।"তত্বদর্শী জেমস রসেল লাওয়েল লিখিয়াছেন,—

"God sends His teachers unto every age,
To every clime, and every race of men,
With revelations fitted to their growth,
And shape of mind, nor gives the realm of truth,
In to the selfish rule of one sole race,
Therefore, each form of worship that hath swayed,
The life of man, and given it to grasp
The master key of knowledge reverence,
Infolds some germs of goodness and of right

এখন বুঝিতে হইবে—সমুদায় কুসংস্কার, অসূয়া, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দেখিতে হইবে—মহাবীর মহম্মদ কোন শ্রেণীর মানবের মধ্যে পরিগণিত হওবার যোগ্য? প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অসংখ্যাসংখ্য নরনারী করযোড়ে, ভক্তির অশ্রুপূর্ণলোচনে, বিশিষ্ট বিনয় ও বিকম্পন সহকারে যে মহাপুরুষের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে, যাঁহার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে, প্রথমে যাঁহার নাম গ্রহণ না করিলে নেমাজ" (ভগবৎ উপাসনা) হওয়া নিয়ম বরুদ্ধ, এবং যাঁহার নামে সম্রাট হইতে পর্ণকুটিরবাসী কৃষক পর্য্যন্ত ক্ষুধিতকে অন্ন এবং পিপাসিতকে জল দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, তাঁহাকে কোন শ্রেণীর মানবের মধ্যে গণ্য করিতে চাহ? কবিগণ যাঁহার ধর্ম্মপিপাসা—ভগবৎভক্তি—ধর্ম্ম বিষয়ক উদ্দীপনা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গাহিয়াছেন,—

"প্রখর উত্তাপতপ্ত মরুময় দেশে
ধীর তীব্র ধর্ম্মতৃষ্ণা শাস্তিয়া চালিলা

সে উগ্রপ্রচণ্ড স্রোত—বেগে দশদিশে—
ধর্ম্মের। পলকে সে ঘোর বন্যা প্লাবিলা—
বিষম সুতীব্রতম কে পারে রোধিতে
আর বেগ?—এ বিশ্ব সে প্রচণ্ড তরঙ্গে।
অতলান্ত উপকূল বঙ্গসিন্ধু হ'তে
কোটি প্রাণ মাতিল সে তাণ্ডবের রঙ্গে
প্রেমও। বিক্রমশালী সহস্র সাম্রাজ্য
না পারে সাহতে তেজ নামল সম্ভ্রমে
ত্রস্তপাদমূলে। কোটি বাবা নাহি গ্রাহ্য,
দৃঢ় একেশ্বরবাদ স্থির সত্যভ্রমে
সে দিক্‌দিগন্তে ঘোষি তোমারি মহিমা,—
ধর্ম্মাস্বাদ দীপ্ত তুমি অ-ন্ত গরিমা।

এবম্প্রকার মহামহিমান্বিত মহাপুরুষকে তোমার আমার সঙ্গে গণনা করিতে কি প্রবৃত্তি হয়? পারস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ কার্য্যকার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক লেখক, জগদ্বিখ্যাত মাওলানা সেখ সাদি লিখিয়াছেন —

১। রবিবে খোদা আসবক এ আ বরা।
কোশে মজিদশ বু ৮ মোতেকা॥
২। জবার্ত্তা বুরদ দর জাহা জায়গীর।*
শোণায়ে মহম্মদ বুরদ দশ পিজির॥

অর্থাৎ মহম্মদ ঈশ্বরের বন্ধু, ভবের দূত, পরব্রহ্মের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এবং তিনি প্রত্যেকের হৃদয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সেখ সাদি বলিতেছেন, রসুল মহম্মদ কেবল ভগবানের সখা নহেন, তিনি তাঁহার দূতদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "বুরাক" নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া, "আসবক এ আম্বিয়া' (মহম্মদ) সমগ্র বিশ্বমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরুষগণ

—যখন মহম্মদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াও "কিছুই প্রশংসা করা হইল না" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তখন, ভাবিয়া দেখ, আরব দেশের মহম্মদ কত বড় অসাধারণ পুরুষপুঙ্গব। ইনি কি সামান্য মানব? মানব হইলে এতটা হওয়া সম্ভবপর কি? ইনি মানবরূপে দেবতা, ইনি মহাপুরুষরূপে স্বর্গের অন্যতম অমর জীব। ব্রহ্মতেজ না থাকিলে এতটা শক্তি, এতটা সামর্থ, এতটা মহত্ব, কখন কি সম্ভবপর হয়? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জিত মেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমাতেজোংশসম্ভবং॥

সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, ভগবানের কৃপা—ভগবানের তেজাংশ—প্রভৃতি না থাকিলে, মহম্মদ কখনও কি মহম্মদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন? মহম্মদের আদি নাম, পিতৃদত্ত নাম—"আমেদ"। ধর্ম্মপ্রচারক হইবার পরে, তাঁহার মহম্মদ নাম হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন,—

জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
তত্র বেদা নিগদ্যন্তে ভাবা এব মহোত্তমাঃ॥

সুতরাং বলিতে হয়, ভগবান যাহাকে "মহৎ" করিয়াছেন, তোমার আমার অসার নিন্দায়—বৃথা অহংকার বিজিজ্ঞৃত সমালোচনায়—তাহার কি অপমান বা অপবাদ হইতে পারে? শ্রীভগবানের কৃপায় যাহার মহত্ব ও প্রখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার নিন্দার নিন্দাকারীর অধঃপতন ঘটে। এরূপ নিন্দুকের আয়ু ও যশ উভয়ই নষ্ট হয়।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো, ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বানি পুংসোমহদতি ক্রমঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০—৪—৩১)

কার্লাইল, সেল, সেলীবর্গ, আর্ভিং, মুর, মরে, হুইট্নী প্রভৃতি অসংখ্য লেখক মহম্মদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। মহম্মদের নামে

পৃথিবীতে অগণ্য রাজ্য, গ্রাম, নগর, বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, চিকিৎসালয়, দানগৃহ, ধর্ম্মালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। স্বুবর্ণ মুকুটসমাযুক্ত সম্রাট প্রবর হইতে আরম্ভ করিয়া, পথের কাঙ্গালী মুসলমান পর্য্যন্ত সকলেই মহম্মদের নামে মস্তক অবনত করে; মহাবীরের তরবারী, কবির লেখনী শিল্পীর তুলিকা, শস্ত্রধারীর শস্ত্র, মহম্মদের নামে অবনত হয়। ভাবিয়া দেখ, মহম্মদ কি ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ নহেন? পঞ্চদশ শত বৎসর অতিবাহিত হইল, রসুল মহম্মদ মর্ত্ত্যধাম হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন এখনও লোকে তাঁহাকে নিত্য পূজা করিতেছেন। তাঁহার জন্মস্থান ও মরণ-সমাধি দেখিবার জন্য কোটি কোটি মানব, মাঘের শীত, জ্যেষ্ঠের গ্রীষ্ম, সমুদ্রের তরঙ্গ, বর্ষার ঝঞ্ঝাবাত, পথের দস্যুতা অথবা মরুভূমির প্রাণনাশক বায়ুর প্রকোপ প্রভৃতিকে ভুলিয়া গিয়া, প্রেমভরে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে "লা এল্লা মহম্মদ রসুলোল্লা" চীৎকার করিতে করিতে গমন করিয়া থাকে। মহম্মদ মানব নহেন, তিনি দেবতা। যদি তাঁহার মানবত্ব লইয়া বিচার কর, তাহা হইলেও দেখিবে, তাঁহার সময়ে জগন্মণ্ডলে তাঁহার মত পুরুষ আর কেহ ছিল না। *He was the mightiest man of his time.*

মহম্মদ বিবাহিত পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহিত পুরুষ মধ্যে তিনি পরিগণিত হইলেও তাঁহাকে আমরা উদাসী বলিয়াই গণ্য করি। তিনি জনকের ন্যায় গৃহী হইয়াও যোগী—সংসারী হইয়াও পদ্মপত্রের বারির ন্যায় সংসারের সহিত নির্লিপ্ত। দুঃখের বিষয়, মহম্মদের জীবনচরিত এদেশে এখনও আলোচিত হয় নাই। মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য যে গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এখনও উৎপন্ন হয় নাই। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মহম্মদ মেষপালকের কার্য্য করিয়াছিলেন, তদনন্তর চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অতি নির্জ্জনে ভগবৎ ধ্যান, উপাসনা এবং গূঢ়তত্ত্ব

আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের গভীর ভাবে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। চল্লিশ বৎসরের পরে তিনি মর্ত্ত্যজগতে "ভগবানের দূত" বলিয়া পরিচয় দেন। ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি মহাসমাধি অবলম্বন করেন; মদিনা নগরীতে তাঁহার মনোহর সমাধি মন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার বীরত্ব, সত্যপরায়ণতা, স্বাধীনতা, ভগবৎ উপাসনা, ব্রহ্মে তন্ময়তা প্রভৃতি মহৎ গুণে রগুল মহম্মদ বিভূষিত ছিলেন। তিনি অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর বহুমানবের পরমোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, জগতে নবধর্ম্মভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন, মায়াময় অজ্ঞ ও অন্ধ সংসারকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়াছেন, এবং অত্যাচার, অবিচার, অধর্ম, কুসংস্কার, অজ্ঞান প্রভৃতির দমন করিয়া, বিনাশের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে সে সময়ে মধ্য আসিয়াকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মুসলমানদিগের দ্বারা পৃথিবীতে ধর্ম্ম, বিদ্যা, উদারতা, শিল্প, বাণিজ্য, সমরকুশলতা চিকিৎসা প্রভৃতির বহুল চর্চ্চা হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে; ফকির মহম্মদ জগতের ইতিহাসে অন্যতম অপূর্ব্ব অলঙ্কার। ইনি স্বর্গের দেবতা, মায়াময় মর্ত্ত্যের নগণ্য মনুষ্য নহেন। অতুল বিক্রম ও বিভবে বিভূষিত হইয়াও মহামতি মহম্মদ দীনহীন উদাসী (সন্ন্যাসী) ছিলেন। তিনি কখনও বিলাস বা আলস্যকে অবলম্বন করেন নাই। স্ত্রীর প্রতি প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি, জামাতার প্রতি স্নেহ, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, পণ্ডিতের প্রতি যথোচিত আদর, বীরের প্রতি খাতির, ধার্ম্মিকের প্রতি ভক্তি, ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি এবং অত্যাচারীর প্রতি করুণা, মহামতি মহম্মদের জীবনের অলঙ্কার ছিল। তাঁহার এক এক কথায় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত হইত; তাঁহার এক এক নীতিতে পুরাতন পৃথিবী মধ্যে ঘোরতর সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। মহম্মদের এই তেজ এখনও মুসলমান জাতিতে

বিদ্যমান! যতদিন চন্দ্র সূর্য্য, যতদিন আকাশ নক্ষত্র, যতদিন মুসলমান ও মসজিদ, যতদিন "কাবা" ও "কোরাণ" বর্ত্তমান, ততদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত ইস্‌লামের পবিত্র নাম সমাযুক্ত হইতে থাকিবে, ইহা ধ্রুব সত্য। আরব্যের ভবিষ্যৎ বক্তার নিকট কোনও ভদ্রলোক অন্ন বস্ত্রের কষ্টের কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি কহিতেন, "ঈশ্বরে যাহার ভক্তি নাই, ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই এবং ভগবৎবাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই, সে ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না।" মহামতি মহম্মদের বহল উপদেশবাক্যে বুঝা যায় তিনি পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রায়ই গদগদলোচনে উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতেন—"হে প্রভো! তুমি যারে কর সুখী, সেই ত সুখী ত্রিসংসারে। আপন ইচ্ছাতে বল, কে সুখী হে হ'তে পারে?"

মদিনার এক প্রসিদ্ধ প্রান্তরে পরমেশ্বরের প্রার্থনার সময় তিনি কহিয়া ছিলেন "রিজক্ কুণ ফিস্ত মা-এ" অর্থাৎ "মানবের ভোজ্য, ভগবান দেন।" বস্তুতঃ লোকে অন্ন বস্ত্রের জন্ত বৃথা চিন্তা করে; যিনি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের অধিপতি তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কখনই অনাহারে বা উলঙ্গাবস্থায় ক্লেশ দেন না। ভগবানের ভক্ত পুরুষদিগকে অন্ন বস্ত্রের অভাব, স্বয়ং স্বয়ম্ভু পরিপূর্ণ করিয়া দেন।

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
যো সৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥

আর একস্থলে মহামতি মহম্মদ কহিয়া ছিলেন, "আরক্তা রবির বকস্কীন-এ অজা-আমে" অর্থাৎ সুবর্ণ যেমন অনলে পরীক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, কষ্ট দ্বারা ভক্তের তদ্রূপ পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে এবং কষ্ট ভোগেই মানবের ভক্তির উদয় ও ভগবানে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। মক্কানগরীর প্রান্তরে মহামতি মহম্মদ তাঁহার শিষ্য ও সহচর-বর্গকে বলিয়াছিলেন, কেবল ভোজ্য পদার্থ দ্বারা মানবের জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব; ব্রহ্মবাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার দেহ, মন, মস্তিষ্ক ও আত্মা কখনই স্ব স্ব সামর্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

মহম্মদের জন্মগ্রহণের প্রায় সার্দ্ধ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মহাপুরুষ যিশু-খৃষ্টও ঠিক ঐ কথা কহিয়া গিয়াছিলেন,—" A man cannot live by bread alone but by every word that cometh out of the mouth of God." একজন ইউরোপীয় কবি লিখিয়াছেন, "প্রেম, বিশ্বাস ও প্রশংসা এই তিনটি জিনিষ, মানুষের পরমায়ু রক্ষার প্রধান উপাদান"—Man lives by faith, love and admiration

আরব্যবাসীদিগের অনুপম অবতার শ্রীমৎ মহাপুরুষ মহম্মদ পর্ব্বত গুহায়, গৃহের নির্জ্জন স্থানে অথবা লোকালয়শূন্য প্রান্তর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এবং সামান্য পশুলোমনির্ম্মিত ছিন্ন কম্বলে দেহাবৃত করিয়া নীরবে ভগবানের আরাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। আরাধনার সময় তাঁহার সমস্ত সুন্দর শরীর দেবোপম তেজ ও জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। উপাসনাকালে তাঁহার সৌন্দর্য্য শত সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইত। কৃপণেরা যেমন গোপনে পুনঃ পুনঃ তাহাদের ধন গণনা করে এবং দিবা রাত্রি মনোমধ্যে তাহারই আলোচনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবানের নাম ও মহিমা, মহামতি মহম্মদের প্রতিমুহূর্ত্তের ধ্যান বিষয় ছিল। বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ। কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবক্ষয়ে॥

অনেকগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষের বিশ্বাস এই যে, মহম্মদ এবং তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ কেবল শাণিত তরবারি প্রয়োগে, বলপূর্ব্বক, মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পৃথিবীর বহুল জনস্থানকে ইশলামীয় রাজ্যে পরিণত করেন এবং তদ্দেশবাসীবৃন্দকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মিষ্টর জর্জসেল নামক এক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রায় বিংশ বৎসর কাল আরব্য দেশে বাস করিয়া আরব্য ভাষায়, মুসলমান সমাজ-তত্ত্বে, ইশলামীয় ধর্ম্মে এবং কোরাণ গ্রন্থ সম্বন্ধে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় সমগ্র কোরাণখানি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। সেল সাহেব, মুসলমান ধর্ম্মের ঘোরতর

বিরোধী, কিন্তু তিনি মুসলমান ধর্মের প্রচার ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, আমি তাহা তাঁহার কোরাণের উপক্রমণিকা হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। সাহেব লিখিয়াছেন,—"Mahomed, the lawgiver of the Arabians, founded an empire which in less than a century spread itself over a greater part of the world than the Romans were ever Masters of. The religion of Mahomed met with an unexampled reception in the world. They are greatly deceived who imagine it to have been propagated by the sword alone. Mahomedanism has been embraced by nations which never felt the force of Mahomedan arms, and even by those which stripped the Arabians of their conquests, and put an end to the sovereignty and very being of their Khaliffs; yet it seems as if there was something more than what is vulgarly imagined in a religion which has made so surprising and unexampled a progress" যাহা হউক, সংসার নৈতিক এবং আধ্যাত্ম নৈতিক এই উভয় চক্ষুই আরব্যের মহামতি মহম্মদ দেবতা এবং অমর।

সকলে এন্সীমে ব্যায় খোদা থা, মুঝে মালুম ন থা।
হকসে না হক্ ম্যায় যুদা থা, মুঝে মালুম ন থা॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মহম্মদের পবিত্র মুখেতাঁহার শিষ্যেরা এই গীত স্থাপন করিয়া তাঁহার দেবত্ব এবং অমরত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।*

* এই প্রবন্ধ মিশর দেশের অন্তর্গত কায়রো (Cairo) নগরের "আল্‌কলা" নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাচার পত্রে তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। — প্রকাশক।

# প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

"দ্যাখ্‌রে দেখ্‌ প্রেমতরণী, হৃদয় ভরে ধায়।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নোদে ভেসে যায়॥"

বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে স্বরূপগঞ্জের নিকটে যেখানে শ্যাম সলিলা খড়িয়া নদী এবং পূতঃ সলিলা ভাগিরথী একত্রে উজ্জলে ও মধুরে মিশিয়াছে, সেই সুন্দর সঙ্গম সম্মুখে, পবিত্র নবদ্বীপ নগর প্রেম ও ভক্তির কি অপূর্ব্ব সম্মিলনস্থল! প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, এই মহা পবিত্র নগরে, মায়াপুর নামক স্থানে, সুব্রাহ্মণ বংশে, ভক্তবৎসল ভগবান, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্ত, এবং হরিনাম বিতরণ করিয়া লোক শিক্ষার জন্ত শ্রীশ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের উদ্ধার এবং পাপীর পরিত্রাণ সাধন করিয়াছিলেন। চারিশত বর্ষ কাল অতিবাহিত হইল নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ ভূলোক হইতে স্বঃলোকে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রেম ও ভক্তি সমগ্র বিশ্বসংসারকে এখনও মাতাইয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত ভক্ত যখন ভক্তিভরে অবনত মস্তক হইয়া এই পবিত্র ভূমিতে— শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানে—পুলকিতান্তঃকরণে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বোধ হয় যেন পতিতপাবনী ভাগিরথীতটে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সুকণ্ঠ পারিষদগণ অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন—

"কোথারে দীন দুঃখী তোরা আয়রে ত্বরা, গোরাচাঁদের প্রেম বাজারে।
হরিনাম মিঠাইপুরী, ক্ষীর কচুরী, লোয়ে যা বিনা দরে॥"

সেই প্রেম ও ভক্তি-সাগরের বন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল; এরূপ প্রগাঢ় ঐশিক প্রেম এবং ত্রিদিব সম্ভাতা ভক্তির ইতিবৃত্ত জগতের ইতিহাসে আর আছে কি?

কে লবি রে গৌরপ্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নোদে ভেসে যায়॥"

সেই প্রেমতরণীর অপূর্ব্ব দৃশ্যে হিন্দু ও মুসলমান হৃদয় মন্ত্রমুগ্ধ। সেই প্রেমের বন্যায় শান্তিপুর ডুবুডুবু হয় এবং নদীয়া ভাসিয়া যায়। শান্তিপুর ও নবদ্বীপ কেন, সমগ্র জগত সেই অপূর্ব্ব প্রেম ও ভক্তিতে ভাসিয়া গিয়াছিল।

পাঠক মহাশয়। একবার ঐ খড়িয়া এবং জাহ্নবীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। খড়িয়ার জল যেন প্রেমসলিল এবং ভাগিরথীর সলিল যেন ভক্তিজলরূপে প্রবাহিত। এক দিক হইতে প্রেম এবং আর এক দিক হইতে ভক্তি আসিয়া নদীয়া প্রধৌত করিতেছে, এই উভয় জলের সম্মুখে প্রেম ও ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের আবির্ভাব। সংসার-তাপে দগ্ধ হইয়া, এই কঠোর নর-জীবনে জরাগ্রস্ত হইয়া, মায়াময় মানব যখন প্রাণত্যাগ করে, যখন তাহার পুত্রকলত্র আত্মীয় বন্ধু দাসদাসী সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, যখন সংসার আর তাহাকে চায় না, যখন তাহার সেই মৃত শরীরকে পূতিগন্ধ বিশিষ্ট আবর্জ্জনাপূর্ণ অস্পৃশ্য স্থানে নিক্ষেপ করিবার জন্য সকলে উদ্যত হয়, তখন দয়াময়ী মাতা ভাগিরথী সেই মানবশরীরের দিকে চাহিয়া বলেন, "হে সংসার তাপদগ্ধ বৎস! তোমাকে জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে, তুমি সংসারের নিকটে পরিত্যক্ত হইয়াছ, কিন্তু বাছা! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না, আমি দীন দুঃখী ভক্তের ভরসা, আইস, বৎস! আমার ক্রোড়ে আইস।" তখন সেই হিন্দুর মৃত শরীর সেই বিষ্ণুপদোদ্ভবা পতিতপাবনী পূতঃ সলিলা জাহ্নবীজলে স্নিগ্ধ তরঙ্গের সহিত অনন্তে মিলিয়া জন্মজন্মার্জ্জিত মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, এবং অক্ষয় অক্ষয়ানন্দ ভোগ করে। সেইরূপে, ধনাভিমানী—বিদ্যাভিমানী—বিক্রমমদমত্ত অপকর্ম্মী মানব যখন দীন দুঃখীকে পরিত্রাণ বা মুক্তির পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, এবং দীন হীন ভক্ত যখন অকিঞ্চ জলে ভাসিতে ভাসিতে কাতর প্রাণে ভগবানের পদারবিন্দ স্মরণ করিতেছিল, তখন ভগবান বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই, মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!

আমি শ্রীনবদ্বীপধামে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম ও ভক্তির অবতারমূর্ত্তিরূপে নর-দেহ ধারণ করিয়া—দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ, মহাপাপীর পরিত্রাণ দর্পকারীর দর্পহরণ পাষণ্ডের দলন এবং জীবের উদ্ধার সাধন করিব। মুক্তির পথকে সহজ সরল ও সুগম করিয়া মায়াময় অজ্ঞানী জীবের উদ্ধার করিব। তোমাকে জগতের ধনমদমত্ত, বিত্তামদমত্ত বর্ণমদমত্ত লোকেরা তুচ্ছ ভাবিয়া অন্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে, আইস বৎস। আমি তোমাকে (মৃত শরীরের গঙ্গাক্রোড়ে আশ্রয়ের ন্যায়) আমার কোলে স্থান দিব। আমি দীনের অবতার, আমি দুঃখীর সখা আমি দরিদ্রের ভরসা। আমি ফকির দরিদ্রতা আমার সহচর, যে আমার কোলে আইসে, বিনয়, নম্রতা, দীনতা ও সাধুতা তাঁহার সব্ব প্রথম অলঙ্কাররূপে গণ্য হয়।"

দরিদ্রের এই অবতার সমস্ত জীবন দরিদ্রভাবেই কাটাইয়াছেন, তাহাতেই বাউল দাস গাহিয়াছেন,—

> যদি গৌর চাও ধনি। কাঁথা লও।
> কাঁথা লবি, সঙ্গে যাবি, আনন্দে গাছ তলায় রবি,
> দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হবি মুখে সদা হরি হরি কও।
> যদি গৌর চাও ধনি। কাঁথা লও ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ দেব এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমস্ত জীবন এই কাঁথা লইয়াই জীবন কাটাইয়া অসামান্য ফকিরি ব্রতের উদযাপন করিয়া ছিলেন। তাহাতে ভক্ত গাহিয়াছেন—

> ফকিরি করিবি? পারিবে তো মন।
> ফকিরি নয় সামান্য হোতে হয় দীন দৈন্য,
> ফকির হোলেন শ্রীচৈতন্য, উদ্ধারিতে জগতজন।
> ফকিরি কোর্ত্তে পারিবে মন ॥

সেই ফকির—চৈতন্য, দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ। যিনি কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া অঙ্গুলির উপরে গিরি গোবর্দ্ধন ধারন, জরাসন্ধ শিশুপাল ও

কংশের নিধন, সাধুর পরিত্রাণ দুষ্টের দমন, পাণ্ডবের দলন, ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন গীতা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার, অলৌকিক লীলা দ্বারা অজ্ঞানীর জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন এবং শ্রীশ্যামরূপে শ্রীমতি রাধিকা সুন্দরীর মন প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপে মুসলমান শাসন সময়ে তিনিই গৌররূপে আবির্ভূত হইয়া প্রেম ও ভক্তির প্রচার দ্বারা জীবের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। দিব্যচক্ষুমান ভক্তাধিক ভক্তেরা তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,তাহাতেই তাঁহারা মধুর স্বরে গাহিয়াছেন,—

কে হে নোদে এসে গৌর বেশে হরি তোরে বলছো 'হরি'।
কোথা তোর মা যশোদা,          কোথা তোর শ্রীদাম সখা,
কোথা রে তোর ব্রজপুরী ॥

যাঁহার মধুর মধুর মধুর নাম উচ্চারণ করিলে সর্ব্বশরীর অদ্ভুত পুলকে উৎফুল্ল হয় যাঁহার সুন্দর সুন্দর সুন্দর শ্রীরূপ স্মরণ করিলে হৃদয় সরোবরে আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয় যাঁহার ঐশী কৃপায় মহাপাপী জগাই মাধাই জীবন্মুক্ত হইয়া জগতবাসীর হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দের উৎপাদন করিয়াছিল যাঁহার পবিত্র পবিত্র দেবশরীর স্পর্শে কত শত জনের জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপের পরিত্রাণ হইয়াছিল যাঁহার অনন্ত মহিমায় মন্ত্র মুগ্ধবৎ হইয়া যবন হরিদাস শ্রীহরির প্রিয় শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন যাঁহার অতুলনীয় এবং অনধিগম্য পাণ্ডিত্যে পৃথিবীর মহা মহা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল যাঁহার সুমধুর ধর্ম্ম প্রচারে শুষ্ক বঙ্গভূমি প্রেম ও ভক্তির সুশীতলনীরে সিক্ত হইয়াছিল যাঁহার বড়ভুজ দর্শনে বালেশ্বরবাসীগণ ঈশ্বর বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল, যাঁহার কৃপাকটাক্ষে কত শত জন্মান্ধ জন্মখঞ্জ এবং জন্মরোগী মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া ভক্তের অলৌকিক ক্ষমতা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং যাঁহার দেবোপম চরিত্র ও স্বভাব সমস্ত জগতকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, আমি ( অধম ) সেই শ্রী শ্রীশ্রী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পবিত্র

পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে একবার নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি।

নবদ্বীপ! নবদ্বীপ! তুমি অচেতন ভূমিখণ্ড হইলেও, তোমার স্থান মাহাত্ম্য লোপ পায় না। আমি তোমারও সম্মুখে অবনত মস্তক হইতেছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম শ্লোকে পাঠ করিয়াছি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে এই জন্ত উদ্বেগ জন্মিয়া ছিল যে, পাছে ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্যে যোদ্ধৃদিগের মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হইয়া এই মহা কুরু পাণ্ডব সমর বন্ধ হইয়া যায়। এখন বুঝিলে কি, অসৎ পুস্তক, অসৎ আহার, অসৎ স্থান প্রভৃতির যেমন অসৎ প্রভাব ( Influence ) থাকে, সেইরূপ পবিত্রস্থান পবিত্র লোক, পবিত্র ব্যবহারেরও প্রভাব আছে। পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য ( Influence ) লোপ পায় না, তাহাতেই যুযুৎসুবীরগণ এবং এমন কি সমরোৎসাহী মহাবীর অর্জ্জুনও 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। য়িহুদীদের, বৌদ্ধদিগের, মুসলমানদিগের এবং খৃষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্রেও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাহাতেই বলিতেছি, হে নবদ্বীপ! তুমি পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, আমি ( অধম ) তোমার পবিত্রভূমিতে পদার্পণ করিতেছি বলিয়া কুষ্ঠিত হইতেছি, আমি অবনত মস্তক হইয়া বিনীত ভাবে তজ্জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি। নবদ্বীপ! নবদ্বীপ! এই মহাপাপীর অধম পদস্পর্শ জনিত অপরাধ জন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা কর। নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, বৃক্ষ ব্রততী পথ ঘাট অট্টালিকা দেব দেবালয় কীর্ত্তিমাঞ্চ প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাই, তরু লতায়, বিহঙ্গবর্গের কুজনে অথবা নরনারীর মুখে যাহা কিছু শুনিতে পাই, তাহাই সেই

মহাপ্রভু নবদ্বীপ চন্দ্রের তবলীলাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নিশির অবসান হইতে দ্বিতীয় নিশাকাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব, আউল, বাউল, মোহান্ত, পাণ্ডাইৎ প্রভৃতির সুকণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর সংগীত শুনিতে পাই, খোল করতাল খঞ্জনী প্রভৃতি যন্ত্রযোগে অনবরত নিসৃত সেই মধুর মধুর মধুর হরিনাম কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, আর সেই দেবদুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি সমস্ত নবদ্বীপকে মাতোয়ারা করিয়া তুলে। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে সায়াহ্নে ও রাত্রে মধুর নৃত্য, বৈষ্ণবের প্রেমালিঙ্গন, ভক্তের "দয়াল গৌর" "দয়াল গৌর" বলিয়া গদগদভাব, ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ, স্তোত্রাবৃত্তি প্রসাদ, ভক্তদের মহোৎসব এবং শীকণ্ঠ নিঃসৃত "রাধা কৃষ্ণ মধুর ধ্বনি সমগ্র নবদ্বীপকে এক অপূর্ব্ব ঐশী প্রেমে প্রমত্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিবেক বিহীন মায়িক মানবেরা বলে ইহারা সকলে পাগল। জগাই মাধাইও একদিন তাহাই বলিয়াছিল। ভক্তাধিক ভক্ত রামপ্রসাদ অহোরাত্রই ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন, অল্প বুদ্ধি লোকে ভাবিত "রামপ্রসাদ যেন সুরাপান করিয়া মাতাল হইয়া গিয়াছে।" রামপ্রসাদ গাহিলেন—

"সুরাপান করি না আমি, সুধা খাইয়ে কুতূহলে।
* আমার মন মাতালে মজে আছে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥"

শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন এ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই জীবনের শেষ ভাগে বলিয়াছিলেন "পাগল না হইলে মজা নাই।" (তাঁহার Religion Its Philosophy and Madness বক্তৃতা পড়ুন) ভক্ত আউল দাস গাহিয়াছেন—

নিতাই পাগল, মাধাই পাগল, আর পাগল গৌরাঙ্গ।
ওরে ভাই! সাত পাগলে মেতা করে, তাবায়ে দিলে বঙ্গ॥

রোমকেরাও একদিন ভগবৎ প্রেমী সাধুগণকে "পাগল" বলিয়াছিল, অবিশ্বাসী য়িহুদীরাও খৃষ্টকে উন্মাদ কহিত। এই জন্যই ঈশা পাগল আর মুসা পাগল। যাহা হউক এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র যখাথ

সাধন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি এখনও জীবিত, তাঁহার সুন্দর কণ্ঠের সুস্বর এখনও জগতকে প্রমত্ত রাখিয়াছে সেই শ্রীমুখার বিন্দের মধুর বাণী এখনও জগতকে মাতোয়ারা করিয়া রাখিয়াছে। তিনি মৃত নহেন, মহাপুরুষেরা কি মরেন? মৃত্যু কেবল তোমার আমার জন্ত, তুমি আমি যদি আবার এই মায়াময় সংসারে এই পাপপূর্ণ কঠোর জীবন যাপন জন্ত, মহাপুরুষেরা অন্তর্দ্ধান করেন অনন্তে মিলিবার জন্য। মহাপুরুষের কি মৃত্যু আছে? তাঁহা'র ইচ্ছামৃত্যু যোগনিদ্রা, তিনি অনাদি অনন্ত, সদাই জীবিত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত মনুষ্য নহেন, দেব নহেন, তিনি মহাপুরুষ রূপে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।। পূতসলিলা ভাগিরথীর পবিত্র তটে এই নবদ্বীপ নগরে, এই মধুর বসন্ত ঋতুতে দণ্ডায়মান হইয়া একবার বিশ্বাসের চক্ষে ঐ নীলাকাশের দিকে চাহিয়া দেখ; নিমাইএর অমর ভক্তবৃন্দ সেই বজসুন্দর নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগোরাঙ্গের অনুপম গৌরমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিতেছেন—

> ঝাথরে ঝাথ প্রেমতরঙ্গী, হৃদয় লোরে যায়।
> শক্তিপুর ডুবুডুবু, নোদে ভেসে যায়॥

এই মূর্ত্তি কি মানুষের? এই মূর্ত্তি কি মানুষের হইতে পারে? আবার বলি এই অনুপম মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গৌরমূর্ত্তি। যিনি অযোধ্যায় রঘুনন্দন রাম যিনি মথুরায় নবঘনশ্যাম আজ তিনিই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ।।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ এখনও কীর্ত্তন করেন সেই কীর্ত্তন সংগীতের প্রথা জগতে অতুল্য অমূল্য। এই নবাবিস্কৃত মধুর সংগীত—প্রথা মহাপ্রভুর নিজের প্রবর্ত্তিত। তাঁহার ভক্ত শিষ্য পারিষদ ও উপাসকদিগের নিকট বঙ্গভাষা, বঙ্গ সাহিত্য, ধর্ম্মতত্ব সংগীত বিদ্যা বিশেষরূপে ঋণী, তাঁহাদিগের দ্বারায় ভক্তিতত্ব ও প্রেমতত্ব অত্যন্ত সুগম সহজও পরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে শ্রীচৈতন্ত ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, এজন্ত সর্ব্বত্রই সেই প্রচারের প্রভাব এখনও বর্ত্তমান।

উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটনাগপুরে বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পঠিত, ব্যাখ্যাত ও কণ্ঠস্থ হয়। উড়িষ্যার স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিবার সময় মহাপ্রভুর নামে অঙ্গীকার করে, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা একেবারে অমার্জ্জনীয় মহাপাপ। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব বাঙ্গালীকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী-কুলগৌরব, বঙ্গবাসী তাঁহার গৌরবে ও মহিমায় গৌরবান্বিত এবং মহিমান্বিত। নবদ্বীপের আর এক দৃশ্য অতি চমৎকার। যে স্ত্রীজাতি তাঁহার মাথার কেশকে প্রধানধন বলিয়া গণ্য করেন, মাথার মূল্যবান মণিকে ফেলিয়া দিয়া মাথার কেশকে রক্ষা করিতে যে জাতি যত্নবতী, এই নবদ্বীপে—এই গঙ্গাতটে—এই পবিত্র তীর্থে—সেই স্ত্রীজাতির বহুসংখ্যক লোক আসিয়া অকাতরে হাস্যবদনে মাথা মুড়াইয়া তাঁহাদের রমণীয় কেশগুচ্ছ শ্রীগৌরাঙ্গের পদ কমলে ভক্তিভরে অর্পণ করতঃ পরমা বৈষ্ণবী মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়েন। কি আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ! ইহাদের শ্রীমুখারবিন্দনিঃসৃত "জয় রাধে রাধে" "জয় রাধাকৃষ্ণ" "জয় গৌর হরি" বুলীতে নবদ্বীপ মাতিয়া উঠে। ইহারা ছাড়া নেড়ার "কুঞ্জকামিনী" নহেন, এই প্রেমপিপাসিনী বৈষ্ণবী সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসিকা—শ্রীমতী মানময়ী শ্রীরাধিকার সেবিকা। ইহারা গৃহ, ধন, আত্মীয়, বান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলিমাত্র সম্বল লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পদে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। কি অসাধারণ আত্মোৎসর্গ।

ইহারা শ্রীমতী কিশোরীরই অতিশয় ভক্তা ও অনুগতা। রাইপ্রেমে ইহারা উদাসিনী ও পাগলিনী। ইহারাই বুঝিতে পারিয়াছে—

প্রেমমাখা অপঘন, অপঘন প্রেম।
বাধা নহে শুধু বাধা, সুধামাখা হেম॥

এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। যিনি ত্রিগুণাতীত, দেশকাল পাত্রাতীত, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, সত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বশক্তিমান এবং গুণাতীত

ও নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বগুণের আধার এবং আকর, যিনি রূপের রূপ, জ্যোতির জ্যোতি, আনন্দের আনন্দ এবং জ্ঞানের বিজ্ঞান, যিনি স্বয়ং পূর্ণ পরব্রহ্ম, তাঁহার গুণাবলী কি মানুষে বর্ণনা করিতে কখনও সমর্থ হয়? সেই অবর্ণনীয় "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ নগরে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর শ্রীকণ্ঠনিসৃত সুমধুর হরিনামের অভ্যন্তরে যে মনোমোহনরূপ দেখিতে পাই তাহাই শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রের ভক্তি ও প্রেমরূপ, স্বয়ং ভগবান ভক্তি ও প্রেমাবতার রূপে নবদ্বীপে এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য!! হরিনাম বিলাইয়া জীবের উদ্ধার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি এখনও বলিতেছেন—

"হরিনাম লইতে অলস করোনা, যা হ'বার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলিয়ে, ঢেউ দেখে কি নাও ডুবাবে?"

সুতরাং মায়ামুগ্ধ জীব! আর কত দিন হেলায় রতন হারাইবে? একবার অন্তর ভরে বদন ভরে হরিনাম উচ্চারণ কর। এই হরিনামে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয়, দুঃখীর দুঃখ মোচন হয় এবং ভবসাগর পার হওয়া যায়। "হরিনাম বল বল, এ নামে থাকবে ভাল।" এই ক্ষণভঙ্গুর সংসার সরাইয়ে শ্রীহরির মধুর নাম কীর্ত্তন বড়ই সহায়, বড়ই অবলম্বন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার ন্যায় এক মহা পুরুষের আবির্ভাবের আবশ্যকতা ছিল। আবশ্যক না হইলে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়েন না। যখন ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন সত্যের ও ন্যায়ের রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন পাপে, অসদাচারে, অত্যাচারে, অনাচার, অরাজকতায়, অজ্ঞানে, অনিয়মে, স্বেচ্ছাচারে, ভয়ানক ধর্ম্মগ্লানিতে সাধুগণের প্রতি উৎপীড়নে অথবা দুষ্কৃতি সম্পন্ন লোকদিগের অহঙ্কারে দেশ, সমাজ বা রাজ্য প্রকম্পিত হয়, যখন মানুষের চেষ্টায় আর মানব সমাজ রক্ষা হইবার উপায় থাকে না, যখন নিরুপায়

হইয়া চক্রের জল কেনতে ফেলিতে মানবেরা ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে তখনই সেই দয়াময় পরম পিতা পরমেশ্বর পূর্ণঅবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন অথবা কোনও নির্ব্বাচিত মনুষ্যকে অবতারের সামর্থ দান করিয়া তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সমাধা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের অত্যন্ত উন্নতি অথবা অত্যন্ত অধোগতি এই দুইটি অবস্থা ভিন্ন অবতারের আবির্ভাব হয় না। ধর্ম্মের সম্পূর্ণ উন্নত অবস্থায় অবতারেরা যে উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য আগমন করেন, ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবনত অবস্থায় তাঁহারা সে উদ্দেশ্য জন্য আগমন করেন না। প্রথম উদ্দেশ্য দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতে ভিন্ন, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাতেই অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধোগতির অবস্থাতেই অবতারের সম্যক প্রয়োজন। এই জন্য রাবণ, তাড়কা, মারীচ প্রভৃতির বধার্থে রামের আবির্ভাব, জরাসন্ধ, কংস প্রভৃতির নিধনার্থে কৃষ্ণের আবির্ভাব, আওরঙ্গজেবের শাসনার্থ শিবজীর এবং পোপের অত্যাচারের দমনার্থ মার্টিন লুথরের আবির্ভাব। মুসলমানের অধার্ম্মিক ব্যবহারের প্রশমন জন্য শিখ ও মহারাষ্ট্রার উদ্ভব, য়িহুদীর দমন জন্য খৃষ্টের এবং মধ্য আসিয়ার যথেচ্ছাচারীদিগের শাসন জন্য মহামতি মহম্মদের আবির্ভাব। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব কোনও রাজা বা কোনও বীরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন নাই, তিনি কোনও সম্রাট বা সেনাপতির বিরোধী হইয়া অবতাররূপে আগমন করেন নাই। তিনি পাপের, অসত্যের, অসদাচারের, অনিয়মের, অজ্ঞান অন্ধকারের, মায়ামোহের এবং ভগবৎভক্তিহীনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অজ্ঞানের শুষ্ক ভূমিকে ভক্তিবারি দ্বারা সিক্ত করিয়া হরিনামের বীজ বপন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই ভগবৎভক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া দিবার জন্য তিনি অবতার রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যখন এদেশে যবনের অত্যাচারে ভক্তাধিক ভক্ত হিন্দু মনপ্রাণ খুলিয়া মধুর হরিনাম উচ্চারণ করিতে সাহস করিত না, যখন পদে পদে তামাসক মুসলমানগণ হিন্দুকে

জ্ঞাক্তরসাস্বাদনে বঞ্চিত করিবার জন্ম অত্যাচার করিতেছিল, যখন এদেশে সদাচার, সাত্বিক ব্যবহার, প্রকৃত জ্ঞানের ও ভক্তির স্রোত প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, যখন হরিনাম ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের অন্ত উপায় ছিল না, যখন বঙ্গদেশ অজ্ঞান অন্ধকারে শ্রীহরিকে ভুলিয়া গিয়া এবং সত্বগুণকে উপেক্ষা করিয়া রজঃ ও তম গুণের কণ্টকিত বনে রক্তাক্ত কলেবর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি শ্রীধামনবদ্বীপে শ্রীচৈতন্ত নাম গ্রহণ করিয়া কোটি কোটি মৃত মানবের দেহে আধ্যাত্মিক জীবন দান করিয়াছিলেন। কতশত চণ্ডাল যবন, মেথর প্রভৃতিও তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নর জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছে। তাঁহার দেবোপম মূর্ত্তি, অতুলনীয় ঐশী পাণ্ডিত্য, ভগবৎ ভক্তি এবং অসাধারণ দৈববল দর্শন করিয়া মনুষ্যে বুঝিয়াছিল "আমরা যাহা নিজ নিজ শক্তিদ্বারা সংসাধন করিতে সমর্থ হই না, জগতের সাহায্যে আমরা যাহা করিতে সক্ষম হই না [illegible] তাহা আর কেহ দিতে পারে না, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত দেব আমাদিগকে সেই অমূল্য ধন বিনামূল্যে দিতে আসিয়াছেন। ইনিই আমাদের উদ্ধারকার্য আমাদের পরিত্রাণের জন্ম ইহাঁর আবির্ভাব।" তখন সেই অপূর্ব্ব মনোমোহন দেবমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া, ভক্তিভরা মনে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, করযোড়ে, নবদ্বীপবাসীবৃন্দ যাহা গাহিয়াছিল, তাহারই একটু সামান্য মাত্র নমুনা গ্রহণ করিয়া নিম্ন লিখিত গীতটি রচনা করিয়াছি।

গীত।—তাল ঠেকা। যাত্রাওয়ালাদের যুড়ীর সুর।

আমি নিজগুণে তরিতে পারি, হেন আশা নাহি আর।
তোমার করুণা ভরসা মম, ওহে দয়াল অপার॥
জগতের শক্তি যত দেখিয়াছি রীতিমত,
তারিতে অধম পতিত, সাধ্য আছে বল কার॥

কোথা ওহে প্রাণসখা, হৃদিমাঝে দাওহে দেখা,
করিতে সরল হৃদয় বাঁকা, সাধ্য আর আছেকার ॥
মায়াময়ী এই ধরিত্রি, মোরা সব ক্ষণিক যাত্রী,
যে জপে তোমায় দিবারাত্রি, অনন্তে তার অধিকার ॥
বসে আছি সিন্ধুতীরে, তব নাম হৃদে ধরে,
ইচ্ছা হবে যবে হাতে মোরে, কোরো ভব সিন্ধুপার ॥
বিরচি প্রেমের অঞ্জলি, প্রাণ দিব ঐ প্রাণে ঢালি,
পিতা প্রভু সখা বলি, পুলকে পূরুক দেহ আমার ॥
কহে কাঙ্গাল ধর্ম্মানন্দ, পাপেতে মানুষ অন্ধ,
ছেড়ে সবে সকল মন্দ, সর্ব্বানন্দে কর সার ॥*

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

## "চোখ্ গেল"।

"Is thine eye evil because I am good"? Mathew X X 15.

ঐ দেখ, ঐ দেখ, ঐ অনন্ত অখণ্ড অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ নিদাঘের নীল আকাশের কোলে কি একটা বিচিত্র বিহঙ্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, উড়িয়া উড়িয়া, খেলিয়া খেলিয়া, কেমন বিশুদ্ধ তান-লয় সমন্বিত সুস্বরে বারবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল"! পাখির কথা পাখিরাই বুঝে, মানুষে বুঝিবে কেন? যাহা যাঁহার মনের কথা, তাহা তাঁহার সমশ্রেণীর অথবা স্বজাতির কিম্বা স্বগৃহের লোকেই বুঝিতে পারে, অপরে বুঝিতে পারে কি? এই জন্য "নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, গুণবান পর পর

*এই গীত গাহিবার সময়ে প্রত্যেক চরণের শেষে "ওহে দয়াল কৃপাময়" গাহিয়া প্রথম চরণের পংক্তি গাহিতে হয়।

সদা।" পাখির সুস্বর সমন্বিত কথা আমি বুঝিলাম না, অবাক হইয়া অব্যর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নাচিয়া নাচিয়া, মনের আনন্দে, ঐ বিমানবিহারী বিহঙ্গ আবার বিনোদ রবে ডাকিল—"চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল"। ঐ বিচিত্র বিহঙ্গের কম্পমানী ঝঙ্কারে সমগ্র নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কি আশ্চর্য্য ঝঙ্কার! কি মধুময় কণ্ঠস্বর! আমি বরিশালের কোনও সম্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাটীতে অতিথি হইয়া তাঁহার উদ্যান গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ এই দিকদিগন্তব্যাপী কুলক কূজনে আমার তন্দ্রার পুলক হইল। আকাশের পাখি আবার ডাকিল—চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল। মনে মনে ভাবিলাম, পুনঃ পুনঃ এই পক্ষীবর 'চোখ্ গেল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে কেন? কাহার চোখ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া পাখি এত কাতরতা প্রকাশ করিতেছে? কাহার চোখের জন্য পাখির এত মনোবেদনা তাহার কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইতেছে? চিন্তা দ্বারা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারিলাম না, বিহঙ্গবরের বিচিত্র স্বর চুম্বকে আমার চিত্ত লৌহ ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পাখি আবার ডাকিল "চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল"। ভয়ে ভয়ে আমি আমার নিজের চোখে হাত দিয়া দেখিলাম, আমার চোখ্ যায় নাই, পার্শ্বে যে যুবক ব্রাহ্মণ শয়ন করিয়া শান্তি লাভ করিতেছিল, তাহারও চক্ষুদ্বয়ে হস্ত বাঁধিয়া দেখিলাম, তাহারও চোখ যায় নাই। তখন ভাবিলাম, তবে কাহার চোখ্ গেল? ইত্যবসরে সেই পক্ষিরাজ একটি সুরম্য তরুর শাখায় উপবেশন করিয়া নবপল্লব রাজির মধ্য হইতে আবার তান ছাড়িল—চোখ্ গেল, চোখ, গেল, চোখ্ গেল।। পাখির স্বর শুনিতে শুনিতে আমি অবাক হইয়া রহিলাম, ক্রমে নিদ্রামাতা আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে স্থান দিলেন, আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। দিবা নিদ্রার অভ্যাস না থাকিলেও আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, নিদ্রাবস্থায় এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "হে মহানুভব! হে ঋষিরাজ! এই পাখির অনবরত চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, স্বরের অর্থ, আপনি কি বলিতে পারেন?" সেই পুরুষোত্তম যোগীরাজ মৃদু মধুর হাস্ত করিয়া উত্তর করিলেন "এই বিহঙ্গকে সম্যদর্শী ও সর্বজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র মানবজাতির মনের যাহা ভাব, তাহা এই পাখির সুস্বরে প্রকাশ পাইতেছে। পাখির এই চীৎকার, মানব-হৃদয়ের উজ্জল চিত্রস্বরূপ।" এই কথা বলিয়া মহাপুরুষ আমাকে অতি গোপনে কোন উপদেশ প্রদান করিলেন তাহাতে আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল, আমি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম, কেবল এই পাখি নহে, সমগ্র বিশ্বসংসার মুহূর্মুহ অনবরত মনোবেদনায় চীৎকার করিয়া বলিতেছে—চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল!! আমার আবার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমি আবার সবিতালোকময় শাশ্বত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। পাখি তখনও ডাকিতেছে, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল!!

বুঝিলাম, ধনীর ধন দেখিয়া তাহার নির্ধনী প্রতিবাসীর হিংসায় চোখ্ যায়, মানীর মান দেখিয়া অপমানিতের চোখ্ যায়, বিদ্বানের বিদ্যা ও শিক্ষা দেখিয়া মূর্খের চোখ্ যায়, আর শ্রীমান্ যুবকের শারীরিক সৌন্দর্য দেখিয়া সতীত্বহীন ভামিনীর চোখ্ যায়, তাহাতেই সে কুটিল কটাক্ষ-বাণ হানিয়া মনে মনে মর্মবেদনায় বলে চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল!! বল দেখি, এ সংসারে কাহার চোখ্ যায় না? ন্যায়শাস্ত্র ও আইনশাস্ত্র বড়ই জটিল, এইজন্য নৈয়ায়িক ও ব্যবহার-জীবিরা প্রায়ই কুটিল হন। ইঁহারা কূট তর্ক সম্ভূত বুদ্ধি দ্বারা যাহা সিদ্ধ করে, সেই সিদ্ধান্তের অসারত্ব বর্তমান থাকিলেও ইঁহারা ভ্রমাত্মক চক্ষে সমগ্র জগতকে ইঁহাদের অপেক্ষা হীনতর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়। শ্রেয়ঃ পথাপেক্ষা প্রেয় পথকে প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তথাপি অপরের সত্তা ও সার যুক্তির সম্মুখে মস্তকাবনত করিতে ইঁহারা সম্মত নন। ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম মুনি "অক্ষিপদ" নামে

প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। এইজন্য ন্যায়শাস্ত্রকে অক্ষিপদ শাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে, গৌতম মুণি অপরের বিদ্যা-বুদ্ধি বা বিচারশক্তি দেখিয়া অত্যন্ত অসূয়াভাবাপন্ন হইতেন; তাঁহার চক্ষুতে যন্ত্রণা বোধ হইত, তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেন, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল!! অবশেষে কপাল হইতে নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া পদমধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু দর্শন করিতেন না, এইজন্য তাঁহার অক্ষিপদ নাম হয়। অক্ষিপদ মুনি মরিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিশ্বসংসার অক্ষিপদ প্রকৃতিতে গঠিত, তাহাতেই যেখানে যাই, সেই স্থানেই শুনিতে পাই—চোখ্ গেল, চোখ্ গেল। সমস্ত সংসারই হিংসায় হীনধর্ম্মা সুতরাং চোখ্ না যাইবে কেন? সমগ্র মানবজাতি বলিতেছে—চোখ্ গেল, চোখ্ গেল। জাতির মঙ্গলে হতভাগ্য জাতির চক্ষু কাটে; মোক্তার ও উকীলের উন্নতিতে সহযোগী মোক্তার ও উকীলের চক্ষু টুটে; স্কুলের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রতিদ্বন্দী স্কুলাধ্যক্ষের নয়ন ফাটিয়া জল পড়ে; দোকানদার দোকানদারের উন্নতি দেখিতে পারে না; পত্র-সম্পাদক সহযোগীর গ্রাহকবৃদ্ধি ও পশার বৃদ্ধি দেখিলেই চক্ষে যাতনা বোধ করে, এবং চিকিৎসক মহাশয় "রোগী মরুক আর বাঁচুক," কখনই প্রতিদ্বন্দী বা সহযোগী চিকিৎসকের প্রখ্যাতির বিস্তৃতি হইতে দিব না, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। গ্রামবাসী গ্রামবাসীর ভাল দেখিতে পারে না; পল্লীবাসী পল্লীবাসীর কল্যাণে কষ্ট বোধ করে; আর ঐ দেখ, ঐ দেখ, সতিন সতিনের রূপে, গুণে, অলঙ্কারে এবং পতিভক্তিতে বড়ই কাতরা, বড়ই নয়ন-পীড়ায় অধীরা। বল দেখি, এই বিশ্বসংসারে কাহার চোখ্ না যায়? তাহাতেই ঐ দেখ, ঐ নিদাঘের নীল্র আকাশের নিরবচ্ছ পাখি নিরন্ত নিনাদ করিয়া বলিতেছে—চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল। সাবধান! সাবধান! চোখ গেল, চোখ গেল।

পাণ্ডবপুরুষদিগের প্রখ্যাতি ও পরাক্রমে কৌরবদলের চোখ্

গিয়াছিল, সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিদানেও কৌরবেরা সম্মত হয় নাই; এই চোখের জালায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনানী সমন্বিত কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল সমরক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের জগদ্বিখ্যাত আহবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; ভাগ্যহীন ভারত এখনও তাহার কুফল ভোগ করিতেছে। বাল ব্রহ্মচারী ঠাকুর লক্ষ্মণের দেহ-লাবণ্য দেখিয়া রাক্ষসী সূর্পনখার চোখ গিয়াছিল; তাহাতেই সুবর্ণকিরিটিনী লঙ্কা ভস্মাবশেষে পরিণত হয় এবং রাবণের বংশে প্রদীপ জ্বালিবার লোকটি মাত্র ছিল না। গুরুস্থানাভিষিক্ত মহাজনের মদনমনোমোহন রূপ দেখিয়া অহল্যার চক্ষু গিয়াছিল, তাহাতেই অহল্যা, পাষাণরূপে পরিণতা হয়। বল দেখি কাহার ঘরে—কোন্ স্থানে—কোন্ গ্রামে—কোন্ নগরে—চোখ্ গেল." এই রব নাই? সমগ্র জগতই হিংসায়, অসূয়ায়, ক্রোধে, বিদ্বেষে, বিষাদে, মূর্খতায়, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে "চোখ্ গেল, চোখ গেল" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া স্ব: স্ব: মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে। চল্লিশ কোটি রাজভক্ত অধিবাসী পূর্ণ সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের প্রাচীন প্রখ্যাতি, সভ্যতা, পরাক্রম ও ধনাগম দেখিয়া ও শুনিয়া ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের চক্ষুতে যন্ত্রণা বোধ হইল, অমনি পাদ্রী প্রভুকে সহায় স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কটাক্ষ-বাণ নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাতেই বিলাতের প্রধান মন্ত্রী একটি বক্তৃতায়•বলিয়াছিলেন :—Wherever a missionary goes, a gunboat has to follow after him. যেখানে পাদ্রী যায়, সেখানে পরিণামে বন্দুক পাঠাইবারও প্রয়োজন হয়। প্রজার সুখে রাজার, সম্রাটের সুখে সম্রাটের এবং বীরের সুখে বীরের চক্ষু যায়, তবে আকাশের পাখির দোষ কোথায়? আকাশের পাখি সত্যই বলিতেছে, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল চোখ্ গেল।

ভারতের আংগ্লো ইণ্ডিয়ান মহাপুরুষ, হতভাগ্য বঙ্গবাসীর উন্নতিতে হিংসা করেন, তিনি বাঙ্গালীর কল্যাণ দেখিলে কর্ণে হাত দেন, বাঙ্গালী তাঁহার চক্ষের শূল। আসামের চা-বাগানের চা-কর সাহেবই বল আর

ছাউনীর লালমুখো গোরাই বল, কিম্বা রেলওয়ের ছোট সাহেব বা বড় সাহেবই বল, বাঙ্গালী বাবু সকলেরই চক্ষের শূল। সাহেব মহলে সততই শুনিতে পাই, "চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল।"

এই রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনে ভ্রাতা ভ্রাতার শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পারেন না ; এই একতার দিনে নগরবাসী নগরবাসীর একতা দেখিতে পারেন না ; এবং এই সমাজসংস্কার ও নৈতিকসংস্কারের দিনে কাহারও যুবতী সহধর্ম্মিণী গৃহের বাহিরে আসিলে অমনি পাষণ্ডদিগের চক্ষে অগ্নি জ্বলে! আবার ইহারাই সমাজসংস্কারক, নৈতিকসংস্কারক ও রাজনীতি দলের ভূষণ স্বরূপ!! মহামতি যিশুখ্রীষ্ট বলিতেন "রে মানব! তোর চোখ্ তোর সমুদয় দেহের আলোক স্বরূপ। যে চোখ্ রাখিতে ও চাহিতে জানে, সে দেহ, মন ও আত্মা রাখিতে জানে।" অনেকে চোখ্ রাখিতে জানে না, তাহাতেই "পোড়া আঁখি আমার মজালে" বলিয়া কাঁদে। মানুষের দুই চক্ষুই বিষেবিষে দগ্ধ, তাহাতেই মাতা নারায়ণী ভগবতী, মর্ত্ত্যের দুই চক্ষু গ্রহণ না করিয়া স্বর্গের তিন চক্ষু গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিনয়নী হইয়াছেন। এখন বুঝিলে কি, সমগ্র মানবজাতির মনের ভাব ঐ ক্ষুদ্র পাখি, তাহার সুস্বরে প্রকাশ করিয়া দিতেছে ; পাখি বারম্বার বলিতেছে, এই সংসারে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, তাহাতেই এই মায়াময়—এই কুটিলতাময়— জগতের সকলেরই "চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল"।।

আর তুমি হে বখাটে বালক! তুমি হে পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত, মাতা কর্ত্তৃক সম্মার্জ্জনী-আহত, কুল-মজান বালক। তুমি ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া অথবা এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার নম্বরের তালিকায় বৃহৎ শূন্য মাত্র স্থাপন করিয়া এবং তাহার পরে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদরূপে সম্পাদক বা সমালোচক হইয়া উপবেশন অথবা দণ্ডায়মান পূর্ব্বক "চোখ্ গেল, চোখ্ গেল" বলিয়া সুরাপায়ী প্রলাপীর ন্যায় কাঁদিতেছ কেন? তোমার নিজের বিদ্যা

বুদ্ধির দৌড় কত, তাহা জানিতে বাকি নাই, সেই পুরাতন, জন্মকোষ্ঠি প্রকাশিত না হওয়াই ভাল। মোল্লার দৌড় মস্‌জীদ্ পর্য্যন্ত, ভাঁপ-পিটের দৌড় গাছের ডগা পর্যান্ত,—আর মুর্গীর দৌড় পচা পুকুরের পাহাড় পর্যান্ত, ইহা কি জানিতে কাহারও বাকি থাকে? বিদ্যা বুদ্ধির অভাবে, সৎ শিক্ষার অভাবে, তুমি ভাল লেখা লিখিতে পার না, তাহাতেই হিংসায় ভাল লেখকের প্রবন্ধ দেখিয়া অথবা ভাল গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়া ব্যথিত হও, তোমার চক্ষে বেদনা বোধ হয়, তুমি অমনি চোখ্ গেল, চোখ্ গেল বলিয়া চীৎকার করিয়া মর। তোমার মনের বিদ্বেষ ভাব তুমি তোমার অসার সমালোচনায় প্রকাশ করিয়া নিজের নীচত্ব প্রমাণ কর। তোমার চোখের রোগ কখনই মিটিবে না, তোমাকে হিংসার সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইয়া ঐ পাখি চিরদিনই পাকিতেছে—চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল।

পাখির চোখ্ গেল রবে চীৎকার করিবার আর একটা বিশিষ্ট কারণ আছে। সে কালের স্বার্থত্যাগ, একালের জঘন্য স্বার্থপরতা; সেকালের ধর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং একালের নাস্তিকতা ও পাষণ্ডতা, সেকালের সুখ, শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা, একালের সদাদুঃখ, সদা অশান্তি এবং অন্নকষ্ট; সেকালের পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বরপরায়ণতা, একালের মূর্খতা, দাম্ভিকতা ও ধর্ম্মহীনতা; সেকালের বীরত্ব স্বাধীনতা এবং একালের ভীরুতা ও পরাধীনতা, এই সকল স্মরণ করিয়া অতীব ঘৃণায়, লজ্জায়, অভিমানে, বিষাদে এবং চক্ষু জ্বালায় ঐ বিহঙ্গবর পুনঃ পুনঃ "চোখ্ গেল, চোখ্ গেল" স্বরে চীৎকার করিয়া বিমান পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিলাম, কেন তুমি কাঁদ নিতি নিতি।

কলির কলুষ-পূর্ণ মানব প্রকৃতি,
দেখিয়া রে অহরহঃ, মরমে মরমে দহ,
দহে বক্ষ, দহে প্রাণ, দহে তোর আঁখি।
চোখ্ গেল বলে সদা কাঁদ তাই পাখি।

বলিতে কি এই কথা বিশ্ববিধাতায়,
নিশিতে উষাও যেয়ে আকাশের গায়,
উদাস আকুল প্রাণে, শুনাও তাঁহার কাণে,
জগদীশ! চেয়ে দেখ জগতের ধারা!
দাও দয়াময় বিশ্বে সুমধুর ধারা॥

পাঠক! তুমি কি বসন্ত বা বৈশাখের অরুণোদয় কালে ঐ সুন্দর পাখির সুস্বর শ্রবণ করিয়াছ? রজনীর শেষে, উষাকালে এই বিচিত্র বিহঙ্গবরের বিনোদ ঝঙ্কারের অর্থ অস্তরূপ। তুমি কি কখন কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ? বনবাসী, ফলমূলভোজী, তপশ্চারী মহাপুরুষদিগের হৃদয়ের ভাবও ঐ পাখির সুস্বরে পরিস্ফুট প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। নিষ্পাপ যোগী, পরমারাধ্য পরব্রহ্মের পদারবিন্দে প্রণাম করিয়া কহিতেছেন, "হে পরাৎপর! হে অতিবীন্দ্রিয় অপৌরুষের সারাৎসার! আমি চর্ম্মচক্ষে তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, আমার এই চর্ম্মচক্ষু উড়িয়া যাউক, আমাকে তুমি জ্ঞানচক্ষু—আধ্যাত্মিক চক্ষু—দিব্যচক্ষু দান কর, আমি তোমাকে মনপ্রাণ পূর্ণ করিয়া দেখিয়া লই।" পাখি, যোগীর প্রার্থনায় গাহিয়া গাহিয়া বলিতেছে, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল। যোগী আর চর্ম্মচক্ষু রাখিতে চাহেন না, তিনি ইন্দ্রিয়াদির সামর্থ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দিব্যচক্ষে সেই অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে ইচ্ছু। পাখি আবার ডাকিল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল চোখ গেল।

রে পামর জগৎ! তুই আর কতদিন এই চক্ষুরোগে কাতর থাকিবি? কতদিন আর হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতির প্রভাবে চক্ষের ব্যথা সহ্য করিবি? রে পাষণ্ড জগৎ! একবার ভক্তিভরে, মনপ্রাণ খুলিয়া, ভক্তবৎসল ভগবানের পাদপদ্মে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্।" তোর দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হউক, তুই দিব্যচক্ষে চাহিয়া ছাখ্। তখন এই "মায়াময় জগত—এই পাপময় জগত—কতই সুন্দর, কতই

পবিত্র, কতই সুখকর স্থান হইয়া উঠিবে, বল দেখি? তখন আকাশের পাখি আর ডাকিবে না; আর যেন শুনিতে না পাই—"চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, চোখ্ গেল।" শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

## গদাই ঠাকুর।

( টিকিকাটা-জমিদারস্ত কথামৃতম। )

অহো! তোমরা টাকা পেলে, হেসে খেলে, গাদায় করো কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে, ( আমি বলি ), কসাই তবু ভালো॥

[ আণ্টুনী ফিরিঙ্গি ]

পাঠক মহাশয়! আপনারা কি গদাই ঠাকুরের নাম শুনিয়াছেন? গদাই ঠাকুরের কথা "আরব্যরজনীর" উপন্যাস নহে, ইহা আশ্চর্য্য বাস্তব ঘটনা। কাহারও অযথা নিন্দা করা অথবা অকাট্য সত্যকে অতিরঞ্জিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে; পাপী, ভণ্ড ও কপটাচারীর পরিণামে কিরূপ দুর্গতি হয় তাহারই একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না, তাহা জানি; কিন্তু যখনই ঘটে, তখনই হাতে হাতে তাহার কুফল ফলিতে দেখা যায়। গদাই ঠাকুরের কথা—হাস্য, বিস্ময়, বিষাদ ও বীভৎস রসে পূর্ণ।

অনেকদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কায়স্থকুলোৎপন্ন একজন সাধুপ্রকৃতির জমিদার ছিলেন। আমি ইঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং ইঁহার সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। এই বিশিষ্ট "হিন্দু" জমিদার বঙ্গদেশে—বিশেষতঃ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে নানা কারণে সুপ্রসিদ্ধ। আমি এই প্রবন্ধে এই বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্ম পরায়ণ, শাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত জমিদারের নাম বা কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিব না। মনে করুন, এই জমিদারের কল্পিত নাম "উমাবাবু", আমি ইঁহাকে উমাবাবু বলিয়াই উল্লেখ করিব। গো-ব্রাহ্মণ ও অতিথির ভক্ত উমাবাবুর বাটীতে যতগুলি গাভী প্রতিপালিতা হইত, তাহার মধ্যে অঞ্জনা নামে একটী গাভী অত্যন্ত রুগ্না ও বৃদ্ধা হইয়াছিল। বাবুর ধার্ম্মিকা জননী একদিন

বাবুকে বলিলেন "বৎস! অঞ্জনা অত্যন্ত বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত দিনে দিনে সে আয়ুঃকৃশা হইয়া যাইতেছে। আমার ইচ্ছা এই যে, এই বুড়ী গাভীটিকে আমাদের পূজ্যপাদ গুরুদেবমহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক, সেখানে অঞ্জনা ব্রাহ্মণের হস্তে প্রভূত অন্নে প্রতিপালিতা হউক তাহা হইলে তাহার সদগতি হইবে। ইহার প্রতিপালন জন্য গুরুদেবকে আমরা মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।" উমাবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন এবং গুরুদেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বাবুর গুরুদেবের নাম মনে করুন গদাই ঠাকুর। গুরুদেবের কলিকাতা সহরে নিবাস ছিল, সুতরাং আহ্বানপত্র প্রাপ্ত হইয়াই শিষ্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাই ঠাকুরকে উমাবাবু এবং তাঁহার জননী গাভীর অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া তাহার প্রতিপালন জন্য পুনঃপুন অনুরোধ করায় গদাই কহিলেন 'গাভীকে রক্ষা ও পালন করা দ্বিজের পরম ধর্ম্ম, সুতরাং তোমাদের অঞ্জনা গাভীকে আমার গৃহে লইয়া যাইতে আমি নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু হরি! হরি! গাভীর প্রতিপালন জন্য অর্থ গ্রহণ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমার পারিবারিক বা আর্থিক অবস্থা যদি ভাল হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই—নিশ্চয়—এই বৃদ্ধা গাভীর প্রতিপালন জন্য আমি নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—একটিও টাকা অথবা একটিও পয়সা কিম্বা (অধিক কি) একটিও কাণা কড়িও তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতাম না। যাহা হউক তোমাদের বিশেষ অনুরোধে এবং বিশেষত আমার আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতাবশত, আমি মাসে মাসে পনেরটি টাকা মাত্র গ্রহণ করিব। কলিকাতার মত এতবড় সহরে পঞ্চদশ রৌপ্যমুদ্রার কমে একটা গাভীর প্রতিপালন হওয়া অসম্ভব।" উমাবাবু এবং তাঁহার মাতা ইহাতে সম্মত হইয়া গুরুদেবের বাটীতে গাভীটিকে পাঠাইয়া দিলেন এবং ছইমাসের টাকা গদাই ঠাকুরের হাতে অগ্রিম প্রদান করিলেন। গুরুদেব ইতঃপূর্ব্বে এক মাসে দুইবারমাত্র

শিয়ের বাটীতে আসিত, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে গদাই ঠাকুর প্রতি সপ্তাহে দুইতিনবার উমাবাবুর বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিল। বাবুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই গদাই ঠাকুর বলিত, "কলিকাতা-সহরে ঘাসের দাম আজকাল বড়ই দুর্ম্মূল্য, বিশেষতঃ রাখালবালকের বেতন দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে, তদ্ভিন্ন গোবালঘরের ট্যাক্স হইবে নাকি শুনিতেছি।। তা ছাড়া গরুটির কিঞ্চিৎ সান্নিপাতিক ব্যাধি আছে, বোধ হইতেছে—যাহা হউক এই সকল কারণে কলিকাতায় গরুর খরচ বড়ই বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি আমি গো মাতার প্রতি কখনই তাচ্ছিল্য করি না, গাভী হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবতী, সুতরাং তাঁহাকে উপেক্ষা করা, আর নরকে গমন করা, একই কথা। আমি আমার পুত্রকণ্যাকে না খাওয়াইয়া অগ্রে অক্ষনা গাভীকে খাওয়াইয়া থাকি, কিন্তু বলিতে কি, কলিকাতায় গাভীর খরচ বড়ই বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি আমি গো মাতার প্রতি কখনই তাচ্ছিল্য করি না, গাভী হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবতী, সুতরাং তাঁহাকে উপেক্ষা করা, আর নরকে গমন করা, একই কথা। আমি আমার পুত্র কন্যাকে না খাওয়াইয়া অগ্রে অক্ষনা গাভীকে খাওয়াইয়া থাকি, কিন্তু বলিতে কি কলিকাতায় গাভীর খরচ বড়ই বেশী হইয়া পড়িয়াছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ নানাপ্রকারের মিথ্যাকথায় ধার্ম্মিকা ও সরলহৃদয়া স্ত্রীলোকের মন ভুলাইয়া, গদাই ঠাকুর পঞ্চদশ মুদ্রার অতিরিক্ত আরও কিছু টাকা গোপনে গোপনে লইয়া যাইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতায় গাভীর মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল, কারণ ইংরাজ গোরাদিগের এবং মুসলমানদিগের এবং সাহেবদিগের জন্য—তদ্ভিন্ন অন্যান্যজাতির জন্য—গোমাংসের খুব প্রয়োজন হইত এবং কলিকাতা হইতে তখন বারাকপুর, দমদমা, চুঁচুড়া শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে গো মাংস রীতিমত চালান যাইত। গুরুদেব গদাই ঠাকুর একদিন মনে মনে ভাবিল "একজন মুসলমান কসাইকে

এই বুড়ী গাভীটা বিক্রয় করিলে অন্তত ২০৲ টাকা প্রাপ্ত হইব তাহাই করা যাউক। এই বুড়ী গাভী হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না এবং অন্য উপকারও নাই, তবে ইহাকে অনর্থক রাখিয়া ফল কি? আমার শিষ্যেরা আমার বাটীতে আসিয়া স্বচক্ষে গাভী দেখে না, ইহাও নিশ্চিত; তাহাদিগকে বিক্রয়ের কথাটার উল্লেখই করিব না। গাভী জীবিতা আছে এবং রীতিমত যত্নে প্রতিপালিতা হইতেছে, ইহাই কহিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে প্রবোধ দিব।” গদাই ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়া বাস্তবিক একদিন গাভীটাকে একজন মুসলমান কশাইয়ের নিকটে ১৮৲ টাকায় বিক্রয় করিল। উমাবাবুর বাটী হইতে গাভী লইয়া যাইবার ঠিক একমাস পরে এই ঘটনা ঘটে।

গাভী অনেকদিন উমাবাবুর বাটীতে ছিল জানি না কিরূপে একদিন দৌড়িয়া দৌড়িয়া অবশেষে উমাবাবুর বাটীতে আসিয়া গাভী উপস্থিত হইল। জমিদারবাবুর তখন মজ্ঞনের দ্বারা দন্তধাবন করিতেছিলেন, হঠাৎ অঙ্গনা গাভীটাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের গরু কি করিয়া এখানে আসিল?” চাকরেরা বলিল “হুজুর। বোধ হয় গুরুদেবের বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। এখন ইহাকে বাঁধিয়া রাখি পরে গুরুদেবের বাটীতে পুনরায় গাভীকে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।” ইহার অল্পক্ষণ পরে শাণিত ছুরিকা হস্তে ভীষণমূর্ত্তি শ্রীমান কশাই, শ্রীযুক্ত উমাবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। বাবু চমৎকৃত হইয়া কশাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এখানে কেন?” কশাই কহিল “হুজুর। আমার কশাইখানা হইতে একটা বুড়ি গাভী খোঁটা খুলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আপনার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। আমি ঐ গাভীকে ধরিতে পারি নাই; কিন্তু ইহাকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার পশ্চাতে পশ্চাতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়াছি।” উমাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গাভী কোথায় পাইলে?” কশাই বলিল, “হুজুর গদাই ঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ আমাকে ইহা বিক্রয় করিয়াছে, আমি

এই গাভীকে হত্যা করিয়া ইহার মাংস বিক্রয় করিব। আমি কশাই, মাংস বিক্রয় করা আমার ব্যবসা।" বাবু কহিলেন, "তুমি ইহাতে কত টাকা লাভ করিতে পারিবে মনে করিয়াছ?" কশাই বলিল "হুজুর! ১৮৲ টাকায় গরু খরিদ করিয়াছি, ২৫৲ টাকায় মাংস বিক্রয় হইতে পারে।" উমাবাবু কহিলেন,"আচ্ছা! তোমাকে আমি ৩০৲ টাকা দিতেছি, এই গাভী আমার নিকট বিক্রয় কর।" কশাই তাহাতে সম্মত হইয়া ৩০৲ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত অন্তঃকরণে দোকানে ফিরিয়া গেল।

হরিবোল হরি!! ঠিক এই ঘটনার কয়েকঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীশ্রীগুরুদেব গদাই ঠাকুর, তাহার বিপুল বপুখানিকে অলকা-তিলকায় সুরঞ্জিত করিয়া, তদুপরি নবীন "নামাবলী"র আবরণ ব্যবহার করিয়া, কপালে রক্তচন্দনের বড় বড় ফোঁটার চিত্র করিয়া, স্থূলম্বমান টিকিতে সুদৃঢ়রূপে বিল্বপত্র বাঁধিয়া, হস্তে কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক কাষ্ঠপাদুকা-(খড়ম)-সংযুক্ত পদে সাধুর ন্যায় অগ্রসর হইয়া, রুদ্রাক্ষমালাবৃত গলদেশ হেলাইতে হেলাইতে, শিষ্য শ্রীযুক্ত উমাবাবুর বাটীতে শুভাগমন করিলেন। তাহার কর্কশ কণ্ঠ হইতে ঘন ঘন শব্দ হইতে লাগিল—

হর বম্ বম্ ববম্ বম্! হর বম্ ববম্ বম্।

তারা! দয়াময়ি, ব্রহ্মময়ি, ত্রিতাপনাশিনি বম্।

গদাই ঠাকুরকে দর্শনমাত্রেই অতীব ক্রোধাগ্নিতে উমাবাবুর সর্ব্ব-শরীর জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভুর একৃণে কোথা হতে শুভাগমন হলো?" শ্রীমান্ প্রভু ঘনঘন হর হর বম্-বম্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমরা হচ্ছি কলিকাতার লোক—গঙ্গাতীরবাসী ব্রাহ্মণ! অঁহো ব্রাহ্মণ শব্দ কি ব্রহ্মজ্ঞাপক! বৎস! পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে কি ব্রহ্ম-কুলে জন্ম হয়? আমাদের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান না কোল্লে কি চলে হে? সেই পতিতপাবনী, মোক্ষদায়িনী, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুরধনী গঙ্গার জলে স্নান করিয়া শিবপূজা সমাপনপূর্ব্বক আমি রাটী যাইতেছিলাম, এদিকের

পথে আগমন করায় তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোত্তে এলাম, তদ্ভিন্ন তোমার গর্ভধারিণীর সহিতও একবার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা আছে।" উমাবাবু গোপনে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "অঞ্জনা গাভীকে লইয়া আসিয়া এই বামুনের সম্মুখে উপস্থিত কর।" গাভী দেখিয়াই গদাই ঠাকুরের মুখ ম্লান হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং জিহ্বায় বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত হইয়া আসিল। উমাবাবু কশাইয়ের কথা ব্রাহ্মণকে শুনাইলেন, ভণ্ডগুরু সে কথা শুনিয়া আর উত্তর করিতে পারিল না। বাবু কহিলেন, "আপনারে গুরু বলিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছি এবং পুনঃপুন গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, এজন্ত আপনার আর কোন প্রকার অপমান না করিয়া, একটা নূতন ধরণের শিক্ষা আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া, বাক্স হইতে সুদীর্ঘ শাণিত কাঁচি হাতে লইয়া, মুহূর্ত্তকালমধ্যে গদাই ঠাকুরের সুলম্বমান টিকি কাটিয়া লইলেন এবং তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া আদেশ দিলেন, "আর তুমি আমাদের বাটীতে কখনও আসিও না, আসিলে বিপদগ্রস্ত হইবে।"

পরদিবসে, উমাবাবু তাঁহার গোমস্তাকে একটা বৃহদাকার আলমারি খরিদ করিতে হুকুম দিলেন। আলমারি আনীত হইলে, জমিদারবাবু ঐ আলমারির মধ্যে গদাই ঠাকুরের টিকিখানা সযত্নে সংস্থাপন করিয়া, কাগজের টিকিটে (Ticket) বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলেন—টিকি, নং ১। অপরাধী গদাই ঠাকুর। অপরাধ প্রবঞ্চনা ও গোহত্যা।" পাঠকমহাশয়! আপনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আমাদের উমাবাবু এইরূপে অনেক ভণ্ড বামুনের মাথার টিকি কাটিয়া লইয়াছিলেন এইজন্ত কলিকাতা-অঞ্চলে তিনি এখনও "টিকিকাটা জমিদার" বলিয়া খ্যাত। ভণ্ড বামুনেরা তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া যাইতে সাহস করিত না, ঘটনাচক্রে সুলম্বটিকিসংযুক্ত ভণ্ড ব্রাহ্মণ উক্ত জমিদারের বাটীর নিকটে পৌঁছিলে, গামোছা বা কাপড়ের দ্বারা টিকি ঢাকিয়া ফেলিত। আমার একজন বন্ধু একবার ঐ আলমারি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি

বলেন, উহা অপূর্ব্ব পদার্থ বটে! তখন ৩৬খানা টিকি মজুদ ছিল, কতকগুলি অপূর্ব্ব টিকির পরিচয় দিতেছি :—( অপরাধীদিগের প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া কল্পিত নাম ব্যবহার করিলাম। উপাধি গুলি অবিকল অপরিবর্ত্তিত ভাবে রাখা গিয়াছে )

টিকি নং ১৩ অপরাধী—উমেশ ঠাকুর ( চূড়ামণি )। অপরাধ—যবনীসংশ্রব। টিকি নং ১৯ অপরাধী—কৈলাস ঠাকুর ( তত্ত্বনিধি। অপরাধ—মুচীর গৃহে অন্নভোজন। টিকি নং ২৫ অপরাধী—কানাই ঠাকুর। অপরাধ—মুসলমানের সহিত একত্রে আহার। টিকি নং ২৭ অপরাধী—ভুবন ঠাকুর। অপরাধ—জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া শিষ্যের সর্ব্বনাশ করা। টিকি নং ২৮ অপরাধী—আশু ঠাকুর। অপরাধ—ভয়ানক মিথ্যা কথা দ্বারা সোণাগাছি ও মেছোবাজারের বেশ্যাদিগের স্বর্ণালঙ্কার ফাঁকি দেওয়া। টিকি নং ৩২ অপরাধী—গোবিন্দ ঠাকুর ( বিদ্যানিধি )। অপরাধ—মন্ত্রশিষ্যের বিধবা কন্যাকে বিপথগামিনী করা। টিকি নং ৩৩ অপরাধী—রামকান্ত শর্ম্মা ( বিদ্যাবাগীশ )। অপরাধ—বৈমাত্রেয় শ্রীধর শিরোমণির সঙ্গে সুরাপান করিয়া গরাণহাটার মোড়ে এক ধোপার বাটীতে ৪ দিন অবস্থান, তাহার অন্নভোজন তাহার কন্যার সতীত্ব নাশ এবং তাহার বাটীতে অশাস্ত্রীয় মতে ৺শীতলা দেবীর পূজা করা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাঠকমহাশয়! টিকিকাটা জমিদারমহাশয় কিম্বা গদাই ঠাকুর আর জীবিত নাই, কিন্তু বঙ্গদেশে—কেবল বঙ্গদেশে কেন, ভারতের এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র—এখনও গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গদাই ঠাকুরের সংখ্যা কমে নাই। ব্রাহ্মণের মধ্যে যেমন "গদাই" আছে তেমনি সকল জাতির মধ্যেই গদাই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে যুবক সম্প্রদায় মধ্যে গদাই অপেক্ষাও অধিকতর অসদাচার সম্পন্ন আর এক প্রকারের অদ্ভুত জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহারা "ইয়ং বেঙ্গল" নামে বিখ্যাত; বঙ্গভাষায় ইহাদিগকে "কলির বাবু" বলা যাইতে পারে। পাঠকমহাশয়!

কলির বাবুর একটু সামান্য চিত্র অঙ্কণ করিয়া "প্রবন্ধাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করিলাম। এই সভার গানটী আপনাদের বৈঠকে অথবা বন্ধুবান্ধব দিগের সম্মুখে গাহিয়া আমার প্রবন্ধাবলীর পাঠ ক্রিয়াকে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করুন, ইহাই আমার বিনীত অনুরোধ।

বাউলের সুর—খেমটা।

আমি সাধ কোরে সেজেছি ভাই বিলাতী বানর।
আমি মিশেস ভিন্ন গণ্য করি জগত স্বার্থ পর॥
মিশেস আমার মাথার মণি, মিশেস্ ধনে আমি ধনী
ঘরে বসে চাঁদ বদনী, নিত্য দেন লেক্‌চর॥
পরের খবর নাহি রাখি, কেবল নিজের সুখটি দেখি,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ফাঁকি, বাকি কেবল যমের ঘর॥
বিলাতী পোষাক পরি রেঁস্তো ব্রাণ্ডি হাতে ধরি
সমাজের ধার নাহি ধারি, না মানি নির্ব্বিকার।
এখনও কলির আছে বাকি, (বাপকে বেটা দেয় গো ফাঁকি)
আসল বিনে নকল দেখি ওগো যেকি হলো পার॥
সংযম নিয়ম উড়ে গেছে বিনয় যেন পালিয়ে গেছে
কেবল ঘোরে পাছে পাছে, উগ্রতা অহংকার॥
বাব টাকা ধার করি, তারই গলায় মারি ছুরি
আবার চাইলে টাকা, হোয়ে বাঁকা, বলি 'ড্যাম শুয়র'।
গাঁজা গুলি কলাই ভাজা, মদের বোতল হদ্দ মজা,
মোরা সব কলির রাজা, করি দেশোদ্ধার॥
মাতৃভূমি কনট্ নয়, খোলাভাটি "কনট্" হয়,
আবকারীর হোক সদাই জয় নইলে জগৎ অন্ধকার।
হোয়ে অতি নিরানন্দ, কহে কাঙ্গাল ধর্ম্মানন্দ,
দেশের দেখি সকল মন্দ একি চমৎকার॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

OPINIONS

# অভিমত।

## ( প্রকাশক কর্তৃক সংগৃহীত )

"ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী।"

১। যশোহর মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান এবং সেই দিকদিকন্ত বিশ্রুত নামা উকীল, লেখক, পণ্ডিত ও জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার "হিন্দুপত্রিকা"য়, ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। ( ১৩১০ সালের মাঘ মাসের হিন্দু পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

"ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।" প্রথমখণ্ড। এই গ্রন্থের প্রণেতা মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। পরিব্রাজক মহাভারতী মহোদয় একজন অসাধারণ পুরুষ। স্বদেশে—বিদেশে—তাঁহার কর্ম্মজীবন সমভাবে সমাদৃত। ভারতের আর্য্যশাস্ত্রের গভীর গবেষণা, এবং পাশ্চাত্যের নবপ্রতিভাময়ী প্রণোদনা, এই উভয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশে তাঁহার জীবন, এক মহত্বের নিলয়, এবং তাঁহার জ্ঞান, এক বহুদর্শনের বিকাশ স্বরূপ হইতে পারিয়াছে। মাসিক পত্রের পাঠকমাত্রেই এই স্বনামখ্যাত মহাপুরুষের পরিচয় অবগত আছেন, এবং ইঁহার ওজস্বিনী তত্ত্বভারগুর্ব্বী লেখনীর প্রসাদে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। বহু মাসিক পত্রিকায় সুদীর্ঘকাল—ইনি যে সকল স্বদেশবিদেশের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সুফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির [illegible] উপকার সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারই কতকগুলি এই প্রথমখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের আকার বৃহৎ। বিষয়গুলিও গুরুতর। এই পুস্তকপাঠে অনেক অভিজ্ঞতার অধীশ্বর হওয়া যায়। 'হিন্দুশব্দতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ মহাভারতী মহোদয়ের অতুল,

প্রতিভার অমূল্য সৃষ্টি। ইহাতে ১৯টী প্রবন্ধ আছে। এই সকল প্রবন্ধের অনেকগুলি বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, এবং ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদূরদেশে প্রামাণিকরূপে আদৃত হইয়া, অপূর্ব্বগৌরব প্রকাশ করিয়াছে। বঙ্গে কি এ গ্রন্থের আদর হইবে না? আমরা আশা করি, প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু বঙ্গবাসী ইহা পাঠে আনন্দিত হইবেন। এই পুস্তকের প্রচার প্রার্থনীয়।

২। "অনুসন্ধান" সংবাদপত্রের সুযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। ("অনুসন্ধান ৯ ভাদ্র, ১৩১০)।

"এই গ্রন্থ বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। যিনিই পড়িবেন তিনিই জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া শোভার ভাণ্ডার সৃষ্টি হইল।"

৩। সেই দিগ্‌জয়ী সুলেখক ও সুযোগ্য সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম, এ, বি, এল মহাশয় কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। মহাভারতী মহাশয়ের সুন্দর পাণ্ডিত্যময় প্রবন্ধ এযাবৎ সমুদয় বাঙ্গালা মাসিকপত্রকে অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল করিতেছে। তাঁহার যেমন লিপিবার ক্ষমতা আছে, তেমনি পাণ্ডিত্য আছে। তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিবেন এবং গ্রন্থকারের বিদ্যার বিস্তৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।" (নবপত্র। ভাদ্র। ১৩১০।)

৪। বরিশালের 'বিকাশ' সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান কালের বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। যাহারা মাসিক সাহিত্য রীতিমত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মহাভারতী ঠাকুরের লেখনীর সহিত পরিচিত। "প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থ, গ্রন্থকারের ভূয়োদর্শন এবং পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচায়ক। (বিকাশ। ২৬ ভাদ্র। ১৩১০।)

"প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রিন্সিপাল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী গ্রন্থ সুখপাঠ্য এবং নানাবিধ বিস্ময়কর বিষয়ের বিবরণে পরিপূর্ণ"। (প্রবাসী ১৩১০ সাল অগ্রহায়ণ।)

৬। জগদ্বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন। "The author in this fairly got up volume of 314 pages treats of multifarious subjects, historical, social, literary and religious He is a well-informed and well-travelled man The volume evinces power of close observation the author possesses" (Amrita Bazar Patrika, 27 July, 1903)

৭। দিকদিকন্ত বিশ্রুত নামা, স্বদেশ হিতৈষী অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বেঙ্গলী" সম্পাদিত পত্রে ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলীর কিরূপ সুদীর্ঘ এবং মহাপ্রশংসিত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। (অংশমাত্র উদ্ধৃত হইল)। We have been reading the first volume of the Bengali Essays of Swami Dharmananda Mahavrati. These essays originally appeared in various magazines and we think the Swamiji has been well advised in reprinting them in a collected form. They embrace a wide range and variety of subjects such as history, biography, philosophy, philology, theology, literature and travels Every page of the book breathes that spirit of pure patriotism and is characterised by that deep reading and high thinking which the Bengali world has learnt to associate with the name of the venerable author It is a book which

must be read by every educated Bengali, for its perusal will not only make one a wiser man but also a better and a happier man The Venerable Swamiji has travelled over Europe, Africa America, Australia, Japan, Siam, China, Persia, Turkey, Ceylon, Burma, Affghanistan, Egypt and many other countries He is learned in most of the languages of both the hemispheres. If report is to be credited, he has himself acquired certain power upon which he loves to dwell in introducing to his readers, some of the saintly characters he has come across in his wanderings over the wide world One rises from a perusal of this book with a weird sensation as if he had had glimpses of the world lying beyond the human ken It is a remarkable book but the man is perhaps more remarkable than his work. (The "Bengalee", 26 July, 1903.)

---

## "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" প্রভৃতি।

৮। শ্রীযুক্ত আনন্দ বাজার পত্রিকার শতবিদ্যাধর সম্পাদক মহাশয় স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের প্রণীত সিদ্ধান্ত সমুদ্র পাঠ করিয়া কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। (আনন্দ বাজার পত্রিকা ৬ই আশ্বিন। ১৩১০ সাল)।

"শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয় বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। একাধারে অনন্ত গুণের সমাবেশ মহাভারতী মহোদয়ে প্রচুররূপেই প্রতিভাত হয়। বহুদেশ দর্শন, বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু

বিষয়ে পরিচিন্তন, বহুলোক সহ আলাপ, সম্ভাষণ, প্রভৃতি হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ অংশ তিনি দয়া করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃতই বঙ্গ সাহিত্যের উপকার করিতেছেন। তাঁহার সুধামধুর আলাপে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণ যেরূপ সন্তুষ্ট, তাঁহার গবেষণাপূর্ণ বিবিধ বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধ সমূহ পাঠ করিয়া পাঠকগণ প্রকৃতই পরম প্রীতিলাভ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি অতি সুন্দর কাগজে, মূল্যবান মলাটে এবং সুশোভন অক্ষরে সিদ্ধান্ত সমুদ্র নামক বৃহদায়তন গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সমুদ্র বঙ্গদেশবাসী সমুদয় হিন্দু জাতির পুরাতন ও আধুনিক সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস; ইহাতে ব্রহ্মকুলোদ্ভূত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতিগণ পর্য্যন্ত সকলেরই শাস্ত্রীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিবরণ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহুল গ্রন্থ পাঠ, বহু স্থান ভ্রমণ এবং বহুচিন্তা করিয়া এই বিপুলাকার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার আদ্যন্ত বিবিধ নূতন, চিন্তাশীল, জ্ঞানময় এবং গবেষণাময় বিবরণে পরিপূর্ণ। ধর্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমুদ্র অতীব উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। জাতিতত্ত্ব বলিয়া একখানি উপযুক্ত গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যে এখনও কোনও কৃতী লেখকদ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। মহাভারতী মহোদয়ের চেষ্টায় এ অভাব নিরাকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

৯। ভুবন বিখ্যাত অমৃত বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সুদীর্ঘ সমালোচনায় কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। (কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল) "Swami Dharmananda Mahavarati's Siddhanta Samudra is a highly interesting and original work. The author has been eminently successful The book is pregnant with profundity in thoughts and antiquarian

researches, and a real insight into the minds of Indian sages." (A. B. Patrika 21 September, 1903.)

১০। মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি পত্রের সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। পরিব্রাজক স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়কে আমরা ঋষি তুল্য লোক বলিয়া জানি। * * প্রাচীন ঋষি প্রণীত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের ও অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের মতামত, পূজনীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রদত্ত ভাষ্য, তদ্ভিন্ন বহুতর শাস্ত্র, গ্রন্থ এবং পুরাতন কাগজ পত্রাদি অনুসন্ধান ও পাঠ করিয়া, নানাদেশ পর্য্যটনকারী, বহুভাষাভিজ্ঞ এবং বহুদর্শী পণ্ডিত মহাভারতী মহাশয় এই প্রশংসনীয় ও চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রন্থ প্রচারপূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশের পরমোপকার সাধন করিলেন। এই পুস্তক সকল শ্রেণীর লোকের পাঠ্য; পঞ্জিকার ন্যায় হিন্দুর গৃহে গৃহে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ থাকা উচিত।" (মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩১০, এবং ৮ই মাঘ, ১৩১০ প্রভৃতি।)

১১। "Pundit Dharmananda Mahavarati is a well known Hindoo gentleman He has translated St Paul's Epistle to the Hebrews in Bengali"—The Revd. Canon E F Brown, M. A, Superior of the Oxford Mission, Calcutta.

১২। "Pundit Dharmananda Mahavarati is an eminent Bengali writer His articles are learned"—The Bengalee, 10 October, 1903.

১৩। "Swami Dharmananda Mahavarati's articles are a rare attraction."—Indian Nation, 16 June, 1902.

১৪। বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপন জন্য অধ্যাপকের প্রয়োজন হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ

বারিষ্টার, মেট্রপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল এবং সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীল শ্রীযুক্ত এন্, ঘোষ মহোদয় তাঁহার "ইণ্ডিয়ান নেশন" নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাচার পত্রে কি লিখিয়াছেন, দেখুন।

"It is said that a chair of Hindoo philosophy has been established in the University of Cambridge He would be the real teacher of Hindu Philosophy who would be fit to discharge the functions of a Gooroo. He must teach his doctrines from the Hindu standpoint, explain the assumptions according the purposes of the philosophy, and seek to inculcate the art of practising it Baba Dharmananda Mahavarati, if he cared to be a lecturer, would have been competent lecturer" (IndianNation, 3d August, 1903.)

১৫। "Swami Dharmananda Mahavarati is a Pundit of uncommonly vask erudition and liberal sympathies. He is eminently qualified for any stupendous literary task"—The Bengalee 24 February. 1904.

১৬। মহামান্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের রাজপুতানাস্থ এজেণ্ট স্যার কর্ণেল ট্রেভর, সি, এস, আই মহোদয় কি লিখিয়াছেন, পড়ুন।—"আমি অনেক দিন হইতে এই সুবিদ্বান্ পুরুষকে (স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়কে) জানি। ট্রাভাঙ্কোরের বৃটীশ রেসিডেণ্ট এবং মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর অব্ পব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্‌শন মিষ্টর গ্রেনিংটন সাহেব, আমার সহিত ইহাঁর প্রথম পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। এতদিনের বন্ধুতায় আমি একদিনও ইহাঁর মুখে এমন কোনও কথা শুনি নাই যাহার আমি প্রতিবাদ করিতে পারি।"

১৭। "Swami Dharmananda Mahavarati is a

distinguished writer He is a Hindoo gentleman of extensive reputation as a scholar and a preacher. His article on Christ in the Missionary Herald of London is a remarkable article."—The Missionary Review. February. 1904. ( বিলাতের মাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত। )

১৮। "The name of Swami Dharmananda Mahavarati has much authority among Hindoos."—The Epiphany. 19 March. 1904.

১৯। "সুধা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ঠাকুরের যৌবন বয়সের ছবি দেখিয়াছিলাম। এবারে ( ১৩১০ সালের পৌষমাসে ) প্রদীপ পত্রে তাঁহার বর্ত্তমান বয়সের ( বৃদ্ধ বয়সের ) ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইখানি ছবিই অতীব সুন্দর হইয়াছে। যে ছবিই দেখ, এই অসামান্য পুরুষের প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়। ইনি নানা বিদ্যা, নানা গুণ ও নানা ক্ষমতার ভাণ্ডার। দেশেবিদেশে ইনি একপে সুপরিচিত।" সোমপ্রকাশ।

আরও রাশি রাশি প্রশংসাপত্র ও অভিমত আছে। বাহুল্য ভয়ে প্রকাশিত হইল না। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র গ্রন্থের সমুদয় খণ্ডগুলির শেষ পাতায় দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক মহাশয়েরা রাশি রাশি প্রশংসাপত্র পাঠ করিয়া স্বামীজির সুপরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।